নিঃসঙ্গ পথিক

জরাসন্ধ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

নিঃসঙ্গ পথিক

আমার মায়ের
অম্লান স্মৃতি বুকে নিয়ে
পদ্মা-মধুমতী-কুমার-আড়িয়ালখাঁর
কূলে উপকূলে
ছড়িয়ে আছে যে পুণ্যভূমি
তাকে প্রণাম করি

বর্ষার জল সবে নেমে গেছে। বেশ একখানি পুরু এবং গাঢ় সর পড়েছে মাঠের উপর। ঘন-আটা দুধ কিংবা শক্ত করে জমানো দইএর উপর যে-সর পড়ে তেমনি মধুর, মোলায়েম। রংও তারই মত। ঠিক সাদা নয়, তার সঙ্গে একটুখানি হলুদের ছোঁয়া।

এই সরের নাম পলি। কল্যাণময়ী নদীর বক্ষ-নিঃসৃত মাতৃস্তন্য, শস্যকে যে প্রাণ দেয়, শক্তি দেয়। নদীমাতৃক দেশের অনায়াসলব্ধ অমৃত-ভাণ্ডার।

মাঠের কোলেই নদী। বিচিত্ররূপিণী আড়িয়াল খাঁ। এই সেদিনও ছিল ঘোরা, ভীমা, দিগন্তলীনা। আজকের রূপ শান্ত, অনেকখানি শীর্ণ। জল থেকে সদ্য জেগে ওঠা ঈষৎ গেরুয়া রংএর এঁটেল মাটির পার। মানুষের পায়ে পায়ে শুকিয়ে উঠেছে। একেবারে ন্যাড়া; ঘাস বা গুল্মের চিহ্নমাত্র নেই। পড়ন্ত বেলায় মৃদু রৌদ্রালোকে চারদিক থেকে যেন একটা তীব্র উজ্জ্বল আভা ঠিকরে পড়ছে।

আর কদিন পরেই কোমল কচি সবুজের স্নিগ্ধ স্পর্শে চোখ জুড়িয়ে যাবে। সারা মাঠ ঢেকে দেবে রবি-শস্যের শ্যামল আস্তরণ। খোঁড়াখুঁড়ি নেই, মই চালিয়ে ঢেলা ভেঙে জমি পাট করা নেই, আলবাঁধা বা জলসেচ নেই। শুধু বীজ ছড়িয়ে দেবার অপেক্ষা। তার থেকেই অপর্যাপ্ত ফলনে মাঠ ভরে উঠবে। সর্ষে, মটর, যব, মুগ, মশুর, ছোলা। অঙ্কুর বেরোতে যা দেরি। তারপরেই যেন কোন্ মন্ত্র-বলে মাথা তুলে লাফিয়ে উঠবে গাছগুলো, ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে সারা মাঠ। সে ফুল কখন ঝরে পড়বে, দেখা দেবে ফল। এই পরম্পরায় মানুষের হাত অতি সামান্য, প্রায় সবটুকুই ঐ মাটির যাদু।

এই মন্ত্রপূত মাটির সম্ভার ভারে ভারে বয়ে নিয়ে আসে ঐ দুরন্ত আড়িয়াল খাঁ। প্রতি বছর আকাশে বাতাসে যখন বর্ষার বিষাণ বাজে, দুর্বার বেগে ছুটে এসে কুল ছাপিয়ে সহস্রধারায় ঢেলে দেয় এই মাঠের বুকে। শরতের টানে আবার দূরে সরে যায়।

শ্যামাচরণ শিরোমণি এই নদীর পারের মানুষ। তার ক্রিয়াকলাপ, খেয়াল-খুশি, গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম-পরিচিত। তবু আড়িয়াল খাঁ তার চিরবিস্ময়। বর্ষার কয়েক মাস এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার উপায় নেই। মাঠ, ঘাট, নদী-নালা সব তখন একাকার। একের সঙ্গে অন্যের সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায় না। আশ্বিনের মাঝামাঝি আবার যখন সে নিজের সীমানায় ফিরে আসে, তিনি এসে দাঁড়ান তার মুখোমুখি, প্রাণ ভরে তার স্নিগ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নেন।

এবারে অনেকদিন আসতে পারেন নি। আজ যে-কাজে বেরিয়েছেন, এখানে আসবার কথা নয়। নদীপারের এই ঘুর পথটুকু তিনি ইচ্ছা করেই বেছে নিয়েছেন। ডাইনে বাঁয়ে দেখতে দেখতে চলেছিলেন। প্রথম দিকে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছেন, সেইটাই ছিল মুখ্য, দেখাটা গৌণ। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর

কাজের কথা আর মনে রইল না, শরতের শান্ত নদী ও নির্জন মাঠের বুকে নেমে আসা একটি মধুর অপরাহু তাঁর সমস্ত চেতনা জুড়ে বসল।

মাঠের সঙ্গে নদীর যে কি নিবিড় সম্পর্ক সেই কথাটাই বিশেষ করে ভাবতে ভাবতে চলেছিল শিরোমণি। তার থেকে তাঁর মনে হল, জলের আর এক নাম যে জীবন সে শুধু একারণে নয় যে সে জীবনীয়, অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্যে অত্যাবশ্যক। আরো কারণ আছে। জল কেবল পানীয় নয়, সর্বাত্মক জীবন-ধারার নিত্য সহচর। জলহীন জীবন-যাত্রা অকল্পনীয়। যে অন্ন জীবকে বাঁচিয়ে রাখে, যে শস্যসম্ভার তার পুষ্টি যোগায়, যে আচ্ছাদন তার শীতাতপ নিবারণের সহায়, যে ওষধি তাকে ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে—সবই জলনির্ভর। মানুষের যে প্রাথমিক প্রয়োজন, আশ্রয়,—রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির থেকে রক্ষাকল্পে একখানি কুটীর, তার সামান্য উপকরণের জন্যেও সে জল মুখাপেক্ষী। একে অবলম্বন করেই সভ্যতার সূচনা, এরই দাক্ষিণ্যে তার ক্রম বিস্তার। তাই জল ও জীবন সমার্থক।

এই নদী সেই জীবনাধার। জীবজগতের আদিম বন্ধু তার প্রতিদিনের সহায়।

ওপারে, গাছপালার মাথার উপর আসন্ন সূর্যাস্তের আয়োজন চলছিল। কিছুক্ষণ আগে যে মেঘগুলো ছিল ধূসর কিংবা গাছপালাহীন পাহাড়ের মত কালো, হঠাৎ যেন তাদের গায়ে আগুন লেগে গেল। সেই দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল আড়িয়াল খাঁর ক্ষীণতরঙ্গ বুকের উপর। সূর্য আর নদীতে মিলে শুরু হল রংএর খেলা। পলকে পলকে তার নতুন রূপ। এই যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, সূর্যই তার উৎস, তারই দেহ থেকে সে বিচ্ছুরিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ নদী না হলে তাকে ধারণ করত কে? কে দেখাত তার এই প্রতি মুহূর্তের নব নব রূপান্তর?

—ঠাকুর মশায় না?

নদীর দিকে মুখ করে বিমোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামাচরণ। চমকে উঠলেন। একটু বোধহয় লজ্জা পেলেন; যেন কারো সঙ্গে তাঁর কোনো গোপন আলাপন হঠাৎ বাইরের চোখে ধরা পড়ে গেছে। এদিকে যখন ফিরলেন, তাঁর মুখের ঐ অপ্রতিভ হাসিটিই সে কথা জানিয়ে দিল। হয়তো লক্ষ্মণ মাঝির নজরেও সেটা পড়ে থাকবে। আভূমি নত হয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে একটু বিস্ময়ের সুরে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?

—কিছু না। এই, একবার হাটের দিকে যাবো মনে করছি।

—হাটে যাবেন। এই সন্দে বেলা?

শিরোমণি চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, তাই তো। বড় দেরি হয়ে গেছে, না? তুমি এদিকে কোথায় চললে?

লক্ষ্মণ সে কথার জবাব দিল না। শিরোমণির হাতে ঝোলানো ছোট্ট খালুইটার দিকে চেয়ে বলল, খালি মাছ আনতে হবে, না আরো কোনো সওদা আছে?

—না, একটু মাছের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মেয়েটা এসেছে অনেকদিন পরে।

—ও' তাই নাকি ? খুশির সুরে বলল লক্ষ্মণ, "কবে এল দিদিঠাকরুণ ?"

—কাল এসেছে।

—জামাইবাবু নিয়ে এসেছে বুঝি ?

—না, সে আসতে পারল না, হরিশ গিয়ে নিয়ে এল।

—দিদিঠাকরুণের পয় আছে। খালুইডা থোন এখানে।

লক্ষ্মণের পিঠে ঝুলছিল একখানা ঝাঁকি জাল ; আর হাতে ছিল একটা জালের থলে, যেটা সে প্রণাম করবার সময় মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল। শিরোমণি এতক্ষণ খেয়াল করেন নি ; এবার নজরে পড়ল। লক্ষ্মণ সেটা তুলে এনে, মুখের রশিটা খুলে দিতেই কয়েকটা নধর তাজা রুপালি মাছ ঝকঝক করে উঠল। শ্যামাচরণ সোল্লাসে বলে উঠলেন, বাঃ, খাসা 'রায়াক'* তো ! এরই মধ্যে উঠতে আরম্ভ করেছে !

—আজই পেরথম পেলাম—, বেশ একটু গর্বের সুরে বলল লক্ষ্মণ। থলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে চারটি বেশ বড় বড় রায়াক একে একে শ্যামাচরণের খালুইতে তুলে দিতে দিতে যোগ করল, আপনার আশীর্বাদে বছরটা বোধ হয় ভালোই যাবে এবার।

জালের চাপ থেকে খালুইএর ফাঁকায় গিয়ে মাছ কটা তখনো লাফাচ্ছিল। সেই দিকে কিছুক্ষণ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে শিরোমণি বললেন, বুঝলে লক্ষ্মণ, এ মাছ দেখে তোমার দিদিঠাকরুণও এমনি করে লাফাতে আরম্ভ করবে।

দুটি প্রৌঢ়ের মিলিত হাসিতে নির্জন নদীতীর মুখর হয়ে উঠল। লক্ষ্মণ মাঝি ডান হাতের কড়ে আঙুলের কর গুনে গুনে বলল, রায়াক, পাবদা, সরপুঁটি—এই তিনডা মাছ ওনার বেজায় পছন্দ। সব খাওয়াবো এবার। আড়েল খাঁ ঠান্ডা হয়েছে, জলে আরেকটু টান ধরলেই উঠতে আরম্ভ করবে। কিছু দিন আছে তো দিদিঠাকরুণ ?

—তা আছে। মাস তিনেক অন্ততঃ থাকতেই হবে। প্রথম হচ্ছে তো। এখন মঙ্গলমত খালাস হলেই দুশ্চিন্তা যায়।

—নাতি হবে বুঝি ! আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত চিৎকার করে উঠল লক্ষ্মণ। এতক্ষণ বলেন নি কেন ? ইস ; আর কডা মাছ দিতে পারলে বড় ভালো হত। কিন্তু রায়াক আর নাই। গোডা কয়েক বেলে আছে ; বড় ছোট ছোট।

—না, না ; আর দরকার নেই। এতেই হবে। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাট পর্যন্ত আর যেতে হল না। এখন গিয়ে বোধহয় কিছু পাওয়াও যেত না। খালি হাতে ফিরতে হত।…কত দিতে হবে, বল দিকিন ?

লক্ষ্মণ এক ঝটকায় জালটা পিঠের উপর চড়িয়ে বাঁ হাতে তার রশি চেপে ধরল। তারপর নিচু হয়ে ডান হাতে মাছের থলেটা তুলে নিয়ে বলল, ভা-রী তো

* বাটা-জাতীয় মিষ্টি জলের মাছ। অতিশয় সুস্বাদু।

এক হালি* রায়াক, এর জন্যে আবার দেবেন কী ?

—তা হয় না, লক্ষ্মণ। এক হালি মাছই বা কম কিসে ? তার ওপরে একেবারে নতুন রায়াক। হাটে-বাজারে এখনো ওঠে নি। তাছাড়া, তুমি গরিব মানুষ। এই দিয়েই চালাতে হয়। কিছু না নিলে চলবে কেন ?

লক্ষ্মণ যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল ; ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, নতুন খ্যাবলা* নিয়ে বেরিয়েছিলাম। পেরথম টানেই একটা রায়াক। তারপর আরো তিনটা উঠল। মাছ কডা বেরাহ্মণের সেবায় লাগল। এ কি কম ভাগ্যিস কথা ? না' এ মাছের দাম আমি নিতে পারবো না ঠাকুর মশায়। আপনি বাড়ি যান। আঁধার রাত। আর দেরি করবেন না।

শ্যামাচরণকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই হন হন করে চলতে শুরু করল। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল, মাঠাকরুণ-রে কবেন, শীগগিরই একদিন যাবো। অনেকদিন তেনার হাতের পেসাদ পাই নি।

শিরোমণি উত্তর দিলেন না। দিলেও অতদূর থেকে লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই তাঁর গলা শুনতে পেত না। একবার শুধু চোখ তুলে তাকালেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। মানুষটা একে বেঁটে, তার উপরে ঘোর কালো, এবং গোটা পিঠখানা জালে ঢাকা। অন্ধকারে চোখে পড়বার কথা নয়। কিংবা, যে ভাবে চলছিল, এতক্ষণে হয়তো বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবার নিজের পথে পা বাড়ালেন শ্যামাচরণ। তাঁকে যেতে হবে উলটো দিকে, দক্ষিণে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যা হতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এল। তবে পথের রেখাটা তখনো বেশ স্পষ্ট। সেদিকে নজর রেখে তিনিও গতির বেগ বাড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মণ যে দাম নিল না, তার জন্যে ভিতরে ভিতরে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন শিরোমণি। না নেবার কারণ যা বলে গেল, সেটা কিছু নতুন নয়। চাষী তার ক্ষেতের প্রথম তোলা আনাজ, গৃহস্থ তার নতুন গাছের প্রথম ফল, খেজুর গাছ কাটে যে গাছী, সে তার প্রথম 'কাট্' এর রস কিংবা একটু নলেন গুড়, এমন কি মুসলমান কৃষকেরা, গরু যখন বাচ্চা দেয় তার প্রথম বাটের দুধ—ব্রাহ্মণবাড়িতে পৌঁছে দেয়। অনেকদিনের প্রচলিত রীতি। উভয় তরফই এতে অভ্যস্ত। শ্যামাচরণ শিরোমণিও এসব দান সহজভাবে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্মণের ব্যাপারটা একটু যেন আলাদা। অন্ততঃ সেই রকমই তাঁর মনে হচ্ছিল।

এ অঞ্চলের সবগুলো গ্রাম—কৈজুড়ি, মোষখালী, তেঁতুলডাঙ্গা—নদী থেকে একটু দূরে। মাঝখানে মাঠ। বর্ষায় জলে ডুবে যায়। মাঠের পরে খানিকটা উঁচু জায়গায় বসতি। সেখানে নানা জাতের বাস। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য—ইত্যাদি উচ্চবর্ণের সংখ্যা অতি অল্প। বেশির ভাগ নমশূদ্র এবং মুসলমান। তার পরেই

* হালি মানে গণ্ডা অর্থাৎ চারটা।

* খাঁকি জাল।

জেলে। তাদের পাড়াটা গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, অনেকটা নদীর কোল ঘেঁষে। পাড় এখানে খুব উঁচু নয়, বস্তির ধার থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এইটাই জেলেপাড়ার ঘাট। একটু দূরে যারা থাকে, তাদেরও স্নানের ঘাট। অনেকখানি চটান জায়গা। সেখানে জাল শুকোয়, নৌকো উপুড় করে তার পিঠে গাব কিংবা আলকাতরা দেওয়া হয়, আর একপাল মিসমিসে কালো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতখানা ডিঙ্গি নৌকা সব সময়ের ঘাটে বাঁধা আছে; কখনো তার উপর গিয়ে ওঠে, সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব ঋতুতেই তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

লক্ষ্মণ মাঝি এই বস্তির বাসিন্দা। এক চাপে পঁচিশ-তিরিশ ঘর লোকের বাস। গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট চালাঘর, উলুখড়ের ছাউনি, মাটির মেঝে, হোগলা পাতা কিংবা পাঠকাঠির বেড়া। এক এক ঘরে এক একটি পরিবার, অর্থাৎ ছেলেপুলে নিয়ে আট-দশজন। ওরই মধ্যে যারা একটু সম্পন্ন গৃহস্থ, তারা কেউ দুখানা, কেউ বড়জোর তিনখানা ঘরের মালিক। সকলেই মৎস্যজীবী; 'মাঝি' এদের পদবী। সেটা আটপৌরে। আরেকটা পোশাকী পদবী আছে— 'রাজবংশী'। সেটা তোলা থাকে দলিলপত্রে, জমিদারের দাখিলায় এবং মহাজনের খতে।

এই তোলা উপাধিটির ঐতিহ্য অতি প্রাচীন।

মাঠ থেকে খানিকটা উঁচু এই ঢিবির মত কয়েক বিঘা জমি, যেখানে তাদের বাস, তারই আশেপাশে বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে কোন্ এক বিস্মৃত যুগের রাজা তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখন এই ভূখণ্ডটুকু ছাড়া তাঁর আর কোনো চিহ্ন নেই। বাকী সবটাই আড়িয়াল খাঁ আর মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এরা সেই নামহীন রাজার বংশধর—'রাজবংশী'। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে তিনি এখানে রাজত্ব করতেন, কোন্ গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে, সে সব তথ্য এদের জানা নেই। না জানলেও এই রাজ-পরিচয় সম্বন্ধে প্রত্যেকেই অতি সজাগ, বর্তমানে সেইটুকুই ওদের একমাত্র সম্পদ। সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। এই জমিতে ওরা খাজনা দিয়ে বাস করে, নদীতে মাছধরার জন্য জমিদারকে জলকর দিতে হয়, আর এত বড় মাঠের কোনো কোনো প্রান্তে এক চিলতে মাটি কারো নেই, যেখানে এক মুঠো ফসল ফলানো যায়। সমস্ত পাড়াটাই একান্তভাবে নদী-নির্ভর।

নদী যা দেয়, তাতে এদের বড়জোর ছমাসের প্রয়োজন মেটে। তাও কোনো-রকমে। বাকী ছমাস কী দিয়ে, কেমন করে চলে, সেটা বোধহয় ওদের অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না। তবু সম্ভবতঃ ঐ পোশাকী পদবী প্রেরণায় দারিদ্র্যকে এরা আমল দেয় না। যেমনি দরাজ-হাত, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। বছর বছর ঘটা করে গঙ্গাপুজো করে, পালা-পার্বণে ধার করে লোক খাওয়ায়, জমিদার, মহাজন কিংবা ব্রাহ্মণবাড়িতে যখন উৎসব লাগে, অকাতরে মাছ যোগায়। দাম কখনো পায়, কখনো পায় না। না পেলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অমুক কত্তা, অমুক ঠাকুর মশায়, কিংবা অমুক মোল্লা খুশী হয়েছেন। তার বেশী আর

কী চাই ? দয়া করে যা দিলেন, সেই তো ঢের। খুশী হয়ে নাও। কম হল বলে মুখ ভার করো না ; সেটা ছোট মনের পরিচয়। চাইতে যেও না ; সেটা দীনতার লক্ষণ।

বয়সে যারা তরুণ, কিছুদিন হয়তো পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলে যাতায়াত করেছিল,—সেই সূত্রে দুচারটি বামুন-কায়েতদের ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যেটা পরেও কিছুটা রয়ে গেছে,—তারা মাঝে মাঝে অসন্তোষ জানায়—হরিধন বোস উচিত দাম দেয় নি, কাদের গাজী ডাহা ঠকিয়েছে। প্রবীণদের কানে গেলে ধমকে দেয়। তারা কি নিকারী* নাকি, যে লাভ-লোকসানের হিসাব করবে ?

ছেলেরা ব্যবসায়ের দিকটা বোঝাতে চায়—কত মূলধন ঢালতে হয়েছে নৌকা, জাল, গাব আর আলকাতরার পিছনে, তার উপরে কতজন মানুষের কতদিনের খাটুনি, তার মজুরি কত। বাবা, কাকা, জ্যাঠাদের মাথায় এসব হিসেব ঢোকে না। তারা একটা সোজা কথা বুঝে রেখে দিয়েছে—মাঝিরা মা গঙ্গার সেবায়েত। তাঁর অনুগ্রহই তাদের আসল মূলধন। তিনি যদি মুখ তুলে না চান, যত টাকাই ঢাল সব যাবে ঐ জলের তলায়, আর তাঁর কৃপা হলে প্রথম টানেই নৌকার খোল ভরে উঠবে।

হাতের কাছে দু-একটা দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সেবার অর্জুন মাঝি এত খরচ পত্তর করে তিনখানা নতুন নৌকা, অতগুলো নতুন জাল নামিয়ে কী পেল ? দলে যারা ছিল, তাদের খোরাকি-খরচাও উঠল না। আর গত সন উদ্ধব তার ভাঙা নৌকা আর ছেঁড়া জাল নিয়ে দুটো খেপেই বছরের কামান কামিয়ে নিলে।

জলের তলায় মাছ নিয়ে আর যা-ই হোক লাভ-লোকসানের হিসাব চলে না। তার চেয়েও বড় কথা, যেটা মুখ ফুটে না বললেও যখন তখন মুখের রেখায় ফুটে ওঠে—আমরা ব্যবসায়ী নই, আমরা রাজবংশী।

সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোতেও লক্ষ্মণ মাঝির অসংখ্য—বলিরেখাঙ্কিত মুখের উপর সেই বিশেষ রেখাগুলো সহজেই চিনতে পেরেছিলেন শিরোমণি। তার হঠাৎ বদলে-যাওয়া দরাজ গলায় শুনতে পেয়েছিলেন কোন্ অজ্ঞাত, হয়তো কাল্পনিক, যুগের কোনো এক রাজবংশের কণ্ঠস্বর যখন সে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দাম দেবার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—এই তো কডা রায়াক, এর জন্যে আবার দেবেন কী !

শ্যামাচরণ জানেন, সামান্য হলেও লক্ষ্মণ মাঝির কাছে এই মাছ কটি তুচ্ছ নয়। দাম বড়জোর দু-আনা কিংবা তারও কম, তবু রাতের মত ঐ কটি পয়সাই হয়তো গোটা পরিবারের একমাত্র সম্বল। যে মাটির হাঁড়িটায় চাল থাকে—লক্ষ্মণ রাজবংশীর তণ্ডুল ভাণ্ডার—তার শেষ কণাটি ও-বেলাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে সংবাদটি লক্ষ্মণের অজ্ঞাত নয়, বৌ হয়তো বেরোবার আগেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, এবং সন্ধ্যা হতেই নানা কাজের ফাঁকে একটা চোখ রেখে দিয়েছে পথের দিকে, কখন সে ফিরে আসে। হাতে তার জালের থলে থাক বা না থাক, একটা

* যারা মাছ ধরে না, জেলেদের থেকে কিনে নিয়ে বিক্রি করে।

ছোট্ট ন্যাকড়ার পুঁটলি যেন থাকে, যার ভিতর থেকে বেরোবে অন্ততঃ সের দুই চাল। তা না হলে স্বামী এবং চারটি ছেলেমেয়ের পাতে দেবার পর তার ভাগে পড়বে নিছক পাত-চাঁচা। এর কোনোটাই অসম্ভব নয়। সমস্ত দৃশ্যটাই শ্যামাচরণ চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছিলেন। তবু সেই ভণ্ডুল ভাণ্ডারের চাবিটি—দু-আনা পয়সা—তার ট্যাঁকেই রয়ে গেল। একবার ছুঁয়েই তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলেন। রাজবংশীর মুখের দিকে চেয়ে খুলতে গিয়েও পারলেন না। কেমন যেন সাহস হল না। সেই রেখাগুলো যেন গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল—আমাকে কি আপনি ছোট মনে করেন ঠাকুরমশায় ?

রাজবংশীর এই গর্ব, গৌরববোধ বা অভিমানের—যে নামই দেওয়া যাক,—আশেপাশের লোকেরা পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকে। বিশেষ করে তারা, যাদের ন্যায্য দাম দেবার সঙ্গতি আছে, তেমনি ক্ষমতা আছে না দেবার। সব সময়ে বা সকলের বেলায় সেটা জুলুম কিংবা ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা নয়। ধান, পাট, লঙ্কা, মুলোর মত মাছও যে একটা ফসল,—ওগুলো ফলে মাটিতে, আর এটা জলে—এ বিষয়ে অনেকেই সজাগ নয়। যে-চাষী তার ক্ষেতের ধান কিংবা বাগানের কলা নিয়ে হাটে আসে, ক্রেতারা তার সঙ্গেও দরাদরি করে দাম কমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওটা একটা পণ্য, শ্রম এবং অর্থ দিয়ে "জন্মাতে" হয়েছে, এটুকু স্বীকৃতি সব ক্রেতার মনেই থাকে। মাছের বেলায় মনোভাব হল, জল থেকে ধরে আনা ঐ বস্তুটা যেন প্রকৃতির দান, মানুষের উৎপাদন নয়। পুকুরে জন্মানো পোনার বেলায় মানুষের হাত যদি বা থাকে, আড়িয়াল খাঁর বুকে যাদের জন্ম, সেখানে এই জেলেগুলো যেন শুধু উপলক্ষ্য। শুধু নদী থেকে তুলে এনে ডালার উপর সাজিয়ে দেয়।

শাঁসালো খদ্দেরও তেমনি তাঁর পছন্দমত মাছটি ডালার উপর থেকে 'তুলে নেন' এবং মনে করেন, তার বদলে যা হোক কিছু ছুঁড়ে দিলেই হল। সেটা ওর 'মূল্য' নয় (মূল্যের মধ্যে মূলধন ইত্যাদির প্রশ্ন আছে), অনেকটা বখশিশের মত। তার পরিমাণ নির্ভর করে ক্রেতা অর্থাৎ দাতার মর্জি কিংবা মেজাজের উপর। বোস, বাঁড়ুজ্যে, রহমনদের পারস্পরিক মনের লড়াই এবং ঐ জাতীয় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণেও ঐ অঙ্কটার তারতম্য ঘটে। জেলেরা কখনো কখনো লাভবান হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঠকে।

হাটে-বাজারে অহরহ এই দৃশ্য শিরোমণি শিশুকাল থেকে দেখে আসছেন। তিনি ঐ শাঁসালোদের দলে পড়েন না। নিতান্তই সাধারণ মানুষ। সঙ্গতি ও প্রয়োজন দুটোই সামান্য। জেলেরা তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ভক্তি করে, হয়তো তার মধ্যে তাঁর অবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুকম্পা জড়িয়ে আছে। তাঁর যৎসামান্য সওদার জন্য কেউ কখনো দর করে না। তিনিই তাঁর বিবেচনামত উচিত দাম দিয়ে থাকেন। আজ পারলেন না। জোর করে গছিয়ে দিলে লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই না নিয়ে পারত না। কিন্তু জোর করা গেল না। এমন একটা সূক্ষ্ম জায়গায় বাধল, যেখানে জোর চলে না। অন্য সকল দিকে যারা নিঃস্ব, তাদের সম্ভ্রমবোধটা বোধ হয় একটু বেশী প্রবল। তার মূলে কিছু থাক বা না থাক, তাকে আঘাত করা

যায় না।

সুতরাং, এ ছাড়া আর উপায় ছিল না, এই কথাই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন শ্যামাচরণ। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একটা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব খচ খচ করে বিঁধতে লাগল।

চলতে চলতে গতির বেগ আপনা হতেই মন্থর হয়ে এসেছিল। কাঁচা মাটির বুকে বসে-যাওয়া পায়ে-চলার পথের রেখাটা তখনো অন্ধকারে ঢেকে যায় নি। তারই উপর দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। প্রথমটা মনে হয়েছিল সাপ। আর এক নজরে দেখেই বুঝলেন, না, সাপ নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

॥ ২ ॥

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, শ্যামাচরণ চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। এক সুগভীর শঙ্কার ছায়া তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলল, সেই সঙ্গে চেতনাকেও। শুধু অনুভব করলেন, একটা তুষারশীতল স্রোত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তীব্র চক্ষু মেলে সামনে-কার সেই দীর্ঘ কালো সর্পিল রেখাটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শরতের শিশির-ঝরা স্নিগ্ধ রাত। মাথার উপর প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে এক আকাশ তারা। বাঁয়ে সুপ্তিমগ্ন মাঠ, ডাইনে শান্ত নদী। এই গভীর প্রশান্তির মাঝখানে ঐ ভয়ঙ্কর রেখাটাকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, মাত্র কয়েক হাত নিচে বর্ষান্তের ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে মৃদুপ্রবাহে বয়ে চলেছে যে নিঃশব্দচারিণী নদী, তার সঙ্গে ওর কোনো যোগ আছে। ওটা শুধু ফাটল নয়, ঐ রাক্ষসী আড়িয়াল খাঁর আসন্ন ধ্বংসলীলার প্রথম স্বাক্ষর। ঐ নিস্তরঙ্গ জলধারার দিকে চেয়ে কে বলবে ওরই কোনো গভীর তলদেশে বিপুল উদ্যমে শুরু হয়ে গেছে সর্বব্যাপী বিনাশের ক্রূর কুটিল নিষ্ঠুর আয়োজন! তার এত কাছের মানুষগুলোও তা জানতে পারে নি, সেখানকার সঠিক রূপটা কোনোদিন জানতে পারবে না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, যে-মাটিকে তারা অটল, অব্যয় বলে জেনে এসেছে, মানুষের সকল কর্ম, সকল কীর্তির যে নিশ্চিত আধার, সে তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে।

এইমাত্র যেখান দিয়ে রাখাল ছেলেরা নিশ্চিন্ত মনে মন্থর গতিতে গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, বৌঝিরা কলকণ্ঠের লহরী তুলে জলভরা কলসী কাঁখে বাড়ি ফিরেছে, বিশাল বোঝা মাথায় করে দ্রুতপায়ে হাটের দিকে এগিয়ে গেছে কোনো কুমোর কিংবা বারুজীবী, হঠাৎ কোথা থেকে একখানা অদৃশ্য হাত এসে সকলের অগোচরে তার উপর একটা দাগ কেটে দিয়ে গেল। জানিয়ে গেল কার অপ্রতিহত অধিকারের নীরব ঘোষণা। ঐখানেই শেষ নয়। ঐ দাবি দিনের পর দিন এগিয়ে

চলবে। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে টানা হবে সীমানা-চিহ্ন। আরো চাই, আরো চাই। এমন ক্ষমাহীন, বিচারহীন, অন্তহীন লোভের উদগ্র মূর্তি কে কোথায় দেখেছে! অথচ তার বিরুদ্ধে কারো কাছে কোনো নালিশ চলবে না। বিধাতার দরবারে সহস্র আবেদন জানিয়েও কোনো ফল হবে না।

এমনি করে এই বিস্তীর্ণ মাঠ, এতগুলো মানুষকে যে অন্ন যোগায়, দেখতে দেখতে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে, খাদ্যের উৎস গ্রাস করেই ক্ষান্ত হবে না রাক্ষসী, লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে কেড়ে নেবে তার আশ্রয়, তার মাথা গোঁজবার এতটুকু স্থান। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে পড়বে। বাজার, বন্দর, বিদ্যালয়, দেবালয় —মানুষের সকল কীর্তি, যুগ যুগ ধরে যা কিছু সে গড়ে তুলেছে; শুধু মানুষ কেন, প্রকৃতির সৃষ্টি যে বনজ সম্পদ, লতা গুল্ম অরণ্যানী—সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আগুনের মত জলও সর্বভুক। তফাত এই, আগুন নির্বিচারে নিলেও নিঃশেষে নেয় না। মাটিটা অন্তত রেখে যায়, যার উপর নতুন সৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু জল কিছুই রেখে যায় না। আগুনকে বশে আনা সম্ভব, জল কোনো বাধা মানে না। মানুষ তার কাছে নিতান্ত অসহায়, খেয়ালী শিশুর হাতে যেমন খেলার পুতুল। কাল যাকে খাইয়ে পরিয়ে স্নেহ দিয়ে যত্ন দিয়ে বুকে জড়িয়ে রেখেছিল, আজ তাকে নিজের হাতেই শেষ করে ফেলল।

আকস্মিক আঘাতের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে একটুখানি ধাতস্থ হবার পর শ্যামাচরণের মনেও এই কথাটাই প্রথম দেখা দিল। অতি বড় বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও মানুষ হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। সেই হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। মনে মনে বললেন, বিধাতার কি প্রচণ্ড পরিহাস! মাত্র কয়েক দণ্ড আগে এই স্বর্ণপ্রসূ-পলিঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চেয়ে আসন্ন শস্য-সম্ভারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর চোখ দুটিকেও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তার মূলে যার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সে এই বরদা নদী। সব কিছু ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে তিনি আড়িয়াল খাঁর সেই মমতাময় কল্যাণ রূপ দু চোখ ভরে দেখছিলেন। তখন কে জানত, দু-দণ্ড না যেতেই, এইখানে দাঁড়িয়ে সেই আড়িয়াল খাঁর নির্মম সংহার-মূর্তি দেখে তাঁকে শিউরে উঠতে হবে!

পথের উপর যে ফাটল দেখে শিরোমণি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, আকারে সে অতি সামান্য। দৈর্ঘ্য কয়েক হাত, প্রস্থ দু ইঞ্চির বেশি নয়। তাঁর চোখ দুটি সেখানেই থেমে যায় নি। কিছুক্ষণ সব কিছু অন্ধকার। যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর সেই ক্ষুদ্র সূচনার বিপুল পরিণতি তার বীভৎস রূপ নিয়ে তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল। কল্পনায় নয়। সবটাই তাঁর প্রত্যক্ষ। চার বছর আগে সে দৃশ্য তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন। বেশী দূরেও নয়। এখান থেকে সোজা চার পাঁচ মাইল দক্ষিণে, এই আড়িয়াল খাঁর উপরেই। এ অঞ্চলের নামকরা গণ্ডগ্রাম, বল্লভপুর, তার শেষপ্রান্তে অনেক দিনের পুনের পুরনো হাট।

সপ্তাহে দুদিন হাট বসত। বছর কয়েকের মধ্যেই সেই হাট বেড়ে বেড়ে গড়ে

উঠল গঞ্জ। তার মূলে একটিমাত্র পণ্য—পাট। এবং তার জাদুকরী প্রসার। জাদুস্পর্শে যেমন একটি ক্ষুদ্র আমের আঁটি চোখের নিমেষে ডালপালা মেলে মাথা তুলে ওঠে, এও যেন তাই, কিংবা তার চেয়েও আশ্চর্য!

পাট গোড়াতেও ছিল। অন্যান্য মালের সঙ্গে অল্পস্বল্প কেনাবেচা হত, কিন্তু তার কোন আড়ত ছিল না। হাটের দিন কয়েকখানা বড় নৌকা এসে লাগত কোন বন্দর থেকে। পাটবোঝাই করে চলে যেত। হঠাৎ রাতারাতি পাটের যোগান যেমন বাড়ল, একটা দুটো করে গুদাম উঠতে লাগল। আগাগোড়া ঢেউটিনে ঘেরা জাহাজের মত এক-একটা ঘর। তার মধ্যে ঠাসা পাটের গাঁট।

শ্যামাচরণ অনেকবার গেছেন বল্লভপুর হাটে। সওদা করতে নয়, দেখতে। গ্রাম থেকে গঞ্জে তার এই দ্রুত উত্তরণ তাঁর চোখের উপরেই ঘটেছে।

ভোর হবার অনেক আগে থেকেই গঞ্জের ঘাটে নৌকার ভিড় লাগতে থাকে। দেখতে দেখতে অর্ধেক নদী ঢাকা পড়ে যায়। জল দেখা যায় না। বেশির ভাগই ছোট বড় খোলা ডিঙি। আগাগোড়া পাটবোঝাই। তার সঙ্গে দুটি কিংবা বড়জোর তিনটি মানুষ! কিছু আসে পাশাপাশি গ্রাম থেকে। তারা আর কত! বেশী আসে দূর-দূরান্তর থেকে, খাল-বিল, ছোট ছোট নদীনালা বেয়ে। সারাদিন, সারারাত ধরে নৌকা চালায়, হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে পালা করে ঐ পাটের বোঝার উপরেই একটু গড়িয়ে নেয়। রান্নার পাট নেই। অত পাটের মধ্যে আগুনের কারবার চলতে পারে না। দেশলাই-এর রেওয়াজ তখনো শুরু হয় নি। শহর বন্দরে হয়তো দেখা দিয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে ক্ষেতখামারের আশেপাশে যারা ছড়িয়ে আছে—চাষী, মজুর, জেলে, মালী, কলু, কুমোর, গাছী, মাঝি, বারুই, বাড়ই—তারা ঐ ছোট্ট ম্যাজিক বাক্‌সটির মুখ দেখে নি। তাদের কথা থাক। শ্যামাচরণ শিরোমণি তো পুরুষমানুষ। জমি আছে, কিন্তু নিজের হাতে লাঙ্গল ধরেন না। স্কুলে না গেলেও টোলে পড়ে উপাধি পেয়েছেন। তাঁর বাড়িতেও দেশলাই ঢোকে নি। গন্ধক গলিয়ে ছোট্ট সরু পাটকাঠির দুধারে একটু করে লাগিয়ে গোছা বেঁধে তুলে রেখেছেন শিরোমণি-জায়া। মালসায় ঘষির* আগুন তো আছেই। তার উপরে কাঠির মুখটা ছোঁয়ালেই জ্বলে উঠবে।

পাটের নৌকায় আঙ্‌টা বা মালসা চলবে না। গন্ধকের কাঠিও ওদের নেই। ওরা তাই বেরোবার আগে এক হাঁড়ি করে পান্তাভাত রেখে দেয় পাটাতনের নিচে। তার পাশে এক সরা নুন। তাই দিয়ে শুধু প্রাতঃরাশ সারে না, মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং নৈশাহারেরও ঐ ব্যবস্থা।

আহার যা-ই হোক, ধূমপান না হলে চলে না। তামাকের ধোঁয়া পেটে না গেলে পেট ফুলে উঠবে, ঘুম পাবে, হাত-পা চলবে না। সে অভাব মেটায় আশে-পাশের চলমান নৌকা—পাট ছাড়া অন্য কোনো মালবাহী, কিংবা শুধু মানুষ-বাহী। ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে বালিকা কিংবা কিশোরী পুত্রবধূ নিয়ে বাড়ি চলেছেন শ্বশুর। ছইএর সামনেটা পরদা দিয়ে ঘেরা। তার অন্তরাল থেকে

* ছোট আকারের শুকনো গোবর-পিণ্ড।

একটানা কান্নার সুর ভেসে আসছে। শুধু সুর নয়, তার সঙ্গে কথা ; বিনিয়ে বিনিয়ে বলা ছন্দোময় বিলাপ। যেন একটা গান। করুণ কিন্তু মধুর। নদীর কলতান এবং দূর থেকে ভেসে আসা কোনো গ্রাম্য ভাটিয়ালীর যে ক্ষীণ মূর্ছনা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ওর মিল আছে। ও যেন কোনো মেয়ের কান্না নয়, নদীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত।

বধূর বিলাপ শ্বশুরের মনকে কিছুমাত্র স্পর্শ করছে বলে মনে হচ্ছে না। ছইএর বাইরে বসে তিনি প্রসন্ন মুখে হুঁকো টেনে চলেছেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝির সঙ্গে খোসগল্প করছেন। পাশ দিয়ে চলেছে পাটবোঝাই নৌকা। তারই কোনো অদৃশ্য অন্তরাল থেকে ভেসে এল উচ্চ কণ্ঠের আবেদন, এট্টু তামুক খাওয়াতে পার, মিঞাসাব ?

—কেন পারবো না ? তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

—ঢেউখালি।

—যাবে কোথায় ?

—বল্লভপুর।

দুখানা বিপরীতমুখী নৌকা পাশাপাশি এসে লাগে। তামাকের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও চলে কিছুক্ষণ। এ-দেশ ও-দেশের খবরাখবর। তারপর আবার তারা নিজ নিজ পথে চলে যায়।

—আলেকম্ সেলাম।

—সেলাম আলেকম্।

কথাবার্তা যখন চলছিল, দু-নৌকার কেউ হয়তো খেয়াল করে নি, ছইএর ভিতরকার কান্নার সুরটি হঠাৎ কখন থেমে গেছে। দুটি অশ্রুরাঙা কৌতূহলী চোখ পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল, কারা এসে নৌকা ভেড়াল এই দরিয়ার মাঝখানে ; কোন্ দেশের মানুষ এরা।

হয়তো এটা নিছক বিস্ময় বা কৌতূহল নয়। তার সঙ্গে আরো কিছু। ঐ অচেনা, অজানা বিদেশী মানুষ দুটিকে এই মুহূর্তে কেমন করে যেন তার আপন জন বলে মনে হয়। প্রিয়জন-বিচ্ছেদের যে তীব্র বেদনা তার ছোট্ট বুকখানা মুচড়ে ভেঙে দিচ্ছিল তার উপরে একটু যেন বিস্মৃতির প্রলেপ লাগে।

নৌকা ছেড়ে যেতেই মনটা আবার হু হু করে ওঠে। চোখ দুটো জলে ভরে যায়। কিন্তু এবার বোধহয় নিজেকে চেপে রাখতে চায় মেয়েটি। সুর নয়, মাঝে মাঝে শুধু একটা ফোঁপানির মৃদু শব্দ ভেসে আসে।

পাট নিয়ে যারা আসে তারা গ্রামের লোক, কিন্তু সবাই চাষী নয়। কিছু চাষী আছে, চাষবাসের বহর যাদের বড়, যারা অনেক জমির মালিক, জন খাটার, নিজেরাও খাটে তার সঙ্গে, মজুরী দিয়ে পাট কাটায়, 'জাগ'* দেওয়ায়। 'জাগ' যখন 'ওঠে', 'লওয়ার' জন্যে ডাক পড়ে এ-পাড়া ও-পাড়ার নানাবয়সী মেয়েদের।

* পাটগাছ কেটে বাণ্ডিল বেঁধে পর পর সাজিয়ে পচতে দেওয়াকে বলে 'জাগ দেওয়া'। পচাবার পর ছাল ছাড়াবার অবস্থায় এলে বলে 'জাগ ওঠা'। ছাল ছাড়ানোকে বলে 'পাট লওয়া'।

ছোট ছোট ছেলেও থাকে সে দলে। তাদের মজুরী হল—যে যতটা ছাড়াতে পারল, তার কাঠিগুলো। ওরা বলে 'পাটখড়ি'। সেই পাট ধুয়ে শুকিয়ে গোছা বেঁধে নিজেদের নৌকায় বোঝাই দিয়ে মালিক-চাষী নিজেরাই নিয়ে আসে বল্লভপুরের হাটে।

এই ধরনের 'মালিকে'র নৌকা হাতে গোনা যায়। বাকী সব ডিঙি যাদের, তারা ফড়ে। বেশির ভাগ কাছাকাছি গ্রামের কৃষক পরিবারের ফালতু মানুষ। পুঁজি বেশী নয়। তাই নিয়ে পাটের মরসুমে কিঞ্চিৎ 'বাণিজ্য' করতে বেরিয়ে পড়েছে। 'ফড়ে' বললে তারা মনে মনে চটে, বলতে হবে "ব্যাপারী"। বোলচালে ভীষণ দড়। তারই সাহায্যে ঘর ঘর থেকে যতটা সম্ভব সস্তায় মাল কিনে বল্লভপুর পাড়ি দেয়।

ভোর হতেই আড়তদারের দালালরা নৌকোয় গিয়ে ওঠে। পাট দেখে বাছে, ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পরখ করে, তারপর শোনা যায় মুখ বেঁকিয়ে বলছে কেউ, ঈস, একেবারে যে আধাআধি বরাদ্দ মিঞা, মণে বিশ সের! রাস্তায় বুঝি জোর বৃষ্টি পড়ছিল? হোগলা ঢাকা দিতে ভুলে গ্যাছ?

—"কী যে বলেন কত্তা," হেসে জবাব দেয় নৌকোওয়ালা, বিষ্টি আবার হল কবে? একেবারে ঝনঝনে শুকনো মাল।" একটা গোছা তুলে ধরে দালালের মুখের কাছে।

—ঝনঝনে বৈকি!…থাক, বেশী কথা বলে লাভ নেই, দশ সের ধরে দিতে হবে!

—তার চেয়ে এমনিই নিয়ে যান না।

অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর পাঁচে রফা হয়। মণ প্রতি পাঁচ সের বেশী দিতে হবে।

পাটের দৈর্ঘ্য এবং রং নিয়েও বাদ-প্রতিবাদ, দর-কষাকষি, রঙ্গ-রসিকতা কম চলে না।

একটা পুরো গোছা উঁচুতে তুলে ধরে বেশ উচ্চ কণ্ঠে বলে দালাল, পাট না মুড়ো ঝ্যাঁটা?

চারদিকে হাসির রোল পড়ে যায়।

কোনো নৌকো থেকে শোনা যায় ব্যঙ্গের সুর—আহা, কী রং! পাট নয় তো, এক নাও সোনা! তারপর যেন একটা মূল্যবান পরামর্শ দিচ্ছে, এমনি গভীর সুরে যোগ করে, এক কাম কর মিঞা। কুমোরপাড়ার ঘাট জান তো? এখানে নিয়ে যাও। সামনে কালীপুজো। অনেক চুল লাগবে মা-কালীর। চাই কি, সব মালটাই বিকিয়ে যাবে। ওরা দরও দেবে ভালো! রং করার খরচ তো আর লাগবে না!

পাটের মালিকও মুখের মত জবাব দিতে ছাড়ে না—বেশ, আপনার যদি সুবিধে হয়, তাই যাবো।

—আমার আবার কী সুবিধে?

—ওখানে যদি দু পয়সা বেশী দস্তুরি পান—

দালাল চোখে-মুখে কুন্ধ ভঙ্গি করে কী একটা উত্তর দেয়। চারপাশের হাসির তোড়ে সেটা আর কারো কানে পৌঁছায় না।

বাংলা পঞ্জিকায় তেরশ সাল তখনো শুরু হয় নি। পাট সোনা হয়ে গেছে। ধানক্ষেতগুলো রাতারাতি চেহারা পালটে চলে যাচ্ছে পাটের আওতায়। এখানে ওখানে যে দু'চার বিঘা ডাঙা জমি পড়ে ছিল, বনকচু আর আশুশেওড়ার ঝোপে ঘেরা, কোনো কাজেই লাগত না, সব ছেয়ে গেছে "বগী" পাটে। দেড়-মানুষ দু'মানুষ সমান উঁচু। বর্ষার জল চায় না "দেওড়াই" পাটের মত, আকাশ থেকে যেটুকু পায় তাতেই খুশী।

পতিত ডাঙ্গা গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় নি পাট। হাত বাড়িয়েছে বড় বড় আমকাঁঠালের বাগানের দিকে, কেড়ে নিয়েছে কচি কচি ঘাসে ঘেরা গোচারণ ভূমি। গৃহস্থের বসতবাড়ির আশেপাশে যে টুকরো জমিতে কুমড়ো, বেগুন, লঙ্কা, তামাকের আবাদ হত, সেখানেও মাথা উঁচু করে ঢুকে গেছে পাটবন। সর্বত্র তার অনুপ্রবেশ।

ধানের দাম চড়ছে। একটা ডবল পয়সা দিয়ে এক সের চাল আর পাওয়া যাচ্ছে না, তার সঙ্গে আর এক পয়সা দিতে হয়, বর্ষাকালে পুরোপুরি 'দুটো ডবল পয়সা'। চালের সঙ্গে তাল রেখে তেল নুন কাপড় কেরোসিনও উর্ধ্বমুখী। চাষীরা তার জন্য পরোয়া করে না। পাট যে আরো চড়া। আগে যারা একখানা পাঁচটাকার নোটের মুখ দেখেনি সারা জীবনে, তাদের হাতে এসে পড়ছে গোছা গোছা চকচকে দশটাকার নোট। তাই নিয়ে ছুটছে বাজারে। ভিড় লেগে গেছে কাঁঠাল, ইলিশ, জিলিপি, রসগোল্লার দোকানে দোকানে। সেখানে যত না মাছি, তার চেয়ে বেশী মানুষ।

পয়সার সঙ্গে মেজাজের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই পাটের বাজারে সকলেই খোশমেজাজ। ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষি যতই চলুক, মন-কষাকষি নেই। দু'তরফেই হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-রসিকতার ছড়াছড়ি।

সারাদিন ধরে বেচাকেনা চলে, দরাদরি হাঁকডাক। নৌকোঘাটে কান পাতে কার সাধ্য? সন্ধ্যার পর সব ফাঁকা। তার আগেই পাটের বোঝা উঠেছে গিয়ে মহাজনের গুদামে। অনেক রাত, কখনো বা রাতভর ধরে চলে গাঁট বাঁধা। নানা কণ্ঠের কলরব, তার মধ্যে চড়া সুরে বাঁধা দেহাতী হিন্দী আর ভাঙা বাংলার খিচুড়ি বুলি। ওটা পশ্চিমা কুলীদের এলাকা। ভারী ভারী গাঁট তোলাপাড়া ভেতো বাঙালীর কম্ম নয়। তার জন্যে দারভাঙ্গা ছাপরার শরণ নিতে হয়েছে। ওরা মজুরী নেয় কম, কাজ দেয় বেশী। তবে গায়ের জোরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে গলার জোর।

ফড়েদের ডিঙ্গিগুলো সরে যাবার পর রাত থাকতেই আরেক দল নৌকো এসে ভিড়ে সেই ঘাটে। আগাগোড়া মজবুত ছই দিয়ে ঘেরা, যেন এক একখানা চলন্ত চাচালা ঘর। ওখানকার লোকে বলে 'ঘাসী নৌকো'। ঘাটের কাছে ঘেঁষতে পারে না, বেশ কিছুটা দূরে নোঙর ফেলে। সেখান থেকে ঘাটের উপর পর্যন্ত

দু'-খানা তিনখানা করে লম্বা দেবদারু গাছের তক্তা পাশাপাশি বেঁধে তৈরী হয় সাঁকো। তার উপর দিয়ে দুজন করে দেশোয়ালী জোয়ান চার-পাঁচ মণী গাঁট মাথায় করে সেই বিশাল বিশাল নৌকোয় নিয়ে ফেলে। অতবড় খোল বোঝাই দিতে সারাদিন লেগে যায়, কখনো বা দিনেও কুলোয় না। তারপর তারা নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে কোন্ অজানা বন্দরে যাত্রা করে।

গঞ্জের ঘাটে দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণ সেই চলন্ত নৌকোগুলোকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখেছেন। 'চলন্ত' না বলে বলা যায় উড়ন্ত। ছইএর উপর মোটা মাস্তুলে বাঁধা ঐ বকের মত সাদা বিশাল পালগুলো যেন ওদের ডানা। এক একটা বিরাট বাজ-পাখী ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে যাবার পর নৌকো বা ছই কোনোটাই দেখা যায় না, চোখে পড়ে শুধু পালগুলো। তখন মনে হয় একদল মহাকায় বক নদীর জলে ভেসে চলেছে।

সব সময় হাওয়া থাকে না। তখন দাঁড় ছাড়া গতি নেই। নৌকোগুলোর মাঝ বরাবর দুধারেই ছইএর খানিকটা অংশ কাটা। সেই ফাঁক দিয়ে এক এক দিকে তিনটা-চারটা করে দাঁড় তালে তালে ওঠে-নামে। মানুষ দেখা যায় না; শুধু দাঁড়গুলো ঝপঝপ শব্দ তুলে আড়িয়াল খাঁর বুক চিড়ে নৌকোটাকে দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চড়া উজানে দাঁড়ও হার মানে। নৌকোর গতি মন্থর হয়ে আসে। মাঝিকে তখন মাঝনদী ছেড়ে ভাঙন পারের ধার ঘেঁষে চলতে হয়। দাঁড়ের পাখা গুটিয়ে রেখে দাঁড়িরা সব কাছি নিয়ে ডাঙ্গায় নামে, তার সঙ্গে বাঁধা বাঁশের টুকরো। সেটাকে কাঁধের সঙ্গে জাপটে ধরে ঝুঁকে পড়ে গুণ টেনে টেনে একটু একটু করে এগিয়ে চলে। সুদক্ষ প্রবীণ মাঝি হাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে পিছনের গলুইয়ের পাশে। ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়, কখন বাতাস উঠবে। পাল টাঙিয়েই রেখেছে। হাওয়া নেই, তাই চুপসে পড়ে আছে।

কিন্তু এ শুধু সাময়িক বিরতি। সময় হলেই হাওয়া আসবে, হঠাৎ কখন বিপুল বেগে এসে পড়বে। চোখের পলকে ফেঁপে ফুলে ছড়িয়ে যাবে পাল, রশিতে টান পড়বে, সামাল সামাল রব পড়ে যাবে। গুণটানা লোকগুলো খুশী মুখে ফিরে আসবে। কিন্তু মাঝির মুখে একদিকে খুশির ঝলক, আরেক দিকে ভয়ের ছায়া। দুরন্ত পবনকে বিশ্বাস নেই। সহায় হয়ে এল বটে, কিন্তু শত্রু হতে কতক্ষণ! একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ!

শ্যামাচরণের চোখে এসব দৃশ্য অতি পরিচিত। যখনই দেখেছেন, মনে হয়েছে জীবের সঙ্গে প্রকৃতির কি বিচিত্র সম্পর্ক! তার এক হাতে প্রহরণ, আরেক হাতে বরাভয়। এক হাত দিয়ে মারে, আরেক হাত দিয়ে বাঁচায়। এই মুহূর্তে ছিল প্রতিকূল, পরমুহূর্তে অনুকূল।

নৌকোর মানুষগুলোও জানে, বাতাস আর নদী চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। স্রোত যেখানে তীব্রবেগে বাধা দেয়, উজান ঠেলে ঠেলে নৌকো আর এগুতে চায় না, ঠিক তখনই পিছন থেকে বাতাস এসে পালে লাগে। নদীকে হার মানতে হয়। পরাজয়ের ক্ষোভে বড় বড় ঢেউ তুলে নৌকোর তলায় ধ্বক ধ্বক করে আঘাত

করতে থাকে, কিন্তু তার গতিরোধ করতে পারে না।

সেই বাতাস আবার কখন কি কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, কেউ বলতে পারে না। তখন যে পাল দিয়ে সে এই মানুষগুলোর কঠোর যাত্রাপথকে সুগম করে দিয়েছিল, কল্যাণ-হস্ত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে চলেছিল নিরাপদ বন্দরের দিকে, সেই পালই হবে তার মারণাস্ত্র। তা-ই দিয়েই সে ঐ নৌকো এবং তার আশ্রিত ধনজন সব এক নিমেষে পাতালে পৌঁছে দেবে।

পাটকে আশ্রয় করে বল্লভপুরে বিস্তীর্ণ বসতি গড়ে উঠেছিল। অনেক মানুষের আনাগোনা, তাদের নানা আকারের এবং নানা প্রকারের প্রয়োজন। সেই সব মেটাতে এল আরো অনেক মানুষ। অনেক জায়গা জুড়ে বাজার বসল। মাছ, দুধ, পান, তামাক, সব্‌জির ছোট ছোট চালাঘর, তার পাশে চাল, ডাল, তেল, নুন মশলাপাতি, কাপড়চোপড় এবং আরো কত রকম পণ্যের স্থায়ী দোকানপাট। সারি সারি ঢেউটিনের চৌচালা, আটচালা। একটা বড় অঞ্চল হয়ে গেল।

এত মানুষের খাদ্য যোগাবে কে? সে ভার নিয়ে এল বড় বড় হোটেল। প্রশস্ত ঘর, মাঝখানে সরু পথ, দুধারে তক্তা পাতা, তার উপরে শীতলপাটির বিছানা—দিনের বেলা বিশ্রামের এবং রাত্রিবেলা শয়নের স্থান। শীতকালে পাটির বদলে ফরাশ। এক কোণে একরাশ বালিশ, লাল খেরোর খোল, তার উপরে ভরতি তেলের দাগ, ওয়াড়ের বালাই নেই। সারাদিন টাল করা থাকে, রাত্রে নেমে আসে খদ্দেরের শিয়রে শিয়রে। সকলের নয়, ওর জন্যে যারা এক পয়সা বেশী দেয়, শুধু তাদের। পাটের মরসুমে ঐ পয়সাটা দু' পয়সায় গিয়ে ওঠে। তার জন্যে চাহিদা কমে না, বরং বাড়ে। একখানা বাড়তি মাছ কিংবা ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া যোগ করে হোটেলওয়ালারা দক্ষিণার অঙ্কটাও কয়েক পয়সা বাড়িয়ে দেয়। খদ্দেররা বিনা প্রতিবাদে দিয়ে চলে যায়।

খাদ্য এক রকমের নয়। শুধু ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জল যুগিয়ে মানুষের দেহের প্রয়োজন কে কবে মেটাতে পেরেছে? সেজন্যে চাই আর এক রকমের খাদ্য, আর এক রকমের পানীয়, হোটেল যা দিতে পারে না। তার যোগান দিতে বাইরে থেকে এল দেশী মদ, আর দূর শহর থেকে একদল দেহপসারিনী। একটুখানি তফাতে বাজারের একধারে তারা এসে ডেরা বাঁধল। পাটচাষীদের নতুন নোটের বেশ কিছু ভাগ চলে গেল তাদের হাতে। বিনিময়ে তারা সুস্থ-সবল দেহের কোন রন্ধ্রে ভরে দিল গোপন বিষ। তাদের ক্ষণিকের অতিথিরা সেটা বয়ে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দেহে। তারা জানতেও পারল না। যখন জানল, নিজেদের ব্যাধি-জর্জর দেহের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল না কিসের এ অভিশাপ, কোথা থেকে কেমন করে এল!

শ্যামাচরণ শিরোমণি যখন টোলে পড়েন, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতির সঙ্গে কিছুটা চরক-সুশ্রুতের পাঠ নিয়েছিলেন। গ্রামে ফিরে নিয়মমত আয়ুর্বেদ চর্চা করেন নি, কবিরাজী তাঁর পেশা ছিল না, কিন্তু সাধারণ রোগের উপশম দেবার মত

কয়েকটা ওষুধ তৈরী করে রাখতেন। বিনামূল্যের রোগীও কিছু ছিল। তারই একজনের সদ্যোবিবাহিতা কিশোরী বধূর দেহে এই নতুন ব্যাধির লক্ষণ দেখে চমকে উঠলেন। সংক্রমণের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বুঝলেন, তার পিছনে রয়েছে ঐ পাট। দেশের মাটিতে জন্মালেও এটা ঠিক দেশজ পণ্য নয়। বিদেশী বণিকের স্বার্থে বাইরে থেকে আমদানি, একদা যেমন এসেছিল নীল। তাঁর প্রথম জীবনে সারা অঞ্চলে কোথাও একটা পাট গাছের দেখা পান নি। কোথা থেকে কেমন করে হঠাৎ এসে পড়ল, তিনি জানতেন না। জানবার অবসরও পেলেন না। তার আগেই এই লম্বা সরু ঘনপল্লব ঝোপগুলো তামাম দেশ ছেয়ে ফেলল। মানুষের উদগ্র লোভ তার আসবার পথ সুগম করে দিল। নীলকে জোর করে চাপানো হয়েছিল; পাট সহজেই এসে চেপে বসল।

তার কারণ, এই পাটের সঙ্গে চাষীর হাতে এল পয়সা। তারই চমকে গোটা মুল্লুকের চোখ ঝলসে গেল। পাট, পাট করে মেতে উঠল সারা দেশ। তার পিছনে আর কী এল, দেখবার মত ফুরসৎ কারো রইল না।

এল অনেক কিছু—প্রথমটা তাদের ছোটখাটো আপদ বলে মনে করেছিল গ্রামের লোক—সাপ, জোঁক, শুঁয়োপোকা আর পাল পাল মশা। তারপর দেখা গেল, এর কোনোটাই তুচ্ছ নয়। বেশ কিছু মানুষ সাপের বিষে প্রাণ দেয়, আর মশা শুধু সারাদেহে হুল ফুটিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তার সঙ্গে ঢেলে দেয় আর এক ধরনের বিষ—দুদিন না যেতেই যেটা জ্বর হয়ে ফুটে বেরোয়। অদ্ভুত জ্বর, তার সঙ্গে হাড়ভাঙা কাঁপুনি; একরাশ লেপ-কাঁথা দিয়ে চেপে ধরলেও থামতে চায় না। আর কী তাপ! কপালে হাত রাখা যায় না। ঘটি ঘটি জল ঢেলেও মাথার যন্ত্রণা যেমন ছিল ঠিক তেমনি থাকে।

জলও যে বিষে ভরা। খাল-বিল খানা-খন্দ ডোবা যেখানে যত ছিল, সব পাটের 'জাগে' ভরতি। সে জল ছোঁয় কার সাধ্য? পাড় দিয়ে যেতে গেলে নাকে কাপড় দিতে হয়। পুকুর যে-কটা ছিল সম্পন্ন গৃহস্থের দেউড়ির পাশে, জলদানের পুণ্য কামনায় পূর্বপুরুষেরা খনন করেছিলেন, উৎসর্গ করেছিলেন দেবতার উদ্দেশে, তার বুকেও পাটের টাল গিয়ে পড়েছে। না গিয়ে উপায় কি? অত পাট কোথায় পচানো হবে? কদিন আগেও যে জল ছিল ডালিমের রসের মত শোভন-দর্শন, স্বাদমধুর, আজ তার দিকে তাকানো যায় না, মুখের কাছে তুললে গা পাক দিয়ে ওঠে।

জলের দেশ থেকে জল চলে গেছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিহাস আর কী হতে পারে?

এই জ্বর যখন প্রথম এল, গ্রামের মানুষ ছুটে এসেছিল শ্যামাচরণের কাছে। আয়ুর্বেদে তাঁর অধিকার যথেষ্ট নয়। তাই দিয়েই যথাশক্তি প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হলেন। তারপর যারা এল তাদের বললেন, আমার দ্বারা হবে না, এ রোগ আমি চিনি না, জ্বরের যেসব লক্ষণ আমি জানি তাদের সঙ্গে এর মিল নেই। তোমরা ডাক্তার ডাকো।

ডাক্তার কোথায়? আশেপাশে দু-চারজন কবিরাজ আছেন, তাঁরা জানেন।

নিবারণ কবিরাজ, শিবনাথ কবিরাজ। অদ্ভুত নাড়িজ্ঞান, ওষুধ যা দেন ডাকলে কথা বলে। তাঁদের কাউকে ডাকা যায়। শ্যামাচরণ বললেন, ডাকতে পার, তবে আমার মনে হয় তাঁরাও পারবেন না। এটা এ যুগের ব্যাধি। একে তাড়াতে হলে এ যুগের হাতিয়ার চাই। সেটা যদি কোথাও থাকে, ঐ ডাক্তারের হাতেই আছে।

যাদের সঙ্গতি আছে, বহু দূর শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে এল। অনেক টাকা তাঁর ফী, আসা-যাওয়ার খরচ তার চেয়েও বেশী। তিনি এসে বললেন এর নাম ম্যালেরিয়া। এর একমাত্র ওষুধ কুইনাইন।

দুটো নামই ওদের কাছে নতুন। এই প্রথম শুনল, শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

তারপর ছোট-বড় সকলেরই ম্যালেরিয়া আর কুইনাইনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়ে গেল। নাম দুটো শুধু নয়, এদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ ধরন-ধারণ সব মুখস্থ। শ্যামাচরণ শিরোমণির ঘরেও ম্যালেরিয়া দেবী দু' একবার দেখা দিয়ে গেলেন। প্রথমে পড়ল হরিশ। সে উঠতেই পড়লেন গৃহিণী। শ্যামাচরণ যখন ডাকঘর থেকে কুইনাইন নিয়ে এলেন, মনোরমা কিছুতেই খেতে চাইলেন না। বললেন, ও বিষ আমি খাবো না।

—তা বললে চলবে কেন? বিষ দিয়েই তো বিষ তাড়াতে হয়।

—তা হোক। ঐ ছাইপাঁশ গিলে বুধোর মা বেচারা কানের মাথা খেয়েছে, চোখেও ঝাপসা দেখে। দিতে হয় তো, তোমার ঐ কৌটোয় যা আছে তার থেকে যাহোক কিছু দাও।

—কিন্তু ওতে যে কোনো কাজ হবে না!

—না হয় না হল। ওষুধ আমার লাগবে না। সারে তো এমনিই সারবে।

এমনিই বোধহয় সেরেছিল। তার আগে স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্যে গোটাকয়েক লক্ষ্মীবিলাস দিয়েছিলেন শ্যামাচরণ। মনোরমার বিশ্বাস তাতেই তিনি ভাল হয়ে গেছেন।

ম্যালেরিয়ার বিষ তখন সুসহ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে ছেলেবুড়ো সকলেই নীলকণ্ঠ। ওর জন্যে ভয় নেই, বিস্ময় নেই। ওটা যেন জীবনযাত্রার নিত্য সহচর। শ্যামাচরণও তাকে পাট গাছের অদৃশ্য এবং অমোঘ বিষফল বলে মেনে নিয়েছেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল সেই কিশোরী মেয়েটি, ফুলের মত সুন্দর কিন্তু কীটদষ্ট, স্বামীর পাপের বিষাক্ত চিহ্ন যার কচি অঙ্গে ছেয়ে গেছে। ঘোমটার ভিতর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল মেয়েটা। সে জানে না এ কী,.কেমন করে কোথা থেকে এল।

শ্যামাচরণ শিউরে উঠেছিলেন। ঐ ক্ষতচিহ্নগুলো তাঁর সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সংবরণ করে মেয়েটির স্বামীকে বলেছিলেন, একে বল্লভপুরে নিয়ে যাও, ডাক্তার দেখাও। রোগটা ভালো নয়।

বাড়ি ফিরবার পথে একটা প্রশ্নই বারংবার তাঁর মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠেছিল—পাট তাঁদের কোথায় নিয়ে চলেছে! কে জানে এর শেষ কোথায়?

এর বোধ হয় দুদিন পরেই হরিশ এসে বলল, আমাদের চালতেতলার জমিতে এবার পাট দিলে হয়!

নিজের অজ্ঞাতে হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন শ্যামাচরণ। তারপর জানতে চাইলেন, কেন?

—দুটো পয়সা আসে। খুব দর যাচ্ছে পাটের।

ষোল বছরের ছেলে। দেখতে শুনতে এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে বেড়েছে আরো বেশী। অভাবগ্রস্ত সংসারের ছেলেমেয়েরা যা হয়; তাড়াতাড়ি সেয়ানা হয়ে ওঠে। তবু ছেলের উত্তরটা বয়সের তুলনায় একটু যেন বেমানান বলে মনে হল। তার দিকে মুখ তুলে চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। সেই এক পলক দৃষ্টির মধ্যেই শ্যামাচরণ অনেক কিছু দেখলেন। দেখলেন, সদ্য-সমাগত যুগের যেটা নব লক্ষণ বলা যেতে পারে, নবাশ্রিত ধর্ম—অর্থলিপ্সা, তাঁর এই ষোল বছরের ছেলের চোখ দুটিতে তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। কোনো ভুল নেই। মনে মনে বেদনা বোধ করলেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, দুঃখ করা বৃথা, এর নাম কালধর্ম, একে রোধ করা যাবে না। কিন্তু তিনি যে মনে মনে সংকল্প করে বসে আছেন, পাটকে তাঁর ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না! ওকে আশ্রয় করে যে লোভ, তার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। সেকথা ছেলের কাছে ব্যক্ত করলেন না। যুক্তির অবতারণা করলেন। বললেন, ও জমিটা চলে গেলে সারাবছরের খোরাকি ধান আসবে কোত্থেকে?

"যেটা ঘাটতি পড়বে, পাটের টাকা থেকে কিনে নিলেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হরিশ। এমন সুরে দিল যেন ওটা একটা প্রশ্নই নয়, ওর মধ্যে ভাববার মত কিছু নেই।

শ্যামাচরণের মনে পড়ল, তার বাবা মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন, ছিটেফোঁটা যা রেখে গেলাম, যদি বাঁচিয়ে রাখতে পার, কোনোদিন কিনে খেতে হবে না। কিনে খাওয়ার মধ্যে যেন একটা দীনতা আছে, কিনবার সামর্থ্য বা সঙ্গতি যতই থাক। ক্ষেত থেকে যা পাই তাতেই কুলিয়ে যায়—একথা যে বলতে পারে, সে-ই সব চেয়ে সুখী, লক্ষ্মী তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। সেই জন্যেই হাতে দুটো পয়সা এলেই লোকে জমি কিনত, খোরাকির ধানটা যেন আসে। অমুকের টাকা থাকলে কী হবে, জমিজিরেত নেই, কিনে খেতে হয়। লোকটা যেন কৃপার পাত্র, —এই ছিল সেদিনকার সংস্কার। শ্যামাচরণ শিরোমণির মনেও তার প্রভাব কম ছিল না। নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যেও এক কণা জমি তিনি হাত-ছাড়া করেন নি।

হরিশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুদিন পরে তাকেই সংসারের ভার নিতে হবে। কিন্তু এ কোন্ দিকে চলেছে তার মন? শ্যামাচরণ ব্যথিত হলেন। আরেকবার তাকালেন ছেলের মুখের পানে। এবার সে চোখ নামিয়ে নিল না, নতুন উৎসাহের দীপ্তিভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল বাবার দিকে, তাঁর সম্মতির অপেক্ষায়। শ্যামাচরণ দেখলেন, সেখানে তাঁর এবং তাঁর কালের সযত্ন-লালিত সংস্কারের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝলেন, এরা অন্য মানুষ।

উদগত নিঃশ্বাস বুকে চেপে বললেন, যা ভালো বোঝ কর।

পরদিন একটা ব্রত-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যেতে হয়েছিল পাশের গ্রামে। ফিরতে সন্ধ্যা হল। বাইরের ঘরে পা দিয়েই শুনতে পেলেন, মা ও ছেলেতে কথা হচ্ছে ভিতরের উঠোনে। মনোরমা বলছেন, ওঁর যখন ইচ্ছে নয়, কী দরকার ওখানে পাট বুনে? তাছাড়া সত্যিই যদি খোরাকির ধানে টান পড়ে—

—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ঝাঁজিয়ে উঠল ষোল বছরের অসহিষ্ণু কন্ঠ, টাকা থাকলে ধান কেন বাঘের চোখও পাওয়া যায়। আসল দরকার হচ্ছে টাকার। সব কিছুর দাম চড়ছে দেখতে পাচ্ছ না?

—তা সত্যি; যা ধরতে যাও, তাই আগুন। পোড়া দেশের কপালে যেন—

গলায় একটা শব্দ করে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন শ্যামাচরণ আর শুনতে সাহস হল না।

পাটের দর আরো উঠল। তার অনুগামী হল ধান, চাল, লঙ্কা, তামাক, মশলাপাতি। এমন কি হাঁড়ি-কলসীও পিছিয়ে রইল না। আরো পয়সা এল লোকের হাতে। দেশের চেহারা একদম ফিরে গেল। খড়ো চালা ভেঙে ফেলে চাষীরা সব টিনের ঘর তুলতে লাগল। বাঁশের খুঁটি নয়, চেরাই করা শাল-খুঁটি। হোগলা পাতার বেড়া নয়, দূরের কোনো দেশ থেকে সদ্য আমদানি মুলী বাঁশের বুনট করা দেয়াল। সবই এল বল্লভপুর থেকে। এরই মধ্যে সেখানে দু'তিনটা ঢেউটিনের আড়ত জাঁকিয়ে বসেছে; কাঠের গোলাও চার-পাঁচটা। বিশাল শালের গুঁড়ি টাল দিয়ে ফেলে রেখেছে নদীর কিনারায়, চেরাই হচ্ছে রাতদিন।

শ্যামাচরণ যখন তাঁর সাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া পুরনো ছাতাটি মাথায় দিয়ে দূর গ্রাম থেকে বাড়ি ফেরেন, দেখতে পান সারি সারি টিনের ঘরের চালে দুপুরের রোদ ঠিকরে পড়ছে। তাকাতে গেলে চোখ ঝলসে যায়। নতুন সম্পদ এসেছে দেশে। ঐ চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য তারই প্রতীক। রাস্তা দিয়ে যারা আসে যায়, তাদেরও লক্ষ্য করেন। চিরদিন তারা খোলা গায়ে, খালি পায়ে চলত, আজ অনেকেরই গায়ে উঠেছে শার্ট, পায়ে নতুন জুতো। আগে আগে তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে ধার ঘেঁষে দাঁড়াত, দূর থেকে নত হয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকাত, মুসলমানেরা বিনীত ভঙ্গিতে সেলাম করত। এখন প্রায় সকলেই, বিশেষ করে যারা যুবক, গট গট করে চলে যায়। কেউ কেউ যেতে যেতে, কিংবা ক্ষণেকের তরে দাঁড়িয়ে দু-একটা কুশল প্রশ্ন করে। তার মধ্যে সেই বিনম্র সুরটি নেই। অসম্মান তাঁকে কেউ করে না। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলে যে সম্মান তাঁকে অযাচিত ভাবে দিয়ে এসেছিল এতদিন, সেখানে কিছুটা কার্পণ্য দেখা দিয়েছে। তার জন্যে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। তিনি শুধু দেখছেন, মানুষের দৃষ্টি বদলে গেছে, প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। সম্মান দেখাবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয়তো চলে যায় নি, সম্মানীয়ের জাতিবদল হয়েছে। তার দাম কষা হচ্ছে অর্থমূল্যে।

হাটেবাজারে, গৃহস্থের সদরে-অন্দরে, মাঠেঘাটে—সর্বত্র বিচরণ করেন শ্যামাচরণ শিরোমণি। ভাবেন মানুষের বিত্ত বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বৃত্ত?

সেখানে দিন দিন দৈন্য দেখা দিচ্ছে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বের বিদুরের কথাগুলো মনে পড়ে।

যুদ্ধের আয়োজন চলছে, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমাকে কিছু সদুপদেশ দাও। অনেক কথা বলেছিলেন বিদুর। প্রজাগর উপপর্বের প্রতিটি শ্লোক মূল্যবান। তার মধ্যে একটি কথা কখনো ভুলতে পারেন নি শ্যামাচরণ। বিদুর বলেছিলেন, মহারাজ, সারাজীবন ধরে আপনি শুধু বিত্তের সাধনা করেছেন, কিন্তু বৃত্তের কথা ভাবেন নি। বিত্ত আসে এবং যায়, গেলেও মানুষের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যার বৃত্ত চলে যায়, তার সব গেল।

চারদিকে চেয়ে শ্যামাচরণ শিরোমণি সভয়ে লক্ষ্য করছিলেন সেই বৃত্তে অর্থাৎ চরিত্রে, স্বভাব-সম্পদে ক্ষয় দেখা দিয়েছে। অর্থের সঙ্গে এসেছে ঔদ্ধত্য, অহমিকা, বিলাসিতা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে দ্বন্দ্ব এবং সকলের উপরে দুর্জয় লোভ।

পাট অনেক কিছু দিয়েছে। সেই ভুরি ভুরি উপকরণের বাহুল্যই চোখে পড়ে, কিন্তু অলক্ষ্যে অগোচরে যা সে নিয়ে গেল, তা কেউ দেখছে না।

একদিন এমনি একা একা বিষণ্ন মনে আড়িয়াল খাঁর ধার দিয়ে কোথায় যেন চলেছিলেন। উল্টো দিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন সতীশ ডাক্তার। কৈজুড়ি বাজারে তাঁর ডিস্‌পেনসারি। বিদেশী মানুষ, বেশীদিন আসেন নি এ অঞ্চলে। ম্যালেরিয়ার কল্যাণে এরই মধ্যে কেঁপে উঠেছিলেন। চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকেই হাঁক দিলেন, এই যে পণ্ডিত মশাই, কেমন আছেন?

—ভালো।

—খবর শুনেছেন?

—কী খবর?

—বল্লভপুর টেঁকে কিনা সন্দেহ। আড়িয়াল খাঁর ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

—বলেন কি!

—হ্যাঁ। অবিশ্যি কুণ্ডুবাবুরা খুবই চেষ্টা করছে, বাজারটা যাতে বাঁচানো যায়। ফল কদ্দুর কি হবে বলা শক্ত।

বলতে বলতে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলেন সতীশ ডাক্তার। শ্যামাচরণ নদীর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। মনটা সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল। রাত্রে ভাল ঘুম হল না। যেটুকু হল তাও নানারকম দুঃস্বপ্নে ভরা। বল্লভপুর গঞ্জের একটা রিক্ত বিধ্বস্ত রূপ মাঝে মাঝে চেতনার মধ্যে ছায়া ফেলে গেল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে থাকবে। হঠাৎ কানে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে—পণ্ডিত মশায়, বাড়ি আছেন? কেমন যেন ত্রস্ত-ব্যাকুল, ভাঙা-ভাঙা স্বর।

শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে বললেন—কে?

আজ্ঞে আমি বল্লভপুরের ভবানী কুণ্ডু।

নামী লোক। এ অঞ্চলে সকলেই চেনে। শ্যামাচরণও চিনতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের উপলক্ষ কখনো ঘটে নি।

বল্লভপুর গঞ্জের মালিক ভবানীপ্রসাদ কুণ্ডু।

মালিকানা অবশ্য তিন শরিকের। কিন্তু অন্য দু'তরফ মিলে চারআনা, আর ভবানী কুণ্ডু একাই বারোআনা। তাছাড়া দেশজোড়া লঞ্চের কারবার, পাটের দাদনেও বিস্তর টাকা খাটে। ইদানীং নিজের ও ছেলের নামে দুটো বিশাল আড়ত দাঁড় করিয়েছেন আড়িয়াল খাঁর পারে। পুরোদমে কাজ চলছে। কৃতি পুরুষ এবং নিজের কর্মশক্তি সম্বন্ধে অতি সচেতন। হয়তো সেইজন্যেই লোকে বলে দাম্ভিক। অর্থ, সামর্থ্য ও প্রতিষ্ঠায় যারা সমকক্ষ নয়—এ অঞ্চলে প্রায় সকলেই তাই—তাদের সঙ্গে মেলামেশা বড় একটা নেই। বাড়ি এবং গদির বাইরে তাঁকে ক্বচিৎ দেখা যায়।

দেবদ্বিজে বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধারও অভাব নেই, কিন্তু তার প্রকাশ অতি পরিমিত।

এ হেন ব্যক্তিকে এই অসময়ে তাঁর দীন ভদ্রাসনের দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখে শ্যামাচরণ বিস্মিত হলেন এবং খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। শোবার ঘরের সংলগ্ন এই অপরিসর বারান্দাটিই তাঁর বৈঠকখানা। আসবাব বলতে একখানি কাঁঠাল কাঠের জলচৌকি এবং কয়েকখানা শীতলপাটির চৌকো আসন। প্রথমটি তিনি নিজেই ব্যবহার করেন আর বাকীগুলো, তাঁর কাছে সচরাচর যারা আসে অসুখ-বিসুখ, পূজা-পার্বণ বা ঐ জাতীয় কোনো তাগিদ নিয়ে, তাদের কাজে লাগে। আজকের এই বিশিষ্ট অতিথিকে সেখানে বসানো যায় না! হাতের কাছে যোগ্যতর আর কিছু না পেয়ে অগত্যা সেই সবেধন চৌকিটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, বসুন।

ভবানীপ্রসাদ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, না, না, ওখানে আপনি বসুন। আমি বরং—

একটা পাটির আসন টেনে নিয়ে মেঝের উপরেই বসবার উদ্যোগ করছিলেন; শিরোমণি বাধা দিলেন, দাঁড়ান, দেখি, আর কিছু—

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন এবং কোণ থেকে একটা গুটিয়ে রাখা নতুন পাটি (কোনো ক্রিয়াকর্মে যজমান বাড়ি থেকে পাওয়া) নিয়ে এসে বারান্দায় পাতবার আয়োজন করতেই ভবানী কুণ্ডু একটা ধার ধরে ফেলে বললেন, দিন আমি পেতে নিচ্ছি। কী দরকার ছিল বলুন তো শুধু শুধু কষ্ট করবার? এই আসনেই বেশ বসা যেত!

দক্ষিণমুখ বারান্দা। মাটির দাওয়া; অনেকখানি উঁচু। তার নিচেই গোবর নিকানো প্রশস্ত আঙিনা। আঙিনার পূর্বদিকে ঠাকুরঘর। নেহাত ছোট নয়, সতেরোর বন্দ* খড়ের চৌচালা; হোগলাপাতা পর পর সাজিয়ে তার উপরে ঘন ঘন বাঁশের বাখারি দিয়ে বাঁধা মজবুত বেড়া। কাঁঠাল কাঠের দরজা; চৌকাঠ ও কপাটে গ্রাম্য সূত্রধরের নিপুণ হাতে খোদাই করা নানারকম ছবি। ঢুকতেই বাঁ

* দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফল সতেরো হাত, যেমন ১০+৭ কিংবা ১১+৬ ইত্যাদি।

দিক ঘেঁষে বসানো একখানি সুদৃশ্য চতুর্দোল ; তার গায়েও ফুল লতা-পাতার সূক্ষ্ম কাজ। ভিতরে শালগ্রামশিলা, শ্যামাচরণ শিরোমণির পিতামহের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা।

আঙিনার বাকি দুদিক খোলা। এক কোণে ভবানীপ্রসাদের পালকি দাঁড়িয়ে আছে। তার চারদিক ঘিরে কয়েকজন লোক রাত্রিশেষের আবছায়া অন্ধকারে চাপা গলায় কথাবার্তা বলছিল। ছজন বেহারা ছাড়াও জন-দুই পাইক, তাদের হাতে লাঠি।

শ্যামাচরণ তাদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? এখানে আসন আছে, পেতে নিয়ে বসো।

একজন পাইক খানিকটা এগিয়ে এসে নত হয়ে সসম্ভ্রমে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, আসন কী হবে? এমন তকতকে উঠোন, আমরা এখানেই বসছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না কত্তাঠাকুর।

বলেই চলে যাচ্ছিল, মনিবের গম্ভীর ডাক কানে যেতেই ফিরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল, কত্তাবাবু—

—তোমরা এক কাজ কর। ঐ পুকুরপাড়ে গিয়ে বসো, বেয়ারাদেরও ডেকে দিয়ে যাও। আমার একটু দেরী হবে।

—যে আজ্ঞে, কত্তাবাবু। আমরা ওদিক পানে রইলাম।

অতিথি তখনো দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্য করে গৃহকর্তাকেই আগে গিয়ে তাঁর চৌকির আসন গ্রহণ করতে হল। এবার ভবানীপ্রসাদ এগিয়ে এসে তাঁর সামনে মাটিতে কপাল রেখে প্রণাম করলেন এবং পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পাটির উপর বসতে বসতে বললেন, বড় অসময়ে এসে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

—আমার আর কষ্ট কী? আর একটু পরে তো আমি এমনিই উঠতাম। আপনাকেই বরং অনেক রাত থাকতে বেরোতে হয়েছে।

—তাছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বেলা হবার আগেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। ওদিকে বড় বিপদ। বোধ হয় শুনে থাকবেন।

—রাত্রেই শুনলাম। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন শ্যামাচরণ, সতীশ ডাক্তার বলে গেলেন, নদী অনেকখানি এগিয়ে এসেছে ; গঞ্জের দিকটা যাতে রক্ষা পায় তার জন্যে আপনি খুব চেষ্টা করছেন।

—তাতে কোনো ফল হল না। কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়ে অনেক কিছু করা গেল। তিন লাইন শালের খুঁটি গেড়ে বাঁশ চিরে বাঁধ দেওয়া হল, তারপর বড় বড় নৌকো ভরতি পাথরের চাঁই এনে ঢালল সেই ফাঁকের মধ্যে। তিনটা দিনও টিকল না। সব চলে গেল জলের তলায়। সেই সঙ্গে বেশ কয়েক হাজার টাকা। বাজারের আর কোন আশা নেই। আমরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছি।

ভারী গলায় থেমে থেমে বাইরের দিকে চেয়ে অনুচ্চ স্বরে এই কথাগুলো বলে গেলেন ভবানী কুণ্ডু। যখন থামলেন, তার পরেও সেই হাল ছেড়ে দেওয়া নৈরাশ্যের সুর ভোরের বাতাসে ছড়িয়ে রইল। তার করুণ রেশটুকু শিরোমণির

অন্তরের কোণে অনুরণিত হল। তিনি ম্লান মুখে নীরবে বসে রইলেন। বলবার মত কোনো কথা খুঁজে পেলেন না।

স্বল্পক্ষণের বিরতি। তারপর আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন ভবানী-প্রসাদ—বল্লভপুর কী ছিল, আর কী হয়েছে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন, পণ্ডিত মশায়। তার পেছনে আমার সামান্য শক্তি দিয়ে যা করেছি, তাও আপনার অজানা নয়। অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে। অবিশ্যি পেয়েওছি কম নয়। লোকে সেইটাই দেখে। কী করে এল, সেসব কথা ভাবে না। সে যাক। তার জন্যে দুঃখ করি না। বল্লভপুর যেতে বসেছে। মাত্র কয়েক দিনের মামলা। তার জন্যে তৈরী হয়ে আছি। জানি, এ ভাঙন আমাকেও ভেঙে দিয়ে যাবে। শুধু আমি নই, আমার পাশে এরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল, আমার হাতে হাত মিলিয়েছিল, এমনি আরো কত মানুষ; সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এতটুকু চিহ্নও কারো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ শুধু আমার একার সর্বনাশ নয়, আরো অনেকের, অবিশ্যি আমারই বেশী। তবু দশজনের দশা ভেবেই আমি বুক বেঁধেছিলাম। কিন্তু ঐ রাক্ষুসী আড়িয়াল খাঁ আমাকে এমন জায়গায় ঘা দিয়েছে যেখানে আমি একা। সে আঘাত যে কত বড় আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না, পণ্ডিত মশায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত ভবানীপ্রসাদের কথায় বা আচরণে, তিনি যে কতখানি বিচলিত, তার লক্ষণ তেমন করে প্রকাশ পায় নি। এত বড় বিপদকে আসন্ন এবং নিশ্চিত জেনেও ধীর অবিচল কণ্ঠে সেই সর্বব্যাপী সর্বনাশের কাহিনী বলে চলেছিলেন। এখানে এসে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শ্যামাচরণ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন, এবার চোখ তুলে তাঁর অতিথির বেদনার্ত মুখের দিকে তাকালেন। যে-আঘাতের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল, তার রূপটা অস্পষ্ট হলেও তীব্রতা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। কী সেই বিপদ শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই যে বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে এসেছিল, তাকে সংবরণ করে পূর্ব সূত্রে ফিরে গেলেন ভবানীপ্রসাদ। সংযত মৃদু কণ্ঠে দুটি মাত্র কথা—আমি নিরাশ্রয় হতে চলেছি, পণ্ডিত মশায়।

শ্যামাচরণ শিউরে উঠলেন। মুখ থেকে বোধহয় আপনা হতেই বেরিয়ে গেল—নিরাশ্রয়।

—হ্যাঁ। আমার অত শখের, অত মজবুত করে তৈরী নতুন ঘাটলার* ঠিক ওপরেই ফাটল দেখা দিয়েছে। এতক্ষণে হয়তো একখানা পাথরও দাঁড়িয়ে নেই।

ঘাটলার ছবিটা শ্যামাচরণের চোখের উপর ভেসে উঠল। পঞ্চাশ গজের মধ্যে ভবানী কুণ্ডুর চকমিলানো বাড়ি। তার আসন্ন ভবিষ্যৎও মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন। দেখে শিউরে উঠলেন! কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা যেন হতবুদ্ধির মত ধীরে ধীরে বললেন, কিন্তু এ কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে! এই তো সবে দু'বছর আগে আপনার বাড়ির সামনে

* শান-বাঁধানো ঘাট।

চর পড়েছে। আমরা বলাবলি করেছি, শুধু আপনার বাড়ি নয়, গোটা বাঁকটাই বেঁচে গেল। অন্ততঃ এক পুরুষ নদী এদিকে আসবে না।

—আমিও তো তাই জানতাম, আর সেই ভরসাতেই পাঁচ-পাঁচখানা টিনের আটচালা ভেঙে দিয়ে সবটা জুড়ে দোতলা কোঠা বাড়ি তুললাম। বিজয়ের মার বরাবরকার সাধ। নদে জেলার মেয়ে; 'টিনের ঘরে' কিছুতেই মন উঠত না। বলত, যত ভালো করেই কর, তবু তো টিন। আমাদের দেশে যে দুবেলা খেতে পায় না, মাথা গোঁজবার জন্যে তারও দুখানা পাকা ঘর আছে। আমি আড়িয়াল খাঁর দিকে দেখিয়ে বলতাম, ও'র যে সেটা পছন্দ নয়, দেখছ না এ তল্লাটে যে যত বড় লোকই হোক, কেউ দালান দেয় না।* উনি যদি ক্ষেপে ওঠেন, তখন? চুপ করে যেত, কিন্তু বুঝত না। নদীর মারমূর্তি তো কখনো দেখে নি।

তার ক'বছর পরেই এদিকটায় চড়া পড়ল। সবাই বলল, আর ভয় নেই। তখন কে ভেবেছিল, দুদিন না যেতেই মরা গাঙ্ জেগে উঠবে। এমন তো কখনো হয় নি।

শ্যামাচরণের মনে পড়ল, অনেক দিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলেন একটা উম্ভট শ্লোক, যার অর্থ—কুলনাশিনী নদী কুলটা নারীর মতই অবিশ্বাসিনী। উভয়ের সম্বন্ধেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এরা কখন যে কী সর্বনাশ ঘটিয়ে বসবে, কেউ জানে না।

উক্তিটা তাঁর ভাল লাগে নি। এর মধ্যে নদীর প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে সেটা তিনি কখনো সমর্থন করেন না। নদীর যে বিভীষিকাময় সংহার মূর্তি, তার মধ্যেও এক অপরূপ সৌন্দর্য আছে। সে রূপ ভয়াল কিন্তু মোহন, যার দিকে তাকিয়ে মানুষ সশঙ্ক সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়, ঘৃণা বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধায় মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

তবু এই মুহূর্তে ঐ শ্লোকের ভিতরকার একটি কথা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। সে অবিশ্বাসিনী, কেউ জানে না কখন কী করে বসবে। তার গতিবিধির কোনো নিয়মকানুন নেই! মানুষের যে চিরন্তন বিশ্বাস—নদী এক কূল ভাঙে, আর এক কূল গড়ে—সাধারণ ভাবে সত্য। এক পার থেকে যে বিপুল মাটি সে গ্রাস করে, প্রায়ই দেখা যায় অন্য পারে নিয়ে তার অনেকখানি সে উগরে ফেলে। ওপারে যখন ভাঙন চলে, তার কিছুদিন পরেই এপার জুড়ে জেগে ওঠে চর। মাটির সঙ্গে প্রকৃতির বা মানুষের তৈরী যে সম্পদ সে কেড়ে নিয়েছিল, তা কোনদিন ফিরিয়ে দেয় না, কিন্তু ঐ চরের বুকে নতুন সম্পদ গড়ে উঠবার পথ করে দেয়—নতুন শস্যসম্ভার, গাছপালা, ঘরবাড়ি, নতুন উপনিবেশ।

আজন্মকাল এই আড়িয়াল খাঁর তীরে বাস করে এই নিয়মই দেখে এসেছেন শ্যামাচরণ শিরোমণি। আজ দেখলেন তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মাত্র দু'বছর আগে যে উচ্ছিষ্ট সে ফেলে গিয়েছিল ভবানী কুণ্ডুর ঘাটের সামনে একটা গোটা বাঁক জুড়ে, নির্লজ্জের মত লোলুপ রসনা বাড়িয়ে আবার তারই দিকে ছুটে আসছে। এ কি সৃষ্টিছাড়া নিষ্ঠুর খেয়াল!

* ও অঞ্চলে পাকাবাড়ি তোলাকে বলে 'দালান দেওয়া'।

ভবানী কুণ্ডুর মুখে এই দুর্ঘটনার খবর শুনে এইমাত্র যে বিস্ময় তিনি প্রকাশ করেছিলেন, স্বগতোক্তির মত ধীরে ধীরে তারই পুনরাবৃত্তি করে গেলেন—তাই তো, এ কেমন করে হল !

—হল আমার পাপে।

শ্যামাচরণ প্রথমটা হঠাৎ চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন—না, না, এ আপনার মিথ্যা আশঙ্কা কুণ্ডু মশায়। একে কারো ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্যের ফলাফল বলে মনে করলে ভুল হবে। নদীর খেয়াল ! তার পিছনে যদি কোন কারণ থাকে, সকল রকম জাগতিক নিয়মের যিনি নিয়ন্তা, তিনিই তা বলতে পারেন। ওটা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে যাওয়া নিছক অনধিকার চর্চা। তাছাড়া এমন কী পাপ আপনি করেছেন বা করতে পারেন, যার ফলে—

—করেছি, পণ্ডিত মশায়, মহাপাপ করেছি, কথার মাঝখানেই অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন ভবানী কুণ্ডু, তারই শোধ নিচ্ছে আড়িয়াল খাঁ।

সমূহ বিপদের মধ্যে মানুষ যেমন কখনো নিজের অদৃষ্টকে দোষ দেয়, কখন মনে করে, এটা তারই কোনো পাপের শাস্তি, ভবানী কুণ্ডুর উক্তিকে প্রথমটা সেই ভাবেই দেখেছিলেন শ্যামাচরণ। কিন্তু তাঁর এই শেষ কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা গভীর, অকপট এবং অবিচল স্বীকৃতির সুর ধ্বনিতে হল যে, শ্যামাচরণ তাকে সাধারণ অর্থে নিতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, নিশ্চয়ই এর কোন নিগূঢ় তাৎপর্য আছে, তাঁর কোনো বিশেষ কৃতকর্ম বা বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছেন ভবানীপ্রসাদ। পরক্ষণেই সেটা স্পষ্ট হল।

ভবানী বললেন, আমার সেই মহাপাপের কথা কেউ জানে না। একজন, যে মনে মনে সন্দেহ করেছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলে নি, সেও আজ নেই। তবু আজ নিজের মুখে সব কথা আপনাকে বলতে এসেছি। না বলে আমার উপায় নেই। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। আপনি শুনুন, তার-পর বলুন কী আমার করণীয়। আপনার বিধান আমি মাথা পেতে নেবো।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকে চেয়ে ভবানী-প্রসাদ একটু ইতস্ততঃ করলেন ; তারপর হাত জোড় করে বললেন, অপরাধ নেবেন না পণ্ডিত মশায়। একথা শুধু আপনার কাছেই বলা যায়। আপনি ছাড়া আর কারো কানে যায়, সেটা আমার ইচ্ছা নয়।

—তেমন কোন আশঙ্কা এখানে নেই। তবু বলছি, না-ই বা বললেন। অনেকের জীবনেই এমন একটা গোপন অধ্যায় থাকতে পারে, কারো কাছেই যা খুলে ধরবার প্রয়োজন নেই। কী লাভ হবে তাতে করে ? সত্যিই যদি কোনো পাপ আপনি করে থাকেন, একমাত্র ঈশ্বরই আপনাকে তার থেকে মুক্তি দিতে পারেন। মানুষের হাতে সে ক্ষমতা নেই।

—জানি। তাঁর দয়া ছাড়া কিছুই হবার নয়। তবু আমার হাতে যতটুকু, তা তো আমাকে করতেই হবে ! শুনেছি সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, তা সে যত বড় কঠিনই হোক।

আপনি আমাকে তার পথ বলে দিন। সেই অনুগ্রহটুকু পারো বলেই ছুটে এসেছি। তার আগে সব কিছু আপনাকে খুলে না বলা পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

শিরোমণি বুঝতে পারলেন, এঁকে নিরস্ত করা যাবে না। সে বৃথা চেষ্টা আর করলেন না। বললেন, একান্তই যদি বলতে চান ওঘরে চলুন। দেবস্থানে বসে বলুন। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, অবিশ্যি, সব জায়গায়ই দেবস্থান। দেবতা অন্তর্যামী, যেখানে বসেই বলুন, তিনি শুনতে পান। যে কথা মনের কোণে রয়ে গেছে, মুখে বলা হয় নি, তাও তাঁর অগোচর নয়। তবু স্থান-মাহাত্ম্য বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে, যা অস্বীকার করা যায় না। আমার মনে হয়, ওখানে গিয়ে বসলে আপনি আরো শান্তি পাবেন।

—চলুন, বলে উঠে দাঁড়ালেন ভবানীপ্রসাদ।

ঠাকুরঘরের সামনেও বারান্দা রয়েছে এবং সেটি ঘেরা। তার এক দিকে পাশাপাশি দুটো উনোন খোঁড়া আছে, সেখানে পুজা-পার্বণে ভোগ রান্না হয়, আরেকটা দিক একদম ফাঁকা। নিত্য নিকানো পরিচ্ছন্ন মেঝে, সিন্দুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বিশেষ কোনো পুজো কিংবা ব্রতাদি উপলক্ষে পাড়ার মেয়েদের যখন নিমন্ত্রণ করেন গৃহকর্ত্রী, ঐখানে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়। সকলকে নয়; যাঁরা অব্রাহ্মণ কিন্তু জলাচরণীয়, তাঁরাই ওখানে বসেন। যে-সব জাত জলচর নয়, তাঁদের মেয়েরা বসেন আঙিনায়। ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থা ঘরের ভিতরে। বসবার স্থানের স্তরভেদ নিয়ে কারো মনে কোনো ক্ষোভ নেই। সকলেই একে শাস্ত্রসম্মত এবং সঙ্গত বলে মনে করেন। যে যেখানেই বসুন, গৃহকর্ত্রীর আচরণ এবং মনোভাব সকলের প্রতি সমান। সেখানে কোনো জাতিগত ভেদাভেদ নেই।

শ্যামাচরণ তাঁর অতিথিকে ঠাকুরঘরের বারান্দায় নিয়ে বসালেন। বেড়ার গায়ে কয়েকখানা গুটিয়ে রাখা কুশাসন দাঁড় করানো ছিল। একটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে আরেকটায় নিজে বসলেন। এখানে ঝাঁপের দরজা। সেটা টেনে দিয়ে ঘরের কপাট খুলে দিলেন। ভবানী যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে ঠাকুরের চতুর্দোল সোজা দেখা যাচ্ছিল। চারদিক ঘিরে গ্রামের জোলাদের তৈরী লাল কাপড়ের মশারি টাঙানো। গত সন্ধ্যায় বৈকালীর পর গৃহদেবতাকে সিংহাসন থেকে তুলে চতুর্দোলের উপরের তাকে কোমল শয্যায় নিজের হাতে শুইয়ে দিয়েছেন শ্যামাচরণ, সযত্নে মশারি ফেলে কোণগুলো গুঁজে দিয়েছেন। এখন তিনি নিদ্রিত।

চৌকাঠের তলায় নারায়ণের উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ভবানীপ্রসাদ। মাথা তুলে দু'হাত জোড় করে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। হয়তো মনে মনে কোন প্রার্থনা জানালেন দেবতার কাছে। তারপর শ্যামাচরণের দিকে চোখ ফেরাতেই তিনি স্মিত মুখে বললেন, এখানে এসে অনেকটা ভালো লাগছে, কী বলেন?

তা লাগছে। এবার যদি অনুমতি করেন, যা বলবো বলে এসেছিলাম,—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর দৃষ্টি ফেরালেন। ঠিক উলটো দিকে বেড়ার গায়ে যে জানালা কাটা ছিল, তার ভিতর দিয়ে গাছ-পালার ফাঁকে পূর্ব আকাশের খানিকটা আভাস ফুটে উঠেছিল। সেদিকে চেয়ে বললেন, রাত আর নেই!

শ্যামাচরণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, বেশ, বলুন। এখানে আপনার আসল শ্রোতা স্বয়ং নারায়ণ, আমি উপলক্ষ মাত্র। ওঁর পায়ে যদি সব কিছু অকপটে নিবেদন করতে পারেন, আপনার মনের সমস্ত গ্লানি কেটে যাবে।

॥ ৩ ॥

প্রথমে সামান্য একটু ভূমিকা, তার পরেই আসল কাহিনীতে চলে গেলেন ভবানীপ্রসাদ। সে-ও তেমন দীর্ঘ নয়। অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল।

প্রথম জীবনের কথা। বল্লভপুর তখনো এত বড় হয় নি। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। প্রথমটা সেখানেই একটা ছোট্ট চালাঘরে সামান্য কিছু মশলাপাতি সাজিয়ে নিয়ে বেচাকেনা করতেন কৃষ্ণপ্রসাদ কুণ্ডু, ভবানীর বাবা। তার থেকেই কয়েক বছর পরে এক পাশে একটা স্থায়ী দোকানের পত্তন। মুদি দোকান; তার সঙ্গে অল্পস্বল্প মনোহারী জিনিসও রাখতেন। বাজার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানও বাড়ল। 'কেষ্ট কুণ্ডু'র সততার উপরে লোকের বিশ্বাস ছিল। সেটাই তাঁর আসল মূলধন। তার সঙ্গে যুক্ত হল অধ্যবসায় এবং বোধ হয় সকলের উপরে ভাগ্য।

ভাগ্য তাঁকে আরেকটি সম্পদ এনে দিয়েছিল—একটি সুন্দরী স্ত্রী, যার মূল্য প্রথমে ততটা না বুঝলেও পরে বুঝেছিলেন। পর পর তিনটি মেয়ে পার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। তারা সকলেই মায়ের রূপ এবং গড়ন নিয়ে জন্মেছিল এবং তারই বলে বাপ-মায়ের বিনা চেষ্টাতেই এমন ঘর-বর জুটে গিয়েছিল, কেষ্ট কুণ্ডুর মত লোকের কাছে যা স্বপ্নেরও অগোচর। ওঁদের সমাজে তখন কনে-পণ চলছে। সুতরাং মেয়েদের দৌলতে আর্থিক দিক দিয়েও তিনি যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন।

তিন মেয়ের পর একমাত্র ছেলে ভবানীপ্রসাদ। অনেক তাবিজ, কবচ, পুজো-মানতের অভীষ্ট ফল। সে যখন এল, কেষ্ট কুণ্ডু তখন বেশ দাঁড়িয়ে গেছেন। মায়ের একান্ত ইচ্ছা—বামুন-কায়েত-বদ্যিদের ছেলের মত তাঁর ছেলেও লেখাপড়া শিখে দশজনের একজন হবে, মুদি দোকানের তক্তপোশে হাতবাক্সের পাশে বসে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দু'পয়সা তিনপয়সার হিসাব কষবে না। বাপের মনে অবশ্য সেই পরিকল্পনাই ছিল,—দোকানে তখন লোকের দরকার—কিন্তু তিনি স্ত্রীর প্রস্তাবে বাধা দেন নি।

গ্রামের ইস্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে সতের-আঠার বছরের ছেলে ভবানী-প্রসাদ মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে গেল তার বড়দিদির কাছে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর। ইংরেজী একেবারেই পড়ে নি, তাই এনট্রান্স-স্কুলে অনেকটা নিচের

দিকে ভর্তি হতে হল।

সহপাঠীদের সকলের চেয়েই বয়সে বেশ কিছুটা বড়, তার উপরে মায়ের হাতের সুনিপুণ যত্ন এবং আড়িয়াল খাঁ তীরের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কল্যাণে গড়নও বেশ বাড়ন্ত। ছাত্র ও শিক্ষক মহলে দুটোই পরম উপভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পড়া জিজ্ঞাসার ঠিক উত্তর দিতে না পারলে কোনো কোনো মাস্টার মশায় জিজ্ঞাসা করতেন, পুত্র-কন্যা কটি? উত্তরটা ভবানীকে দিতে হত না, দিত তার সহপাঠীরা। কেউ বলত দুটি, কেউ যোগ করত আরেকটি শীগগিরই হবে। তারপরেই সমবেত হাস্যরোল।

বাপ মুদির দোকান করে—খবরটা কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। দু-একজন মাস্টার মশায়ের হাতে সে-অস্ত্রটিও কম লোভনীয় ছিল না। ইংরেজি ব্যাকরণে সামান্য ভুল হলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতেন, লেখাপড়া তোমার কম্ম নয়। সময় নষ্ট না করে কৌলিক পেশা ধরো গে। শেষ পর্যন্ত সেই পাঁচফোড়নের পোঁটলাই তো বাঁধতে হবে বাপু!

লেখাপড়ায় ভবানী কুণ্ডুর বিশেষ চাড় ছিল না। তার উপরে এ হেন পরিবেশ। যখন-তখন ইচ্ছা করত, ছেড়েছুড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়। তাতে করে বাবার দিক থেকে কোনো আপত্তি উঠবে না, মনে মনে তিনি বরং খুশী হবেন। কিন্তু মা? সেখানে ভীষণ বাজবে। মায়ের সেই বেদনাহত মুখ-খানা ভবানী যেন স্পষ্ট দেখতে পেত। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবার ইচ্ছা মনের কোণেই মিলিয়ে যেত। বাধাটা মায়ের কাছ থেকে আসত অলক্ষ্যে, নীরবে, কিন্তু এখানে বসে তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি অর্থাৎ বড়দিদি সেটা সরবে, এবং সাক্ষাৎ-ভাবে প্রয়োগ করত। স্বামী এবং তার পরিজনদের কাছে সুরবালার গৌরব ছিল কেবলমাত্র রূপের। তার মূল্য আর কত! আয়ুও বেশী নয়। ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে, মানুষ করে তুলতে পারলে সেইটাই হবে তার আসল এবং স্থায়ী গৌরব। তার আড়ালে তার অকিঞ্চিৎকর পৈতৃক পরিচয় ঢাকা পড়ে যাবে। তার শ্বশুর-কুলের দুর্বল স্থানও ঐখানে। তাদের সিন্দুকে সোনারূপো যতই থাক, পেটে বিদ্যার অভাব। সেই শূন্য যদি ভাইকে দিয়ে পূরণ করা যায়, উভয় কুলেই সুরবালার সেদিন জয়জয়কার।

সুতরাং নিজের ইচ্ছা না থাকলেও বড়দিদির তাড়নায় ভবানীকে রোজ খেয়ে-দেয়ে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যেতে হত। সেখানকার সব লাঞ্ছনা মাথায় পেতে না নিয়ে উপায় ছিল না। তাতেও নিস্তার নেই। স্বামীকে বলে ভাইয়ের জন্যে একজন ইংরেজির মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন সুরবালা। সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে গিয়ে বসতে হত। তিনি ঠিকমত পড়াচ্ছেন কিনা, দেখবার জন্যে দরজার আড়ালে আড়ি পাতত বড়দিদি। কোনো তরফে সামান্য ত্রুটি দেখলে সেখান থেকেই চাপা গলায় ধমক দিত। দৃশ্যত সেটা ভাইয়ের উদ্দেশে হলেও, তার পরোক্ষ প্রয়োগ ছিল মাস্টারের উপর, এবং তিনি সেকথা বিলক্ষণ জানতেন ও সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যেতেন।

এত সব কড়াকড়ি সত্ত্বেও ভবানীপ্রসাদ হয়তো একদিন মায়ের আকাঙ্ক্ষা

এবং বড়দিদির উচ্চাশা অপূর্ণ রেখেই বল্লভপুরের গদিতে গিয়ে বসত—তার নিজের মন এবং বাবার ইচ্ছা সেইদিকেই তাকে টানছিল—কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। এই দিদির বাড়িতেই কোথা থেকে তিনি একটি নতুন আকর্ষণ জুটিয়ে এনে দিলেন। তারই হাতে বাঁধা পড়ল ভবানী কুণ্ডু। এমন বাঁধা যে, ভবিষ্যৎ জীবনের যে-সাদামাটা পথটা সে মনে মনে এঁকে রেখেছিল এবং তার হয়ে ভেবে রেখেছিলেন তার অভিভাবকেরা, সেটা হঠাৎ মোড় ফিরে এমন দিকে চলে গেল, যেখানে সুবিপুল সম্ভাবনা অপেক্ষা করে আছে।

বাইরে থেকে দেখতে বস্তুটি অতি সামান্য—একটি বারো-তেরো বছরের শ্যামাঙ্গী মেয়ে, গোলগাল গড়ন, বাটার মত একখানি সাদাসিধে মুখ, তার উপরে ভাসা-ভাসা ভীরু দুটি চোখ। নাকটাও টিকলো নয়, বরং চাপা এবং সেখান থেকে যে মস্তবড় মুক্তোর নোলকটি ঝুলছিল, তার কাছে আরো চাপা পড়ে গেছে। তার ছোট্ট দেহখানিতে আকর্ষণ করবার মত কিছুই ছিল না, বিশেষ করে ভবানীপ্রসাদের মত ছেলেকে, চোখ ফুটবার পর থেকেই যে তার মাকে দেখেছে, আরেকটু বড় হয়ে দেখেছে তিন দিদিকে, বিধাতা যেখানে রূপের পসরা উজার করে ঢেলে দিয়েছেন, চাইবার মত বাকী কিছু রাখেন নি। কিন্তু সংসারে সবই কি স্বাভাবিক পথে চলে, না সব কিছুর কার্যকারণ বোঝা যায়? এখানে প্রতিদিন যা ঘটে, তার বেশির ভাগই বিস্ময়কর, যার অর্থ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভবানী কুণ্ডুর বেলায় তারই পুনরুক্তি হল। বড়দিদির পিসতুতো ননদ নোলক পরা সৌদামিনীকে তার ভীষণ ভাবে ভালো লেগে গেল।

তিন-চারদিন নানাভাবে অক্লান্ত চেষ্টার পর গোধূলির ম্লানছায়ায় বাড়ির পিছনে জামগাছের আড়ালে একখানি কালো কম্পমান চুড়ি পরা কোমল হাত যখন পোষমানা পাখীর মত তার বলিষ্ঠ মুঠির মধ্যে ধরা দিল, তখন থেকে ভবানী স্থির করে ফেলল, একে না পেলে তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ।

সুরবালা সবই বুঝতে পেরেছিল। ভাইএর গতিবিধি শুধু নয়, তার মনের প্রতিটি অলিগলি তার নখদর্পণে। ঘটনাচক্রের এই আকস্মিক বিবর্তনে তার রুষ্ট হবার কথা। এটা আর যা-ই হোক, ভবানীর পড়াশুনোর পক্ষে অনুকূল নয়। তবু মনে মনে খুশী হয়েছিল সুরবালা। তার মনে তখন আর একটা উচ্চাশার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

পিসশাশুড়ীর সঙ্গে তার এই কালো মেয়েটা যখন দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এল, এর দিকে সে তাকিয়েও দেখে নি। এর উপরে ভবানীর নজর পড়তে পারে, সে সম্ভাবনাও ছিল তার কল্পনার বাইরে। সেই আশ্চর্য অঘটন যখন ঘটল, তখন মনে হল এর মধ্যে হয়তো বিধাতার কোন শুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। তার পিসশ্বশুর বিপুল সম্পত্তির মালিক। আসল ব্যবসা ছিল তেজারতি, তার থেকে কিছুদিন আগে একটা মোটা মুনাফার জমিদারি কিনে ফেলেছেন। ঐ সদু ওদের একমাত্র জীবিত সন্তান। তার আগে দু-তিনটি এবং পরে আরো একটি হয়েছিল, অল্প বয়সেই মারা গেছে। তারপর অনেক দিন হয় নি; দেখে যা মনে হয়, তেমন কোনো সম্ভাবনা আর নেই। বাড়ির প্রবীণরাও তাই বলছেন।

সুতরাং এ মেয়ে কালো নয়, কালোসোনা। ভাইএর যখন নজরে লেগেছে, তখন লেগে পড়তে দোষ কি? ওদের যে এই স্বাস্থ্যবান প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে পছন্দ হবে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

পিসশাশুড়ী সংসার ফেলে এসেছেন, বেশীদিন দেরি করবার উপায় ছিল না। সদুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা; কিন্তু সুরবালার অনুরোধে কিছু-দিনের জন্যে রেখে গেলেন। মেয়েরও দেখা গেল, থেকে যাবার প্রবল ইচ্ছা। সুরবালা দুদিকেই রাশ একটুখানি ঢিলে করে রাখল, যাতে মাঝে মাঝে আড়ালে আবডালে দেখাশোনার দরজাটা খোলা থাকে। ভাইএর মনের গোপন অভিলাষ যে তার অবিদিত নেই, একথা তার কাছে গোপন রাখল না, কিন্তু সে বিষয়ে তাকে বিশেষ ভরসাও দিল না, বেশ খানিকটা হাতে রেখে দিল। স্পষ্টভাষায় না হলেও মুখের রেখায় এবং চোখের তারায় বোঝাতে কিছু বাকী রাখল না যে রীতিমত লেখাপড়া না শিখলে ওদিকে কোন আশা নেই। কমের পক্ষে 'এন্ট্রেন্স্'টা যে পাস করতে পারে নি, তেমন ছেলের হাতে ওরা মেয়ে দেবে না।

অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল বড়দিদি। কয়েকটা দিন মেলামেশার সুযোগ দিয়েই হঠাৎ একদিন সৌদামিনীকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলল। এর মধ্যে যে তার নিজের কোন হাত আছে সেকথা রইল অপ্রকাশ্য। সবাই জানল এবং সেই সঙ্গে ভবানীও, যে স্বাভাবিক ভাবেই সে তার মা-বাবার কাছে চলে গেছে, দু-তরফের মুরুব্বীরা বসে তার বন্দোবস্ত করেছেন। এখানেও যে বড়দিদি, সেকথা অনেক পরে জানতে পেরেছিল ভবানীপ্রসাদ। তখন জানলে হয়তো উল্টো ফল হত।

কামনাকে যদি অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তার সব চেয়ে বড় ইন্ধন হল সেই কামনার ধনকে নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া। এই সহজ সত্যটিকেই রূপ দিয়েছিল সুরবালা, নিজেকে নেপথ্যে রেখে। তার ফলও পেয়েছিল, সকলেরই যেটা ঈপ্সিত সুফল। অনেকটা মরা গাঙে জোয়ার আসার মত। ভবানীর নেতিয়ে পড়া পাঠেচ্ছা হঠাৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত এন্ট্রান্সের উঁচু বেড়া পার হতে পারে নি, তার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিল। তার বেশি আর দরকার হয় নি। সৌদামিনীর বাবা-মার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সুরবালার মনটা ভিতরে ভিতরে কদিন খুঁতখুঁত করেছিল, 'এন্ট্রেন্সে'র মোহ সহজে কাটাতে চায় নি। তাছাড়া শ্বশুরবাড়িতে সে বড় মুখ করে প্রচার করেছিল, ভবানীর পাসের খবর যেদিন আসবে সেদিন গোটা সমাজ নেমন্তন্ন করে এমন ভোজের আয়োজন করবে, এ অঞ্চলে যা কেউ কোনো দিন দেখে নি। সে মুখ রইল কই?

ক্রমশঃ দেখা গেল ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তখন এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, তার এত বড় শ্বশুরকুলে অতটা দূরই বা কে উঠতে পেরেছে! আর এদিক দিয়ে যদি পুরো সাফল্য নাও এসে থাকে, আরেক দিকের লাভ সেটা অনেকখানি পুষিয়ে দিয়েছে।

ভবানীর মা কিন্তু এই লাভকে তেমন বড় করে দেখেন নি, কালো মেয়ে শুনে বরং দমে গিয়েছিলেন। মেয়ে বুঝিয়েছিল, 'কী যে তুমি বল মা? রঙ ধুয়ে জল

খাবে নাকি ? কত বড় ঘর, কত নামডাক তাদের ! তাছাড়া বৌ তো তোমার খালি হাতে আসছে না, সাথে করে যা আনছে—' বাকীটা কথায় না বলে চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মা সেদিকটাকে একেবারেই আমল দেন নি। আগের সূত্র ধরেই বলেছিলেন, রঙ না হয় না হল, দেখতে শুনতে কেমন ? গড়ন, মুখশ্রী ?

—মোটামুটি কোনটাই মন্দ নয়, তবে 'আহামরি'ও বলা যায় না। গেরস্তঘরে যেমন হয়ে থাকে—

—গেরস্তঘরে তো সব রকমই হয়। তোরাও তো গেরস্তঘরেই জন্মেছিস।

সুরবালা মায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বাবার শরণ নিয়েছিল। কেষ্ট কুণ্ডুর তখন টাকার দরকার। মেয়ের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছিলেন। আবার কোথা থেকে কোন্ বাধা এসে জোটে ? শুভকার্যে কালবিলম্ব করেন নি। তাঁর এই তৎপরতার জন্যেই ভবানীর এন্ট্রান্স পরীক্ষা আর দেওয়া হল না।

একটিমাত্র বৌ ; তাও মনের মত হল না বলে ভবানীর মা কারো কাছে নালিশ জানান নি, বৌকেও কোনরকম অযত্ন বা অনাদর করেন নি। ছেলের পড়া বন্ধ হল, একটা পাসও দিতে পারল না, শেষ পর্যন্ত সেই দোকানে গিয়েই বসতে হবে—এর জন্যে তাঁর মনে যে ক্ষোভ ছিল, তা মনের কোণেই চেপে রেখেছিলেন, কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। তা হলেও ভবানী বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে বাপের ছেলে। 'বড় হবার' নেশা তখনই তাকে পেয়ে বসেছে। সেইদিকেই ঝুঁকে পড়ল। বাবার শিক্ষা ও উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত হল শ্বশুরের অর্থানুকূল্য। অন্তরের এক কোণে মায়ের জন্যে যে দুর্বল স্থানটুকু ছিল, বহু বাধা এবং লাঞ্ছনার মধ্যেও একদিন যা তাকে বড়দিদির বাড়ি এবং স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে আসতে দেয় নি, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সোদামিনীর রূপ ছিল না, কিন্তু রূপোর জলুস সে অভাব কারো চোখে পড়তে দেয় নি। শ্বশুরের কাছে সে এক পরম সম্পদ ; শুধু বর্তমানের নয়, তার চেয়েও বেশি, ভবিষ্যতের। আরো একটা কারণে বধূর প্রতি একটি সূক্ষ্ম আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। তিনি নিজে সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হলেও সুপুরুষ ছিলেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যাদের কাছে ঐখানে ছিল তাঁর পরাজয়। তাদের দিকে তাকাতেন আর কিসের একটা যেন লজ্জা তাঁকে খচ্‌খচ্ করে বিঁধত। মনে হত নিজের পরিবারে তিনি যেন একঘরে হয়ে আছেন। ওরা সব একদলে, তিনি আলাদা। এই বধূটি এসে এতদিনে তাঁকে সেই গোপন লজ্জা থেকে মুক্তি দিল। তাঁর একাকিত্ব ঘুচল। ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারলেন, এই পরের মেয়েটি তাঁর অন্তঃপুরে পা দিয়েই কেমন করে যেন তাঁর একান্ত আপন-জনের আসন দখল করে ফেলেছে।

ভবানীর নিজের ভাই ছিল না, কিন্তু খুড়তুতো ভাই ছিল কয়েকজন। তারা বল্লভপুর বাজারের মুদি-মায়-মনোহারী দোকানের আধাআধি অংশীদার। কেষ্ট কুণ্ডু ছোট-ভাইএর সঙ্গে একযোগে কারবার শুরু করেছিলেন। তার অকালমৃত্যুর পর সেখানকার যা কিছু উন্নতি সবই তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল। টাকা যেটা

খাটাছিল, তাও তাঁর একার। তব্ নাবালক ভাইপোদের তিনি কোনো দিক দিয়ে বঞ্চিত করেন নি, তারা যেমন সেয়ানা হয়ে উঠেছে, একটি একটি করে দোকানে এনে বসিয়েছেন। ভবানীকে আর তার মধ্যে টানলেন না। বিয়ে-থা চুকে যাবার পর নিজের অংশটা ভাইপোদের হাতে তুলে দিয়ে যে টাকা পেলেন, তার সঙ্গে নিজস্ব সঞ্চয় এবং বাকীটা নতুন বেয়াইএর কাছ থেকে ঋণ—এই তিনটি অঙ্ক জড়ো করে ছেলেকে দিয়ে নতুন ব্যবসায়ের পত্তন করলেন—পাটের আড়ত। নিজে রইলেন পিছনে, শক্ত হাতে হাল ধরে।

ঋণটা যে আসলে ঋণ নয়, পারিবারিক ম্লধনের সামিল, একদা তার সঙ্গে আরো একটা মোটা অঙ্ক যুক্ত হবে, সেকথা মনে রেখেই নতুন উদ্যোগের খসড়া তৈরী হল। ছেলেকেও পরামর্শ দিলেন সেই দিনটির দিকে লক্ষ্য রেখে সেইমত এগিয়ে যেতে। পরামর্শের দরকার ছিল না। ভবানী নিজেই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিল এবং তার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা অধীরতা দেখা দিয়েছিল, যদিও শ্বশ্রের বয়স তখনো খ্ব বেশী নয়।

পিতা-প্ত্র দ্জনেই যখন তাদের নতুন ব্যবসা নিয়ে মত্ত, একটি বিশেষ দিনের স্নিশ্চিত প্রত্যাশায় বিস্তৃত পরিকল্প রচিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে বসে এক স্রসিক প্র্ষ ওদের হিসাব-নিকাশের মাঝখানে এমন একটা গোলমেলে দফা ঢ্কিয়ে দিলেন, যাতে করে সমস্ত কাঠামোটাই ভেঙে পড়ল।

একটি দ্ঃসংবাদের অপেক্ষায় এঁরা দিন গ্নছিলেন, তার জায়গায় এল এক অপ্রত্যাশিত শ্ভ সংবাদ।

সংবাদটা বয়ে এনেছিল একখানা চিঠি। সৌদামিনীর উদ্দেশে তার এক 'জেঠীমার' জবানিতে লেখা। নিজের জ্যাঠাইমা নন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী। অল্পবয়সে বিধবা হবার পর ওদের সংসারেই আছেন। এসেছিলেন হয়তো আশ্রিত হয়ে, তারপর একদিন গোটা পরিবারের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সৌদামিনীর মা নামেমাত্র গৃহিণী, কিন্তু আসল গৃহকর্ত্রী ঐ 'জেঠীমা'।

চিঠিখানা যাকে-তাকে দিয়ে লেখান নি 'জেঠীমা'। বিষয়ের গ্র্ত্ব বিবেচনা করে পাড়ার কোন পাকা ও প্রবীণ ব্যক্তিকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। লেখনের ছাঁদ এবং ম্সাবিদার ম্ন্সিয়ানাই তার প্রমাণ।

চিঠিটা সৌদামিনীকে লেখা হলেও, লেফাফার উপরে শ্ধ্ গৃহকর্তার নাম, তখনকার দিনের যা রীতি। ঠিকানার 'পাঠ'ও একট্ প্রাচীন ধরনের—"শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ কুণ্ড্ মহাশয় মহিমবরেষ্"। প্রনো ধাঁচের জড়ানো অক্ষরে ভুসা-কালিতে লেখা এক আনা দামের মহারাণী-মার্কা খামখানা যখন কেষ্ট কুণ্ড্র হাতে এসে পৌঁছল, তিনি বেশ কিছ্ক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। দ্টি ভ্র্র মাঝখানে কুঞ্চন দেখা দিল। একবার এপাশ ওপাশ উলটে আলোর দিকে তুলে লেফাফার একটা ধার ছিঁড়ে ফেললেন। পড়তে পড়তে শ্ধ্ ভ্র্ নয় সমস্ত কপালটাও কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ঠোঁট দ্টো ফাঁক হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বিহ্বলতা দেখা দিল, যেন বিষয়টা ঠিক ব্ঝে উঠতে পারছেন না,

যদিও ভিতরে কিঞ্চিৎ সাধুভাষার প্রয়োগ ছাড়া না বুঝবার মত কোন জটিলতা ছিল না!

চিঠিখানা যখন এল তিনি গদিতে বসে কি একটা হিসাব দেখছিলেন। তাতে আর মন দিতে পারলেন না। খাতাখানা বন্ধ করে দিলেন। ওটা তো একটা তুচ্ছ হিসাব। ওর চেয়ে অনেক বড় এবং ব্যাপক হিসাব, যার উপরে শুধু নির্ভর করেন নি, নিজের ও ছেলের (বিশেষ করে ছেলের) বিশাল ভবিষ্যৎ দাঁড় করিয়েছিলেন, এই ভুসাকালির লেখা সামান্য কাগজখানা তার ভিত ধরে সজোরে নাড়া দিয়েছে। অথচ, কী আশ্চর্য, এই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে তাঁরা একেবারে গণনার বাইরে রেখে দিয়েছিলেন!

চারদিকে লোকজন কাজ করছে। প্রত্যেকের একটা করে চোখ যে মনিবের দিকে পড়ে আছে, সেটা কোন দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। অনেক পোড়খাওয়া মানুষ। ভিতরে যা-ই ঘটুক, তার কোন চিহ্ন বাইরে ফুটে বেরোতে দেন না।

চিঠিখানা ভাঁজ করে ধীরে ধীরে খামের মধ্যে ভরলেন। তারপর একটি চাকরকে ডেকে বললেন, বৌমাকে দিয়ে আয়।

সোদামিনী পড়তে জানত না। খামখানা হাতে করে উলটে পালটে দেখল, আরেকবার জেনে নিল, শ্বশুর সত্যিই তার হাতে দিতে বলেছেন কিনা, তারপর একরকম ছুটতে ছুটতে চলে গেল ভবানীর ঘরে। ভবানী তখন গদিতে বেরোবার আয়োজন করছিল। স্ত্রীকে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমেই নজর পড়ল তার হাতের খামখানার দিকে। বলল, কী ওটা?

—চিঠি।

—কার চিঠি?

—কি জানি? বাবা নাকি আমাকে দিতে বলেছেন।

—তোমাকে দিতে বলেছেন! দেখি।

পড়তে পড়তে ভবানীর মুখের চেহারাটা প্রথমে গম্ভীর, ক্রমশঃ ফ্যাকাশে এবং তারপরে হঠাৎ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সোদামিনী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। আরেকটু কাছে সরে এসে শুকনো গলায় প্রায় ফিস ফিস করে বলল, কিসের চিঠি? কোত্থেকে এসেছে?

—রাণাঘাট থেকে!

যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই বলতে চেষ্টা করল ভবানী, কিন্তু গলার স্বরে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য চাপা রইল না।

—রাণাঘাট থেকে! এবার রীতিমত চমকে উঠল সোদামিনী, কোন খারাপ খবর নেই তো? ভালো আছে সকলে? মা, বাবা, জেঠীমা?…

—হ্যাঁ।

—তবে অমন করছ কেন? পড় না কি লেখা আছে?

ভবানী তার আগেই চিঠিটা খামে ভরে ফেলেছে। খামটা স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে

ধরে বলল, আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নাওগে।

—কেন ? আর কাউকে দিয়ে পড়াবো কেন ? তা হলে কি—

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সৌদামিনী। যে নিশ্চিত অমঙ্গল মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল, তাকে মুখে আনতে পারল না।

ভবানী ততক্ষণে খাটের বাজুর উপরে খামখানা রেখে বেরিয়ে পড়েছে। সৌদামিনী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল শাশুড়ীর কাছে। তিনি রান্না করছিলেন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কী হল ! কাঁদছ কেন ? হাতে ওটা কী ?

সদু তখন উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছে। শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে চিঠি-সমেত ডান হাতখানা তাঁর দিকে তুলে ধরল, মুখে কিছুই বলতে পারল না। তিনি সেটা ধরে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, কার চিঠি ? কী আছে এতে ?

বৌ মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

—কী মুশকিল ! ভব কোথায় গেল ? দ্যাখ্ তো বিন্দী, সে ঘরে আছে না বেরিয়ে গেল !

বিন্দী-ঝি বাটনা বাটছিল। মুখ না তুলেই জবাব দিল, দাদা এটটু আগে বেইরে গ্যাছে। বৌদিদি তো সেখানেই ছেল। ঐ চিঠি নিয়ে দুজনে কী কথা হল। তার পরেই তো দেখছি কাঁদতে কাঁদতে আসছে। বাপের বাড়ি থেকে কারো অসুখ-বিসুখের খবর এসে থাকবে।

—কার অসুখ ? তোমাকে কিছু বলে গেল না ?···বৌ-এর দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন গৃহিণী।

বৌ এতক্ষণে কথা বলতে পারল। ভবানী যা বলে গেছে,—আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নাওগে—জানিয়ে দিল শাশুড়ীকে। তিনি বিস্মিত এবং কিছুটা বিরক্ত হলেন—ওমা, সে কী কথা ! এখানে আবার কে চিঠি পড়ে দেবে ? বিন্দী, তুই ওঠ্, দ্যাখ্ দিকিন, ও-বাড়ির ছেলেগুলো কেউ আছে কিনা।

পাশেই তাঁর দেওরের বাড়ি। তার ছেলেরা যদি কেউ থেকে থাকে, তখনই ডেকে আনবার নির্দেশ দিয়ে ঝিকে রওনা করে দিলেন। সৌদামিনীকে বললেন, তুমি কেঁদো না বৌ। মা-কালী না করেন, তেমন কোনো খবর হলে ভব নিশ্চয়ই বলে যেত।

ঝিকে আর ও-বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। খিড়কি পার হবার আগেই চাকরের মাথায় 'বাজারের' ধামা চাপিয়ে মঙ্গল ভুঁইয়া ব্যস্ত হয়ে অন্দরের উঠোনে এসে ঢুকল।

মঙ্গল দোকানে জাবেদা লেখে, খদ্দেরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিলের টাকা আদায় করে, আর দরকার মত সংসারের ফাইফরমাশ খাটে। বিদ্যা বেশী নয়, কিন্তু মনে মনে তার জাঁক আছে। জায়গা বুঝে সেটা দেখাতে ছাড়ে না। ঝি-চাকরদের সেটা জানা আছে। তাই ঐ বিশেষ জায়গাটিতে খোঁচা দিয়ে তারা কিঞ্চিৎ কৌতুক উপভোগ করে থাকে ; বিশেষ করে বিন্দী।

মঙ্গলকে উঠোনে ঢ্কতে দেখেই সে দ্র থেকে চেঁচিয়ে উঠল, এই যে ভুঁইয়া মশায় এসে গ্যাছে, মা। কাছে এসে বলল, একটা চিঠি পড়ে দিতে পারবেন তো ?

মঙ্গল যথারীতি উত্তপ্ত হল। ম্খ বিকৃত করে বলল, কেন ? তোমার মত অত বড় পণ্ডিত থাকতে আমার আর দরকার কী ?

বিন্দী আর একটা কি ফোড়ন দিতে যাচ্ছিল। গিন্নীমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। মঙ্গল আসতেই সোদামিনী ঘোমটাটা একট্ নামিয়ে দিয়েছিল। তা হলেও তার অশ্র্সজল চোখ দ্টো তার নজরে পড়ে থাকবে। ফোঁপানির শব্দও হয়তো শ্নতে পেয়েছিল। কৌতুকের স্রে বলল, তোমার বৌ-এর আবার কী হল মা ? বাপের বাড়ি যাবার বায়না ব্ঝি ?

গ্হিণী ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। মঙ্গলের হালকা কথায় কান দিলেন না। বৌ-এর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে ধরে শ্ঙ্ক স্বরে বললেন, চিঠিটা একবার পড় দেখি, মঙ্গল ? কী ভাবনায় যে ফেলে ছেলেটা !

মঙ্গল জিনিসটার গ্র্ত্ব ব্ঝতে পেরে তাড়াতাড়ি ফতুয়ার পকেট থেকে নিকেল ফ্রেমের চশমাটা বের করে চোখে লাগিয়ে পড়তে শ্র্ করল। শাশ্ড়ী বৌ-এর তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা দ্ষ্টির সামনে তার ম্খখানা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সবট্কু শেষ করবার আগেই সে বিপ্ল উল্লাসে ফেটে পড়ল—ভাবনার কী আছে ? রীতিমত স্খবর ! আমাদের বৌমার ভাই হবে !

—ওমা, তাই নাকি ? এবার গ্হিণীও কলবর করে উঠলেন, দ্যাখ দিকিন কী কাণ্ড ! তাই ভব লজ্জায় বলতে পারে নি। তা বৌকে না বলতে পারিস, আমার কাছে বলে যা ! হতভাগা ছেলে ! ইস, কী চিন্তাই না হয়েছিল ?···মঙ্গল, তুমি একট্ দাঁড়িয়ে যেও। দিন ব্ঝে, ঠিক মঙ্গলবারেই এসে পড়েছে খবরটা। ষোল আনা প্জো দিয়ে এসো কালীবাড়ি। যাও তো বৌ, বাক্স খ্লে একটা টাকা বার করে দাও।

আঁচল থেকে চাবির গোছা খ্লে বৌ-এর হাতে দিয়ে হাসিম্খে রান্নাঘরে গিয়ে ঢ্কলেন। বিন্দী বলে উঠল, খালি প্জো হবে না মা, আমাদের সব পেট ভরে রসগোল্লা খাওয়াতে হবে। আর একখানা নতুন ডুরে কাপড় নেবো বৌদিদির কাছ থেকে—

—পেট ভরে রসগোল্লা, তার ওপরে নতুন ডুরে কাপড়। ফর্দটা যে বড় ছোট হয়ে গেল ? আর কিছ্ চাই না ?—এই শ্লেষাত্মক প্রশ্নটি মঙ্গলের।

জবাবও এল সঙ্গে সঙ্গে। ভুঁইয়ার একেবারে ম্খের কাছে হাত ঘ্রিয়ে বলল বিন্দী, চাই না চাই, সে আমি ব্ঝবো, তোমার তাতে কী ? তোমার যদি কিছ্ নেবার ইচ্ছা থাকে—

—সেটা আমি না চাইতেই পাবো, ব্ঝলি ? মঙ্গল ভুঁইয়া চেয়ে নেয় না, এমনিই পায়।

গ্হিণী এসে ঝগড়াটা থামিয়ে দিলেন—পাবে বৈ কি বাবা ! বৌ তোমাদের

সকলকে খুশী করে দেবে। মা-কালীকে ডাক, এবার একটি পুত্র-সন্তান হোক অত বড় বংশের নামটা যেন থাকে। হবার তো কোন আশাই ছিল না। এ্যাদ্দিন পরে মা যদি মুখ তুলে চাইলেন, যেন ভালোয় ভালোয় খালাস হতে পারে বেয়ান। ক-মাস হল কিছু লিখেছেন ? সবটা পড় দিকিনি শুনি ?

মঙ্গল ভুঁইয়ার চোখে আবার চশমা উঠল। চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে শোনাল। তার থেকে জানা গেল, এই সবে চার মাস, আর মাসতিনেক পরে সাধের সময় সধুকে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন 'জেঠীমা', শুভ সংবাদ জানিয়ে এবং বৌকে পাঠাবার 'অনুমতি প্রার্থনা' করে 'যত শীঘ্র সম্ভব' বেয়াই ও বেয়ানের কাছে চিঠি আসছে।

—সে আর বলতে হবে কেন ? সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিলেন গৃহিণী, নিশ্চয়ই পাঠাবো। দরকার হলে ভালোয় ভালোয় খালাস না হওয়া পর্যন্ত থেকে আসবে। আহা পাঁচটি নয়, সাতটি নয়, ঐ একটি মেয়ে। কাছে থাকবে বৈকি।

সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। সাধ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার মাসখানেক আগেই বৌকে রওনা করে দিয়েছিলেন কেষ্ট কুণ্ডু। চিঠিখানা পাবার পর থেকে সৌদামিনীর সমস্ত রূপটা তাঁর চোখে একেবারে বদলে গিয়েছিল। তাকে যেন আর সইতে পারছিলেন না। চাপা এবং চালাক মানুষ। বাইরের ব্যবহারে বা কথাবার্তায় ভিতরকার মনোভাব প্রকাশ পেত না। মাঝে মাঝে তার তাপটা বেরিয়ে পড়ত। সৌদামিনী শুধু সেটুকুই বুঝতে পারত। তার শ্বশুরের কাছ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে নিয়েছিল।

সরিয়ে নিয়ে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, যেটা তার একান্ত এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সেখানকার সে আসনখানাও যেন ঠিক জায়গায় নেই, বেশ খানিকটা সরে গেছে। স্বামীর চোখে যে ঘোর ছিল, যে আবেশ এতদিন তাকে জানতে দেয় নি সে কালো, তার রূপ নেই, তাকেও আর খুঁজে পাচ্ছিল না। সেখানে যেন কিসের এক হতাশা এসে বাসা বেঁধেছে। তার সঙ্গে একটা চাপা বিরক্তির কুণ্ডন। মনে মনে যা চাওয়া যায়, তার থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হলে যা হয়। সৌদামিনী বুঝত না, কী চেয়েছিল এরা তার মত একটা সামান্য মেয়ের কাছে, আর কেমন করেই বা ধরা পড়ল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি সে দিতে পারছে না কিংবা তার কাছে নেই! সে তো যা ছিল তাই আছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে সবাইকে খুশী করবার, সকলের মন যোগাবার, সেই প্রথম দিন থেকে যা করে এসেছে।

সংসারের কি বিচিত্র বিধি! প্রথম যেদিন কুণ্ডুবাড়ির বৌ হয়ে এল সৌদামিনী, কেউ তাকে বলে দেয় নি, এদের মধ্যে তাকে নিয়ে যে-সব আলোচনা হয়েছিল, তাও তার কানে যায় নি, নিজে থেকে বুঝবার মত বয়স নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিই বা কতটুকু, তবু নারীজাতির ললাটে বিধাতা যে একটি তৃতীয় নয়ন বসিয়ে দিয়েছেন, বোধহয় তারই সাহায্যে তার মনে হয়েছিল, এ সংসারের তিনটি মানুষের মধ্যে দুজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে আপন করে নিয়েছেন—শ্বশুর এবং স্বামী, একজন পারেন নি। তিনি শাশুড়ী। কটা বছর না যেতেই হাওয়ার গতি বদলে গেল। যে-দুটো জানালা দিয়ে প্রবল বেগে এসে তাকে

কখনো চঞ্চল, কখনো অভিভূত করে দিচ্ছিল, সেখান থেকে ঘুরে গিয়ে মন্দধারায় বইতে লাগল অন্য পথে। অথচ তার দিক থেকে নতুন কিছুই করা হয় নি। নিজ হাতে সে কোনোটা বন্ধ করে নি, কানোটা খুলেও দেয় নি। তবু স্বাভাবিক কারণেই অজ্ঞাতসারে সে ক্রমশঃ এই তৃতীয় জানালার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

ভবানীপ্রসাদ বলেছিলেন, এর পর থেকে সংসারের নিত্য প্রয়োজনে যখনই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হত, তার চোখের দিকে নজর পড়তেই মনে হয়েছে, কিসের একটা বোবা বিস্ময় সেখানে স্থির হয়ে আছে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সে শাশুড়ীর কাছে ফিরে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সেই বিহ্বলতা আর থাকত না।

ধীরে ধীরে সব সয়ে গেল। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবসরই বা কোথায় ?

তাই হয়, মনে মনে ভাবলেন শ্যামাচরণ। তিনি নদীর পারের মানুষ। 'জীবন-নদী' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে তাঁর কাছে। তিনি দেখেছেন, নদীর স্রোত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কাল যে পথে সে তীব্র বেগে বইছিল, আজ সেখানে জেগে ওঠে চর। কদিন আগেও যেখানে ছিল মাটি কিংবা বদ্ধজলা, হঠাৎ দেখা গেল, তারই বুকের উপর দিয়ে সে নতুন পথ করে নিয়েছে। মানুষ প্রথমটা অবাক হয়ে ভাবে, এ কী হল! তারপর আর তাকিয়েও দেখে না।

ভবানী কুণ্ডু যে আত্মকাহিনী শোনাতে এসেছিলেন, বিশেষ করে যে উদ্দেশ্য নিয়ে শোনাচ্ছিলেন, তার পক্ষে এই পূর্বাভাস কিঞ্চিৎ ব্যাপক হলেও অপরিহার্য। এর পরের প্রায় সব অংশটাই গতানুগতিক।

যথাসময়ে রাণাঘাট থেকে খবর এসে পৌঁছল, সংবাদ শুভ। একখানা খামের ভিতর দুখানা চিঠি—সোদামিনী লিখেছে শাশুড়ীকে, তার 'জেঠিমা' জানিয়েছেন বেয়াইকে। দুটোই বোধ হয় সেই একই লেখকের রচনা। বয়ানের বাঁধুনি তেমনি পাকা।

সোদামিনীর বাপের বাড়ির কুলদেবতা ছিলেন বালগোপাল। কয়েক বছর থেকে জন্মাষ্টমী এবং অন্যান্য পালপার্বণে উৎসবের ঘটা প্রচুর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফল ফলল। বালগোপাল মুখ তুলে চাইলেন। গৃহিণীর কোলে এল পুত্রসন্তান এবং তার আগে পর পর কয়েকবার যা ঘটেছে, এবারে শুরু থেকেই তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। ক্ষুদ্র, ক্ষয়িষ্ণু বা ক্ষীণজীবী শিশু নয়, সুস্থ-সবল কোলজোড়া ছেলে। শোনা গেল, বাড়ের দিক দিয়েও সে তার অগ্রগামীদের অনুসরণ না করে, সাধুভাষায় যাকে বলে, "শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।"

এসব খবর সোদামিনীই যোগাত তার শাশুড়ীকে। ভবানীপ্রসাদ শুনত আর তার দু কানের ভিতরটা জ্বালা করতে থাকত। শ্যালকের জন্মসংবাদ পাবার

পরেও একটা আশা তার মনের কোণে লেগেছিল—এ আর কদ্দিন ? এই চিঠি-গুলো একটার পর একটা এসে সেটুকুও আর টিকতে দিল না।

নিরাশা আর ভগ্নাশার মধ্যে অনেক তফাত। প্রথমটার মধ্যে দুঃখ বা বেদনা যতই থাক, ক্ষোভ বা বঞ্চনার জ্বালা নেই, দ্বিতীয়টায় তার প্রাবল্য। বৌএর বা বেয়ানের চিঠি পড়ে শোনাবার পর মা যখন মা-কালীর উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলতেন, 'আহা, বেঁচে থাক, ঐটুকু থেকেই তো বংশের নাম', ভবানীর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ত সেই অ-দৃষ্ট, অবাঞ্ছিত ছেলেটার উপর, যে তার এত-দিনের গড়ে তোলা বৃহৎ আশাতরুর মূলে কুঠার মেরেছে, তার আকাশচুম্বী ভবিষ্যৎকে এক নিমিষে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আক্রোশ শুধু তার উপরে নয়, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ত সোদামিনীর উপর। এতকাল পরে তার পিতৃকুলে যে অপ্রত্যাশিত বংশধরের আবির্ভাব ঘটল, তার মধ্যে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে, সেও তার সঙ্গে জড়িত। কোথায়, কেমন করে, সেসব কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ভবানীর সেদিন ছিল না।

সোদামিনীর ফিরতে দেরি হল। বেশী বয়সের সন্তান প্রসূতিকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় না, তার দেহযন্ত্রের মূল ধরে নাড়া দেয়, প্রায়ই একটা ওলট-পালট না ঘটিয়ে ছাড়ে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তার মা একেবারে বিছানা নিয়েছিলেন। জ্যাঠাইমার বয়স হয়েছে, তার উপরে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মা এবং ভাই-এর প্রায় সমস্ত ধকল গিয়ে পড়েছিল সোদামিনীর উপর। সে সব ছেড়ে আসতে পারছিল না। এলেও এক নাগাড়ে বেশী দিন থাকতে পারছিল না। শাশুড়ীও তার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন নি, বরং বেয়ান যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন, বৌকে তাঁর কাছে থেকে যাবার নির্দেশই দিয়েছিলেন। ছেলের মন তিনি জানতেন না। সেখানে যে এটা অলক্ষ্য ইন্ধনের কাজ করবে, বুঝতে পারেন নি।

সদুও পারে নি। স্বামীর অন্তরের এ কক্ষটা তার কাছে চিরদিনই রুদ্ধ থেকে গেছে।

আগম ও নির্গম নিয়ে জীবজগৎ। নদীর যেমন জোয়ার-ভাটা। জলপ্রবাহ আসে এবং যায়। জীবনপ্রবাহের রীতিও তাই। আড়িয়াল খাঁর সঙ্গে যাদের নিত্য সম্পর্ক তাদের কাছে জোয়ার-ভাটার চাইতেও নদী-প্রকৃতির আরেকটা দিক বেশী প্রত্যক্ষ। তার অবিরাম ভাঙা-গড়া। পুরনো পারের বিলয়, নতুন পারের আবির্ভাব। কিন্তু কখন কোন্‌টা ঘটবে, কোন্‌টা আগে আসবে, কোন্‌টা পরে, কেউ বলতে পারে না। জীবনের দু-তীরব্যাপী যে পতন ও অভ্যুদয়, যার নাম মৃত্যু ও জন্ম, সেখানকার নীতিও এমনি অমোঘ, আবার এমনি অনিশ্চিত।

একটি শিশুর আগমন যখন দুটি পরিবারের এতগুলো মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করছিল তখন কেউ জানত না, আরেক দিকে অতি কাছে কারো কারো নির্গমনের আয়োজন চলছে। প্রথম ভাঙন ধরল এপারে। কৃষ্ণপ্রসাদ গেলেন। তার কিছুদিন পরেই সেটা ওপারে গিয়ে লাগল। বছর দুয়েকের

বাচ্চাটিকে মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে রাণাঘাটের রায়গিন্নী কোনোরকমে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন। 'জেঠীমা' রয়ে গেলেন, কিন্তু প্রায় না-থাকার মত। সৌদামিনী ভাইকে নিয়ে চলে এল বল্লভপুরে। এল শাশুড়ীর ভরসায় এবং তাগিদে। তার নিজের অবস্থাও তখন প্রায় অচল। মাস তিনেক পরে তার কোলেও একটি শিশু এল—কুণ্ডুবাড়ির প্রথম সন্তান—বিজয়।

এদিকে ভবানীর কারবার তখন ঠিক অচল হয়ে না পড়লেও কঠিন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ভবিষ্যতের ভরসায় চারদিকে অনেকখানি ফাঁদিয়ে নিয়ে বসেছিলেন কেষ্ট কুণ্ডু। ছেলেও সেইভাবে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছিল। তারপর চলল দ্রুত গোটাবার পালা। সে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়; নানা জায়গায় টান পড়ে। তবু পাকা হাতে অনেকখানি সামলে এনেছিলেন। বাকীটা আর করে যেতে পারলেন না। ভবানীর কাছে সেই অসমাপ্ত দুরূহ কাজটি আরো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

কেষ্ট কুণ্ডু বেঁচে থাকতেই তাঁর কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র ভিতরে ভিতরে পিছনে লাগতে শুরু করেছিল। সেইটাই স্বাভাবিক। অতি দুঃসময়ে কাকা যা করে-ছিলেন, সুসময়ের নাগাল পেয়ে তার একটা প্রতিদান না দিলে চলবে কেন? কাকার মৃত্যুর পর তারা আরো তৎপর হয়ে উঠল। সে আমলের দু-একটি বিশ্বস্ত কর্মচারীও সুযোগ বুঝে তাদের সঙ্গে হাত মেলাল।

ঠিক এই সময়ে সৌদামিনী তার সদ্য মাতৃহারা অতি আদরের শিশু ভাইটির হাত ধরে বল্লভপুরের ঘাটে এসে নৌকা ভেড়াল।

সে দিনটি ভবানী কুণ্ডুর সারা জীবনে ভুলবার নয়। সেই ছবিটা তার মনের মধ্যে কে যেন কেটে কেটে বসিয়ে দিয়ে গেছে। অথচ এই সুদীর্ঘ কাল কারো কাছে এক নিমেষের তরেও তাকে খুলে ধরতে পারেন নি। আজ ধরলেন। ব্রাহ্মণ ও দেবতার সম্মুখে অকপটে উন্মোচিত করে দিলেন। দিয়ে যেন বাঁচলেন। এতদিনে সহজভাবে একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

বাচ্চাটি তার দিদির রং পায় নি, তার চেয়ে অনেকখানি ফর্সা। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ, তার উপরে টানা দুটি কাজল-পরা চোখ; শান্ত দৃষ্টি, এতটুকু ছেলের চোখে যা দেখা যায় না। গোলগাল নাদুসনুদুস গড়ন। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। পরনে একখানি ছোট্ট জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি। হয়তো তার দিদিই অনেক যত্ন করে পরিয়ে দিয়েছে। খালি গা, তার উপরে একগাছা সরু সোনার হার, হাতে দুটি বালা।

উঠোনে পা দিতেই মা যেন ছুটে এসে লুফে নিলেন। এপাশে-ওপাশে যারা ছিল, ঝি-চাকর, দু-একটি আশ্রিতা আত্মীয়া, সকলের চোখেই খুশি আর লোভ উপচে পড়ছিল। ভবানী ছিল ঘরে। কলরব শুনে জানালায় এসে দাঁড়াল। ছেলেটার দিকে নজর পড়তেই বুকের ভিতরে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। বুঝতে পারল, সেই আগুনের জ্বালা তার চোখ দুটোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পাছে কারো নজরে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি সরে গেল।

একটি অবোধ নিরপরাধ শিশুর উপর এই বিষাক্ত মনোভাবকে সে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে প্রশ্রয় দিয়েছিল, একথা বললে ভবানীর উপর অবিচার করা হবে। বরং চেষ্টা করেছিল কী করে সেই অন্ধবিদ্বেষকে জয় করা যায়, সস্নেহ না হলেও অন্তত সহজ দৃষ্টিতে তাকানো যায় তার শ্বশুরের এই একমাত্র বংশধরটির দিকে। সে চেষ্টা সফল হয়নি। একটি দিনের তরেও ভুলতে পারে নি ভবানী কুণ্ডু, ঐ ক্ষুদ্র মানুষটা তার জীবনের বহু বৃহৎ ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। তার বর্তমানের উদ্যম এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এ-ই এসে বানচাল করে দিয়েছে। এ তার আজন্ম শত্রু।

ভাইএর নামটা বোধ হয় সৌদামিনীই রেখেছিল। রতন। জন্মাবার পর-মুহূর্ত থেকে তার হাতেই মানুষ। এখানে এসেও সেই ব্যবস্থা বজায় রইল। তার নিজের কোলে যেটি এল, তার ভার নিলেন শাশুড়ী। কিন্তু কী ছিল এই বল্লভ-পুরের মাটিতে, রতন যেন সেখানে ঠিক শিকড় মেলতে পারছিল না। একটি সবুজ সতেজ ধানের চারাকে নীচু জমি থেকে উপড়ে নিয়ে শুকনো ডাঙায় বসিয়ে দিলে তার বাড় নষ্ট হয়ে যায়, পাতাগুলো কুঁকড়ে আসে, দিন দিন হলদে হতে থাকে, ওরও ঠিক সেই লক্ষণ দেখা দিল। হাত-পা শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখখানা ফ্যাকাসে, তার মধ্যে হলুদের ছোপ। যে চিক্কণশ্রী নিয়ে এসেছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিবারণ কবিরাজ দেখছিলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক। বেশ কিছুদিন নানারকম বটিকা, চূর্ণ, অরিষ্ট, রসায়ন এবং সেই সঙ্গে পোড়ের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, কাঁচকলার মণ্ড ইত্যাদি চালাবার পর বিশেষ কোনো ফল না পেয়ে শেষ ব্যবস্থা দিলেন—হাওয়া বদল করা দরকার। কিন্তু এতটুকু ছেলেকে কে কোথায় নিয়ে যাবে? যেখানেই যাক, সৌদামিনীকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে চলবে না। তার কোলে কচি। কেমন করে যায়?

রাণাঘাটে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল। বেয়াইকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলেন ভবানীর মা। একটি দৌহিত্র আসবার পর সেদিকে কোনো বাধা ছিল না। বরং প্রয়োজন ছিল। নতুন নাতিটিকেও তো দেখা দরকার।

তিনি এসেছিলেন এবং ছেলের চেহারা দেখে রীতিমত ভয় পেয়েছিলেন। দুঃখও কম পান নি। এরকম অবস্থা, অথচ জামাই তাকে একটি ছত্রও লিখে জানায় নি। তার দায়িত্বজ্ঞান দেখে খুশী হতে পারেন নি। কিন্তু পাকা বৈষয়িক লোক; অলস মনোভাবটা এদের কাছে প্রকাশ পেতে দেন নি। বরং ছেলে যে তার এখানে এসে মা হারাবার দুর্ভাগ্যটা ভুলে থাকতে পেরেছে, তার জন্যে বেয়ানের কাছে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনার কাছে আছে, এতেই আমি নিশ্চিন্ত। আপনজন বলতে তো আপনারাই! আমার আর কে আছে, বলুন।

আসলে তিনি মোটেই 'নিশ্চিন্ত' হয়ে যেতে পারেন নি। বাড়ি ফিরেই প্রথমে গেলেন কৃষ্ণনগর। অন্তত তাদের কাছে নিয়েও যদি ফেলা যায়, অবিলম্বে একটা মোটামুটি চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর অবস্থা বুঝে প্রয়োজন মত

কলকাতায় বাসা ভাড়া করে সেখানে রেখে ভালো ডাক্তার দেখানো, এবং তাঁরা যদি বলেন, পশ্চিমে কোথাও 'চেঞ্জে' নিয়ে যাওয়া—সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

ওখানে যখন এই প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাপুরুষ নামক ব্যক্তিটি যে এই রুগ্ণ শিশুটির জন্য অন্য ব্যবস্থার আয়োজন করছিলেন, ও তরফ বা এ তরফের কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ভাবতে বা জানতে পারলেই বা কী হত ? বিধির বিধান কে কবে রোধ করতে পেরেছে ?

শোনা যায়, শিশু নাকি মানুষের ভিতরটা দেখতে পায়, বিশেষ করে তার উপর কার কি মনোভাব, বুঝতে পারে। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। শিশু অবোধ হলেও মানুষের জন্মার্জিত অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী। একটা অবোলা নিরীহ পশুর বেলাতেও দেখা যায়, কাউকে এড়িয়ে চলে, আবার কারো একটুখানি আদর বা স্নেহস্পর্শের জন্যে ব্যাকুল। সেটা যখন পায়, নানাভাবে জানাবার চেষ্টা করে সে কত খুশী।

রতন সেই প্রথম দিন থেকেই ভবানীকে এড়িয়ে চলেছিল। ভবানীরও তার প্রতি কোনো টান বা আকর্ষণ ছিল না। তবু বাড়ির অন্য সকলে যাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, তার থেকে নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখা বড় বিসদৃশ দেখায় বলেই মাঝে মাঝে ছেলেটাকে একটু কাছে ডেকে দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ভেড়াতে পারে নি !

ইদানীং ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে ছেলেটা বড় খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় এমন বায়না ধরত, কার সাধ্য থামায় ? এমনি একদিন কি নিয়ে কান্নাকাটি করছিল, সদু কিছুতেই ভোলাতে পারছে না, হঠাৎ দেখল ভবানী জামাকাপড় পরে বেরোচ্ছে। কি মনে করে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ, দোকানে ?

—না, একবার ওপার যেতে হবে। কেন ?

সৌদামিনী সে কথার জবাব না দিয়ে ভাইকে বলল, নৌকো করে বেড়াতে যাবি ?

—না।

—যা না ! বজরায় চড়াবে দাদাবাবু। অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

এবার রাজী হল রতন। জলে ভরা চোখ দুটো খুশিতে ভরে উঠল। দিদির কোল থেকে নেমে বলল, যাবো।

কেষ্ট কুণ্ডুর জীবনে কোনো বিলাস ছিল না। প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তো কষ্টেই কেটেছে। তারপর যখন অবস্থা ফিরল, দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেলেন, তখনো জীবনযাত্রার ধারা বদল হল না। সংসারের মান খানিকটা উঠল। কিন্তু কষ্টা-র্জিত অর্থের একটা সামান্য অংশও ব্যক্তিগত সখ বা আরামের পিছনে ব্যয় করেন নি। শেষ বয়সে, কি মনে করে একখানা ছোট বজরা তৈরী করিয়েছিলেন। কখনো ক্বচিৎ তাতে করে আড়িয়াল খাঁর বুকে খানিকটা টহল দিয়ে আসতেন। দু-চারটি বন্ধু সঙ্গে নিয়ে ভবানীও কয়েকবার ঘুরে এসেছে। বিয়ের পর বৌকে

নিয়েও একবার বেরিয়েছিল, অবশ্য বাবাকে লুকিয়ে। সদুকে রাজী করাতেও কম বেগ পেতে হয় নি—গুরুজনরা জানতে পারলে কি ভাববেন, লোকে কি বলবে। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে এড়াতে পারে নি।

তার পর থেকে বজরার ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শেষদিকে কেষ্ট কুণ্ডু তার দোকান-পসার, কাজ-কারবার নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছিলেন যে জলবিহারের কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল না। বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীকেও যেখানে এসে দাঁড়াতে হল, এজাতীয় বিলাসের কল্পনাও সেখানে ঘেঁষতে পারে না। সুতরাং বজরা যেমন ছিল তেমনি ঘাটে বাঁধা পড়ে রইল।

নানা রং-এর জন্তু-জানোয়ার ফুল-লতাপাতা আঁকা এই ভাসমান ঘরখানার উপর রতনের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। যে চাকরটির সঙ্গে রোজ তার বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা ছিল, সে সেটা জানত এবং ইদানীং এই ক্ষুদ্র মনিবটিকে ভুলিয়ে রাখা যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, প্রায়ই তাকে নিয়ে বজরায় গিয়ে উঠত। ওটা যে চলে এবং ওতে করে ইচ্ছামত নদীর মধ্যে ঘুরে বেড়ানো যায়, সেটাও রতনের অজানা ছিল না। মাঝে মাঝে সেই জিদ চেপে বসত। বাবুকে বলে কালই সে বন্দোবস্ত করা হবে—ইত্যাদি স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে চাকর তাকে কোনোরকমে বাড়ি নিয়ে আসত।

এই প্রলোভনটুকু মনে ছিল বলেই বোধ হয় সে দিদির প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

ভবানী যাচ্ছিল জরুরী প্রয়োজনে। তার জন্যে অন্য নৌকোর ব্যবস্থা ছিল। বজরার মত ধীরগামী যান দিয়ে তার কাজ চলবে না। সে কথা জানাতেই সদু মুখ ভার করে বলল, হলই বা একটু দেরি। ছেলেটা কিছুক্ষণ ভুলে থাকত। একটা দিনও তো ওকে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় না।

সে কথা ঠিক। শুধু যে ভবানীই নিয়ে যায় না, তাই নয়, রতন নিজেও কখনো যেতে চায় না। ভবানী স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কি মনে করে বলল, বেশ, চলুক।…গোপালটা গেল কোথায় ?

গোপাল রতনের চাকর।

সৌদামিনী খুশী হয়ে অন্দরের দিকে ছুটল, গোপালকে ডেকে, ভাইকে আর একটু ভাল জামাকাপড় পরিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে দেবে। ভবানী ওদিকে বজরার মাঝিদের ডাকতে পাঠাল।

গোপালকে পাওয়া গেল না। একটু আগে বাজারে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। সৌদামিনী ভাইকে নিয়ে ফিরে এল। ছোট্ট ধুতির কোঁচার দিকটা ঝুলিয়ে না দিয়ে শক্ত করে কোমরে বেঁধে দিয়েছে, খুলে না যায়, গেলে আবার পরাতে গিয়ে বিব্রত হবে ভবানী। গায়ে বেনিয়ানের উপর গলাবন্ধ কোট। ফিরতে রাত হবে, জলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা না লাগে। চোখে কাজল, কপালে একটা বেশ বড় কালির টিপ। কতরকম দৈত্যদানা অপদেবতা আছে নদীর মধ্যে ; নজর দিতে পারে। মেটেহাঁড়ির কালির ফোঁটা কপালে থাকলে আর ভয় নেই।

স্বামীকে বলল, গোপাল নেই। ও কিছু করবে না। চুপ করে বসে থাকবে।

বজরায় উঠতে পেলে আর কিছু চায় না। ভাইকেও সাবধান করে দিল, দুষ্টুমি করো না। ছইএর মধ্যে চুপটি করে বসে থাকবে। কেমন? কান্নাকাটি করে জ্বালাতন করো না দাদাবাবুকে। তাহলে কিন্তু বকুনি খাবে। জান তো কি রকম রাগী মানুষ।

ভবানী আর আপত্তি করল না। শ্যালকের হাত ধরে নিয়ে চলল ঘাটের দিকে। ভাইকে রওনা করে দেবার আগে সদু তার কড়ে আঙুলে একটা মৃদু কামড় দিয়ে আরেকবার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দু-চোখ বুজে অস্ফুটস্বরে বলল, দুর্গা দুর্গা।

যতক্ষণ তারা দৃষ্টির বাইরে গিয়ে না পৌঁছল, বারান্দার রেলিং ধরে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

ভবানীর কারবারের অবস্থা অনেকদিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না। বিশেষ করে ঐ সময়ে তাকে আর একটা বড় রকমের ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই সূত্রেই ওপারে যাওয়া। একজন মহাজনের সঙ্গে একযোগে হাজার কয়েক টাকা লগ্নি করেছিলেন কেষ্ট কুণ্ডু। পরে প্রায় সবটাই তুলে নিয়েছিলেন। সুদে আসলে এদের হিসাবমত সামান্য কিছু তখনো পড়েছিল। সেটুকু যদি উদ্ধার করা যায়, একজন পাওনাদারকে অন্তত ঠেকানো যাবে, এই ভরসাতে ভবানী নিজেই যাওয়া স্থির করেছিল। লোকটি পাত্র সহজ নয়। অন্য কাউকে দিয়ে বাগানো কঠিন হত।

নিজে গিয়েও সুবিধা হল না; সময় খারাপ পড়লে যা হয়। মহাজনের খাতাপত্রে যে হিসাব রয়েছে, তাতে দেখা গেল, এ পক্ষের কোনো পাওনা তো নেইই, বরং কিছু টাকা বেশী নিয়ে ফেলেছেন কেষ্ট কুণ্ডু। ভবানী একটা অঙ্ক দেখিয়ে বললে, এ টাকা যে বাবা নিয়েছেন, তার প্রমাণ কোথায়? রসিদ দেখাতে পারেন?

"রসিদ!" একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল বৃদ্ধ মহাজন। "তোমার বাবার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক ছিল? রসিদ-ফসিদের ধার আমরা কোনো দিন ধারিনি। নিজের সহোদরের চেয়ে তাঁকে বেশী বিশ্বাস করেছি। তিনিও আমাকে সেই চোখেই দেখেছেন বরাবর। তুমি আজকালকার ছেলে, সেসব বুঝবে না।"

এই নিয়ে শুরু হল বচসা, এবং শেষ পর্যন্ত সেটা চেঁচামেচি রোখারুখিতে গিয়ে দাঁড়াল। লাভ তো কিছুই হলই না, উপরি পাওনা জুটল অপমান।

বজরায় ফিরে আরেক দফা অশান্তি। রতন বাড়ি যাবার জন্যে বায়না ধরেছে, তিনজন মাঝি থামাতে না পেরে হিমসিম খাচ্ছে। ভগ্নীপতিকে দেখে নাকীকান্নার সুর এবং আবদারের মাত্রা আরো চড়ল। ভবানীর মেজাজ আগে থাকতেই চড়েছিল, এবার একেবারে সপ্তমে গিয়ে উঠল। তবু নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত করে খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করল। এজাতীয় কাজে সে বরাবরই অনভ্যস্ত। তার উপরে মনের অবস্থা ছেলে ভোলাবার মত নয়, বিশেষ করে

ঐ রকম একটা অতিরিক্ত আদরে বিগড়ে যাওয়া বদমেজাজী ছেলে।

নৌকো ছাড়বার কিছুক্ষণ পরেই নদীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকার রাত। আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ছই-এর ভিতরে বসে থাকাটা রতনের মনঃপুত নয়, ভবানীরও গরমে কষ্ট হচ্ছিল। শ্যালকের হাত ধরে ছাতে গিয়ে উঠল। শেষ আশ্বিনের শান্ত নদী। বজরা বিশেষ টলছিল না। তবু নিজের ঠিক পাশেই তাকে বসিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু 'কথা শোনা' বলে কোনো কথা সে শেখে নি। ও জিনিস তার ধাতেও ছিল না। মাঝিরা তিনজনেই কাজে ব্যস্ত। একজন রয়েছে হালে বাকী দুজন দাঁড় টানছে। পাল টাঙানো আছে। কিন্তু হাওয়া একেবারে নেই। অবাধ্য এবং আব্দারে শ্যালকটিকে সামলে রাখার দুরূহ কাজটি ভবানীর একার উপরে গিয়ে পড়ল। আড়িয়াল খাঁর মাঝামাঝি পৌঁছবার আগেই তার ধৈর্য প্রায় শেষ সীমায় এসে গেছে।

একটানা কান্নার সুর মিশিয়ে তখনো সেই একই কথা বলে যাচ্ছিল ছেলেটা —বাড়ি যাবো, দিদির কাছে যাবো। এই শেষের আব্দারটা হঠাৎ যেন নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিল ভবানীর মনে। এই 'আপদটা' যে তার জীবনের এক জীবন্ত দুর্গ্রহ, তার সমস্ত দুর্ভোগ এবং দুর্দশার জন্যে দায়ী, তার অনাগত দিনের সমস্ত আলো এক নিমেষে নিবিয়ে দিয়েছে, লোকের কাছে তাকে কৃপা এবং উপহাসের পাত্র করে তুলেছে—এসব ভাবনা সে একদিনের তরেও ভুলতে পারে নি। আজ এই মুহূর্তে, এই অসহ্য পরিবেশে সেই অভিযোগগুলো আরো তীক্ষ্ণ এবং তীব্র হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মনে হল, তার চেয়েও আরো একটা গুরুতর ক্ষতি বয়ে নিয়ে এ তার সংসারে এসে ঢুকেছে। এ যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে সদুকে আর সে পায় নি। এই দুটো রোগা হাত তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু স্বামী নয়, অনেকটা তার নবজাত সন্তানের কাছ থেকেও। সৌদামিনীর জীবনে সব চেয়ে বড় জায়গা জুড়ে আছে এই ভাই। এ যতদিন বেঁচে থাকবে সদুকে ফিরে পাবার ভরসা নেই। অথচ সে কথা মুখ ফুটে বলা যাবে না। নিঃশব্দে সয়ে যেতে হবে জীবনভোর।

রতন বলে উঠল, 'আমি দুধ খাবো।' ভবানীর মনে পড়ল, বজরা ছাড়বার আগে একটা ঘটিতে খানিকটা দুধ এবং তার সঙ্গে আরো কি সব খাবার সৌদামিনী ভাইএর জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল, নিচের কামরায় রাখা আছে। মাঝিরা মুসলমান, তাদের দিয়ে আনানো চলবে না। ওকে সঙ্গে করে ভবানীকেই নিচে নামতে হল, এবং ঘটি ও খাবার নিয়ে আবার উপরে গিয়ে উঠল।

একটা ছোট কাঁসার গেলাসে খানিকটা দুধ ঢেলে রতনের হাতে দিতেই সে মুখে না তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠাণ্ডা কেন? আমি খাবো না।' সঙ্গে সঙ্গে গেলাসটাও ছুঁড়ে দিল নদীর মধ্যে। ভবানীর মনে হচ্ছিল, এ শয়তানটাকেও যদি অমনি করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যেত!

একটা বড় বাটিতে নানারকম খাবার ছিল। ঢাকনা খুলে বলল, রসগোল্লা খাবি?

—না! ঝাঁঝিয়ে উঠল রতন।

—ক্ষীরের নাড়ু ?

—না !

—না খাবি তো মর। খবরদার চেঁচাতে পারবি না।

জন্মাবার পর থেকে এ ছেলে অনেক কিছু খেয়েছে, কিন্তু ধমক খায় নি, খেতে শেখে নি। তার ফল হল উলটো। সে আরো জোরে চেঁচাতে শুরু করে দিল। তারস্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না। ভবানীরও কেমন রোখ চেপে গেল— এইটুকু ছেলেকে শায়েস্তা করা যাবে না? চোখ-মুখ পাকিয়ে চড়া গলায় শাসিয়ে উঠল, আর একবার মুখ খুলে দ্যাখ, ঠ্যাং ধরে জলে ফেলে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে নাকীসুরের নালিশ—আমাকে মারছে!

—তবে রে, আবার মিছে কথা!

মারবার উদ্দেশ্যেই হাত বাড়িয়েছিল ভবানী। কান ধরে দুটো ঝাঁকানি কিংবা গালে একটা চড়। তার আগেই ছিটকে সরে গিয়েছিল ছেলেটা। হয়তো মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে চেয়েছিল। ভবানীও উঠে পড়েছিল তাকে ধরবার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিবাত নদীর বুকে আচমকা ছুটে এল দমকা হাওয়া। নেতিয়ে-পড়া পাল চোখের পলকে ফেঁপে ফুলে উঠল। শিথিল দড়িতে টান পড়ল। মাস্তুলটা ককিয়ে উঠে এক পাক ঘুরে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সহসা খুলে-যাওয়া পালের ঝটকায় বজরাটা একদিকে খানিকটা কাৎ হয়ে পড়েছিল, পরক্ষণেই সোজা হয়ে তীর বেগে ছুটে চলল।

ভবানী টাল সামলে নিয়েছিল। কিন্তু সামনে যে শীর্ণ, দুর্বল ক্ষুদ্র দেহটা আশ্রয়ের আশায় ছুটে যাচ্ছিল, সে পারল না। ছিটকে গিয়ে পড়ল আড়িয়াল খাঁর গর্ভে।

পিছন থেকে মাঝি তখন হাল সামলাতে ব্যস্ত। তবু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—খোকাবাবু পড়ে গ্যাছে!

ভবানীও হয়তো চেঁচাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলায় স্বর ফোটে নি।

নিচের দুজন মাল্লা কী করবে স্থির করবার আগেই বজরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই দুরন্ত হাওয়ার মুখে পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সম্ভব হলেই বা কী লাভ হত?

ভবানী কুণ্ডুর কণ্ঠ ধীরে ধীরে নেমে এসে থেমে গেল।

কিছুক্ষণ আগেই এদিকে ওদিকে কাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এবার শালিকের সাড়া পাওয়া গেল। শ্যামাচরণের উত্তর ভিটের ঘরের পিছনে যে বাঁশ-ঝাড়, সেখানে তাদের অনেক দিনের আস্তানা। দলটাও বেশ ভারী। আর একটু পরেই তাদের ঐকতান কিচিরমিচির তুমুল হয়ে উঠবে এবং একযোগে আকাশ-বিহার শুরু না হওয়া পর্যন্ত সারা বাড়িতে কান পাতা যাবে না। মাঝে মাঝে যখন বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে (সেটা ঘটে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা), মনোরমা গলা চড়িয়ে ধমক দেন, একদল দুরন্ত দামাল শিশুকে যেমন করে শাসন করেন

তাদের মা—'বলি' তোরা থামবি একটু ?' ওরা গ্রাহ্যও করে না। তখন কোনো কোনো দিন হরিশ কিংবা উমাকে এগিয়ে আসতে হয়। বেশী কিছু নয়, একখণ্ড মোটা বাঁশ, চ্যালাকাঠ কিংবা দা-এর পিঠ দিয়ে ঝাড়ের সামনে যে বাঁশ-গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে তার কোনোটার গোড়ার দিকে গোটা কয়েক ঘা-মারা। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। মিনিট দুয়েক পরেই অবশ্য যে-কে সেই।

হরিশ একবার বোধহয় মজা দেখবার জন্যে, কোথা থেকে একটা মুগুর যোগাড় করে অনেকক্ষণ ধরে ঝাড়ের বাঁশগুলোকে পেটাতে শুরু করেছিল। ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন মনোরমা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, ওটা কী হচ্ছে, শুনি ?

—আপদগুলোকে বিদায় করে দিচ্ছি।

মনোরমা ছেলের হাতের কাঠটার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ফ্যাল শীগ্‌গির।

হরিশের বয়স তখন বারো-তেরো। মায়ের বকুনি শুধু নয়, কখনো কখনো কড়া হাতের চড়-চাপড়ও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনোটাকেই বিশেষ আমল দিত না। ঐদিন কিন্তু আর একটা ঘাও মারতে সাহস করে নি। মায়ের দিকে একবার মাত্র চোখ তুলে মুগুরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। শালিক-বাহিনীর পিছনে আর কোনো দিন লাগে নি। আর একটু বড় হয়ে বাবার মুখে মহাভারতের কাহিনীগুলো শুনবার পর আড়ালে উমা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মাকে বলত গান্ধারী। সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যটাও উল্লেখ করত—গান্ধারীর ছেলে ছিল মোট একশো, আমার মার যে কতশো কেউ জানে না, মা নিজেও না।

সেই সুবিশাল শালিক-গোষ্ঠীর ঊষা-সঙ্গীত তখনো শুরু হয় নি।

ভবানীপ্রসাদ ঠাকুরঘরের জানালা দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে তাকালেন। ভোর হয়ে গেছে। ফিকে আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা গাছপালার উপরে সূর্যোদয়ের রক্তিম আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফেরালেন শ্যামাচরণের দিকে। তিনি চোখ তুললেন না, কোনো সাড়াও দিলেন না। এতক্ষণ ধরে নতমুখে নিঃশব্দে যে-কাহিনী শুনে যাচ্ছিলেন, তারই মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। ভবানীপ্রসাদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, এতদিন কাউকে বলি নি। সবাই জানে, ওটা একটা দুর্ঘটনা ; হঠাৎ ঘটে গেছে।

শ্যামাচরণ মুখ তুললেন। অস্পষ্ট আলোয় তাঁর অতিথির মুখের পানে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, ব্যাপারটা তো আসলে তাই। ছেলেটির ভবিতব্য তাকে ঐ দিনে ঐ ক্ষণে ঐ বিশেষ জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। ঐ ভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। আপনি উপলক্ষ্য মাত্র।

—সারা জীবন ধরে আমিও ঐ কথা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি। মনকে বুঝিয়েছি, আমি তো আর তাকে নিজে হাতে নদীর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিই নি, পড়ে যাবে জেনেও তাড়া করে যাই নি। এ সবই তার নিয়তি। আমি কী করবো ? কিন্তু—

মুহূর্তের ছেদ। তারপর এক আশ্চর্য গভীর করুণ গাম্ভীর্য ফুটে উঠল

তার কণ্ঠস্বরে। এ যেন আর এক ভবানীপ্রসাদ। বললেন, কিন্তু পণ্ডিত মশায়, আজ এই দেবস্থানে, আপনার মত দেবতুল্য ব্রাহ্মণের সামনে বসে অস্বীকার করতে পারছি না, সেদিন ওপার থেকে ফিরবার পথে বার বার আমি ঐ ছেলেটার মৃত্যুকামনা করেছিলাম। আগেও করেছি। তার জন্মাবার খবর যেদিন এল, তখন থেকে ঐ ছিল আমার ধ্যান। কিন্তু সেদিন আর ওকে সইতে পারছিলাম না। একটা কথাই শুধু মনে হচ্ছিল—আজ এই মুহূর্তে এই আড়িয়াল খাঁই কি ওকে বুকে টেনে নিতে পারে না? এমন তো সে কত নিচ্ছে। কী আশ্চর্য! নদী যেন আমার মনের কথাটা লুফে নিল। হবেই তো। সে যে অন্তর্যামী। তার কাছে কিছুই গোপন থাকে না। আমার ঠাকুমা বলতেন, মা-গঙ্গার মায়ের পেটের বোন এই আড়িয়াল খাঁ। মকর সংক্রান্তি কিংবা ঐরকম কোনো পুণ্য তিথিতে যে যা কামনা করে ডুব দেয়, তাই সে পায়। তবে মনে ভক্তি থাকা চাই। সেদিন কোন্ তিথি ছিল জানি না। শুধু জানি আমার মনে ভক্তির বদলে ছিল পাপ। তবু নদী মুখ তুলে চাইল। যেন হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। তখন কি জানি, এটা শেষ নয়, এখানেই সে থামবে না, অমনি করে একদিন আমার সর্বস্ব নেবার জন্যে ছুটে আসবে?

আমার সেই একান্ত ইচ্ছা যখন সে এমন সহজে পূরণ করে দিল, মনে মনে আমি খুশী হয়েছিলাম। প্রথমটা অবিশ্যি খুবই ধাক্কা লেগেছিল। যখন সামলে উঠলাম, মনে হল বুকের ওপর থেকে কত বড় একটা পাথর নেমে গেছে। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো। তারপর সত্যিই দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐ ছেলেটাই তো ছিল পথের কাঁটা। এবার সব খোলসা হয়ে গেল। সেই একেবারে গোড়ায়, আমায় বিয়ের আগে থেকে বাবা যা চেয়েছিলেন, আমি যা চেয়েছিলাম, সবই হল। তিনি সেটা চোখে দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু ওপর থেকে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন।

কী মনে করে ঘরের ভিতরে মশারি ঢাকা চতুর্দোলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ভবানী কুণ্ডু। তারপর যোগ করলেন, কিন্তু ধর্ম আছেন। এই সহজ কথাটা এতদিন ভুলে থাকলেও, আজ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পণ্ডিতমশায়। পাপের ওপরে যার ভিত, তাকে একদিন ভেঙে পড়তেই হবে। আড়িয়াল খাঁকে আজ আর ফেরানো যাবে না।

এতক্ষণ পরে আবার শিরোমণির মৃদু স্বর শোনা গেল—সেই পরিণামের জন্যে যদি আপনি সত্যিই তৈরী হয়ে থাকেন, কুণ্ডু মশায়, তাহলে আর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কী?

"প্রায়শ্চিত্ত আমার নিজের জন্যে নয়," সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ভবানী, আমার পাপের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে, সে কথা জানি, তার জন্যে নিজেকে আমি তৈরী করেও নিয়েছি। কিন্তু বাড়ি তো আমার একার নয়। আমার পাপের জন্যে ওরা কেন গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবে? আপনাকে আগেই বলেছি, একমাত্র সৌদামিনীর জন্যে আমার এত বড় বাড়ি। সে আজ নেই, কিন্তু তার সেই ইচ্ছাটা তো রয়ে গেছে, তার ছেলেমেয়েরা আছে। তারা তো

কোন অপরাধ করে নি ; তারা নিষ্পাপ। তবে যে শাস্তি একমাত্র আমার পাওনা, সেটা ওদের ওপর গিয়ে পড়বে কেন ?”

কেন পড়ে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্যামাচরণ শিরোমণির কাছেও তা অজ্ঞাত। সে রহস্য তেিন ভেদ করতে পারেন নি, করবার কোনো চেষ্টাও করেন নি। এইটুকু শুধু জেনে রেখেছেন, তাই হয়, ঐটাই সংসারের রীতি। তার বেশী আর কিছু জানতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

সুতরাং ভবানী কুণ্ডুর প্রশ্নের উত্তরে (যদি সেগুলো প্রশ্ন হয়) তিনি নির্বাক রইলেন। ক্ষণকাল পরে ভবানী অনেকটা যেন আত্মগতভাবে বললেন, সবাই আমাকে নিষেধ করেছিল, দালান দিও না, আড়িয়াল খাঁ পোড়া মাটি দেখতে পারে না। আমিও তা জানি। তবু সৌদমিনীর একান্ত ইচ্ছা আমি ঠেলতে পারি নি। সেই ছেলেটা যাবার পর থেকে মুখ ফুটে কোনো দিন কিছু চায় নি। শুধু ঐ একটি সাধ ছিল তার মনে, হঠাৎ একদিন বলে ফেলেছিল। আমি টাকার দিকে চাই নি। যেখানে যা মানায়, যেখানে যেটি দেখলে সে খুশী হবে, সব এনে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। এত বড় বাড়ির প্রতিটি জানালা, দরজা, চৌকাঠ, রেলিং, খাট, পালঙ, গাছপালা, ফুল, লতা-পাতা—সব কিছুর এমন একটা দাম আছে আমার কাছে, যা টাকার অঙ্কে কষা যাবে না। এ যদি শুধু ইট, কাঠ, লোহা-লক্কড় হত, আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করতাম না ; যেমন গদি আর গুদাম-গুলোর জন্যে আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই। সেখানকার যা কিছু লোকসান, সব যাবে টাকার ওপর দিয়ে। কিন্তু আমার এই বাড়ি ?···

শেষের কথাগুলোয় একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তবে উপরে আবার রাশ টেনে দিলেন। ধীর মৃদুকণ্ঠে বললেন, জানি, সবই হয় তো নিষ্ফল হবে। পাপের ক্ষয় নেই। তাকে কোনো কিছু দিয়েই মুছে ফেলা যায় না। তবু একটা প্রায়শ্চিত্তের জন্যে মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মনে হল, একমাত্র আপনিই তার নিখুঁত ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। তাই এত রাত্রে ছুটে এলাম।

ভিতরের উঠোন থেকে একটি পরিচিত শব্দ কানে যেতেই শ্যামাচরণ হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। গোবর-ছড়া দিচ্ছেন গৃহিণী। এটি তাঁর নিত্যকর্ম এবং তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষণ আছে, বৃষ্টিবাদল না হলে যার কোনো দিন নড়চড় হয় না। ঐ শব্দের সঙ্গে গৃহকর্তার প্রাতঃকালীন কর্মসূচীরও একটা নিবিড় যোগ রয়ে গেছে। এবার তাঁকে উঠতে হবে। তারই উদ্যোগ করে বললেন, বেশ ; যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ওপরে আমার তেমন আস্থা নেই, তবু আপনার বেলায় আমি তার প্রয়োজন অস্বীকার করি না। তার জন্যে আমার তরফ থেকে পাঁতি দেবার দরকার যদি থাকে, তাও দিয়ে দিচ্ছি।

—শুধু পাঁতির ব্যাপার হলে কি আমি গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে এতক্ষণ ধরে আপনাকে কষ্ট দিতাম, পণ্ডিত মশায় ?

—তাছাড়া এ বিষয়ে আমার আর কি করবার আছে, বলুন। শাস্ত্রমতে যা কিছু করণীয় আপনার পুরোহিতই তার ব্যবস্থা করবেন।

—জানি। আমরা আপনার যজমান নই। আমাদের অন্য পুরোহিত আছেন, শুকচরের গোসাঁই ঠাকুররা আমাদের কুল-পুরোহিত। আমার ঠাকুরদা কিংবা তাঁরও আগের আমল থেকে আমাদের নিয়মিত পুজোপাট, পাল-পার্বণ, সব তাঁদের দিয়েই করানো হয়। কিন্তু একে তো সাধারণ ক্রিয়াকর্মের দলে ফেলা যায় না। একেবারে আলাদা ব্যাপার। সবাইকে দিয়ে হয় না। যাঁর ওপর আমার বিশ্বাস আছে, যাঁকে দিলে আমার তৃপ্তি হয় তাঁকেই শুধু এত বড় কাজের ভার দেওয়া যায়। আপনি সেই ভার নিন, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি অন্য ব্রাহ্মণ ডাকতে চাই না।

—সে হয় না, কুণ্ডু মশায়। তার দরকারও নেই। এসব অনুষ্ঠানের কতগুলো বাঁধা-ধরা রীতি আছে, আপনার যিনি পুরোহিত, তিনিও তা জানেন। তাঁকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। আপনি তাঁর কাছে যান। তিনি যদি কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন বোধ করেন, আমি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করব।

—আপনি বোধহয় তাঁকে জানেন না, পণ্ডিত মশায়। যজ্ঞেশ্বর গোসাঁই সে পাত্তর নন। তিনি কারো পরামর্শ বা সাহায্যের ধার ধারেন না।

স্পষ্টত নৈরাশ্যের নিঃশ্বাস ফেলে ভবানীপ্রসাদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা বলতে গিয়ে দু-একবার ইতস্ততঃ করলেন। তারপর দ্বিধার ভাবটা সহসা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে ফেললেন, আপনার প্রণামী এবং অন্যান্য যে-সব প্রাপ্তি আছে, তার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না। সেদিক দিয়ে বরং—

বলেই, শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন। কী দেখলেন, তিনিই জানেন, বাকী বক্তব্যটুকু আর শেষ করলেন না। তাড়াতাড়ি নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, অপরাধ নেবেন না, পণ্ডিত মশায়। বুঝতেই পারছেন আমার মাথার ঠিক নেই; কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।

ভবানী কুণ্ডুকে বিদায় দিয়ে শ্যামাচরণ ঘর থেকে কাপড় গামছা নিয়ে বেশ খানিকটা ব্যস্ত হয়ে নদীর দিকে চলেছিলেন। অন্যদিন এতক্ষণে স্নান হয়ে যেত, আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। পাশের গ্রামের সমাদ্দার-বাড়িতে ষষ্ঠীপুজো এবং কয়েক অধ্যায় চণ্ডীপাঠের অনুরোধ রয়েছে। মহিম সমাদ্দারের পুত্রবধূটি মৃতবৎসা; পর পর দুটি সন্তান নষ্ট হবার পর দোষখণ্ডনের ব্যবস্থা হিসাবে এই আয়োজন। তাছাড়া সময়টাও বড় খারাপ যাচ্ছে সমাদ্দারের। শ্যামাচরণ জানেন, দোষ মেয়েটির নয়, তার স্বামীর। বছর দুই আগে রোজগারের আশায় 'বিদেশে' বেরিয়েছিল। দিনাজপুরের মহারাজার কাছারিবাড়িতে রান্না করত। দেশে অবশ্য রটিয়েছিল, মহারাজার সদর সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করে। টাকা পয়সা কিছুই বিশেষ আনতে পারে নি, এনেছে একটি কুৎসিত ব্যাধি আর স্বাস্থ্যটি ওখানেই রেখে এসেছে। কয়েক বিঘা জমিজমা আছে সমাদ্দারের। বরগা দেওয়া আছে মুসলমান চাষীদের কাছে। আগে তাই একটু দেখাশুনো করত। এখন আর রোদে-জলে বেরোতে পারে না।

ষষ্ঠীপুজো বা চণ্ডীপাঠে এদের কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তবু সেই চিরন্তন বিশ্বাস এবং বদ্ধমূল সংস্কার। পুরোহিতকে তারই কাছে মাথা নোয়াতে হয়, শালগ্রামশিলা হাতে করে ছুটতে হয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

নদীর পথে হরিশের সঙ্গে দেখা। সাধারণতঃ এ সময়ে সে ওঠে না। প্রথমটা একটু বিস্ময়-বোধ করলেন শ্যামাচরণ। তারপর ভাবলেন, আজকের ব্যাপার আলাদা। অত রাত্রে পাল্কি এবং পাইক সঙ্গে করে অত বড় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি এখানকার জীবনযাত্রার যদি সব কিছু স্বাভাবিক ধারায় না চলে, বিস্মিত হবার কারণ নেই। শুধু তাঁর পুত্র নয়, পাশাপাশি বাড়ির পুত্র-কন্যা এবং তাদের কারো কারো পিতা-মাতার মধ্যেও কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। দু-একজনের সপ্রশ্ন কৌতূহলের সংক্ষিপ্ত জবাবও দিতে হল।

সমাদ্দার-বাড়ির পুজোপাট সেরে যখন বাড়ি ফিরলেন, বেলা গড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধোবার জল এনে দিলেন মনোরমা। রান্নাঘরের বারান্দায় ভাত বেড়ে দিয়ে পাখা নিয়ে বসলেন, যেমন রোজ বসেন। কিন্তু অন্য দিনের মত ঠিক সহজ হতে পারছেন না, লক্ষ্য করলেন শ্যামাচরণ। কী যেন বলতে চান, কিন্তু ভিতরে কোনোখান থেকে বাধা পাচ্ছেন। শিরোমণি মনে মনে অপেক্ষা করে রইলেন, যদিও বাইরে তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না। নিরুদ্বিগ্ন ধীর গতিতে ভাতের গ্রাস মুখে তুলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীচরিত্র তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে; গৃহিণীর মনের কথাটি যেখানেই আটকে থাকুক, বেশীক্ষণ থাকবে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। হলও তাই।

সমাদ্দার বাড়ির কে কেমন আছে—এই জাতীয় দু-একটি মামুলী প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মনোরমা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, ওদের ঐ কাজটা কি নেবে না বলে দিলে?

—কাদের? বিস্ময়ে মুখ তুললেন শ্যামাচরণ। এ খবর এরই মধ্যে গৃহিণীর কানে পৌঁছল কেমন করে! পরক্ষণেই অবশ্য বুঝতে পারলেন। হরিশচন্দ্রের উষাক্রমণের সঙ্গে এর যোগ আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছায়া নেমে এল। গৃহিণী বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করলেন না। বললেন, কুণ্ডুবাবুদের কথা বলছিলাম। বেরতো-টেরতো আছে বুঝি?

—না, ব্রত নয়, অন্য কাজ।

—হরে বলছিল, খুব খরচপত্তর করবেন কুণ্ডুবাবু।

—হ্যাঁ, পুরুতের পাওনাটাও কম হবে না।

বোধ হয় একটু ব্যঙ্গের সুর মেশানো ছিল শেষের কথাটায়। মনোরমা চুপ করে গেলেন। স্বামীকে তিনি চেনেন; হাওয়াটা হঠাৎ অন্য দিকে চলে গেছে, বুঝতে পারলেন। শ্যামাচরণ ভাত মাখতে মাখতে বললেন, এ ব্যাপারে হরিশ-চন্দ্রের এতটা উৎসাহ দেখা দিল কেমন করে?

তাঁর আগের উক্তিতে ব্যঙ্গের যে আভাস ছিল, এবারে সেটা সুস্পষ্ট হল।

—ও তো আর নিজে থেকে যায়নি, তাড়াতাড়ি ছেলের তরফে সাফাই দিলেন

মনোরমা, যাবার সময় উনিই ওকে আলাদা ডেকে নিয়ে অনেক করে বলে গেলেন, তোমরা একটু বুঝিয়ে বলো। আমার কথায় তো রাজী হলেন না, তোমরা বললে নিশ্চয়ই 'না' বলতে পারবেন না।

—সেই সঙ্গে দেয়া-থোয়ার বহরটাও নিশ্চয়ই জানিয়ে গেছেন?

মনোরমা এ প্রশ্নের আর জবাব দিলেন না। না দিলেও শ্যামাচরণ বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সেই চিরন্তন লোভ! গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালেন। ছেলের চোখে মুখে যা দেখেছেন, দেখে রুষ্ট এবং ব্যথিত হয়েছেন, এখানেও দেখলেন তারই প্রতিরূপ। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে রইলেন শিরোমণি। মনটা যেন ধীরে ধীরে কেমন কোমল হয়ে এল। স্ত্রীকে যেন কতকাল দেখেননি। চোখের নিচে ঐ বলিরেখাগুলো এত গভীর তো ছিল না। চোয়ালের হাড় দুটো অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। কণ্ঠাও তাই। শ্যামাঙ্গী হলেও সর্বদেহে একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল মনোরমার। সেটা যেন বড় বেশী ম্লান হয়ে গেছে। একমাত্র বয়সই কি তার জন্যে দায়ী? আরো কিছু আছে। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম, তার উপরে মাঝে মাঝে অনশন না হলেও অর্ধাশন। অন্নের হয়তো অভাব নেই, কিন্তু তার উপকরণ বড় দীন। যখন যা জোটে, স্বামী-পুত্র-কন্যার প্রয়োজন মিটিয়ে নিজের জন্যে বড় একটা পড়ে থাকে না। শ্যামাচরণের সেটা চোখে পড়বার কথা নয়, তবু কোনো কোনো দিন হঠাৎ দেখে ফেলেছেন, জল-দেয়া ভাতে দুটো কাঁচা কিংবা পোড়ানো লঙ্কা আর তার সঙ্গে এক টুকরো তেঁতুল মেখে 'মধ্যাহ্ন-ভোজন' সেরে নিচ্ছেন ব্রাহ্মণী।

স্বামীর আহার শেষ হতেই গৃহিণী উঠে গেলেন তাঁর মুখ ধোয়ার জল আনতে। শ্যামাচরণ লক্ষ্য করলেন, আগের চেয়ে আরো অনেকটা শীর্ণ হয়ে গেছেন মনোরমা। পরনের কাপড়খানা যেমনি মোটা, তেমনি খাটো। যজমান-বাড়ির পাওনা শাড়ি পুরোবহরের হয় না। দুর্গোৎসব কিংবা বৃষোৎসর্গের মত বড় বড় ক্রিয়াকর্মে অন্য দিকে অজস্র ব্যয় করলেও ধনী গৃহকর্তা ঐখানে চার আনা কিংবা আট আনা পয়সা সাশ্রয় করে থাকেন। সেইটাই রীতি। শুধু কাপড়-গামছার বেলায় নয়, 'ভোজ্যে'* নৈবেদ্যে কিংবা 'পূর্ণপাত্রে'* যে চাল দেওয়া হয়, বাজারের মধ্যে সেটা সব চেয়ে কম দামী। ডালের মধ্যে মশুর নিষিদ্ধ, মুগ, ছোলা অড়হরের প্রচলন নেই, মটর কিংবা খেসারিই প্রশস্ত।

শুধু মোটা এবং ছোট নয়, গৃহিণীর শাড়িখানা বড় ময়লা। তার মধ্যেও যেন একটা দীনতার মালিন্য ফুটে উঠেছে। সম্ভবতঃ ঐ একখানাই সম্বল, 'ক্ষারে দেওয়ার'* সুবিধা হয়নি। কিংবা প্রতিবেশীর বাগান থেকে ভেঙে পড়া, কাঁদি-কেটে-নেওয়া কলাগাছের বাকল গুঁড়ি ডালপালা ইত্যাদি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে নিজে হাতে যে ক্ষার তৈরী করেন মনোরমা, সেটা হয়তো আর সকলের পরিধেয় সাফ করতেই ফুরিয়ে গেছে, ওঁর বেলায় আর কুলায়নি। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। মরা এবং বাতিল কলাগাছের সংখ্যাও অতি পরিমিত, অথচ

---

* পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি দেবকার্যের উপকরণ। উৎসর্গের পর পুরোহিতের প্রাপ্য।
* ক্ষার মিশিয়ে কাপড় ইত্যাদি জলে ফোটানো।

দাবিদায় কম নয়।

একটু যারা অবস্থাপন্ন, অর্থাৎ পাট যাদের পানে মুখ তুলে চেয়েছে তারা অবশ্য কলার ক্ষারের দিকে তাকিয়ে নেই। কয়েক আনা পয়সা ফেলে দিয়ে বল্লভপুর বাজারের মুদিখানা থেকে খানিকটা সাদা ধবধবে গুঁড়ো পোঁটলা বেঁধে বয়ে এনে তারা একই সঙ্গে অন্তঃপুরে হাসির জলুস আর কাপড়চোপড়ে সাফাইএর জেল্লা ফুটিয়ে তুলেছে। শ্যামাচরণ শিরোমণি সোডা-নাম্নী সেই সদ্য বিদেশাগতা শ্বেতাঙ্গিনীকে ঘরে আনতে পারেননি। তার পিছনে ঐ কয়েক আনা পয়সা ঢালতে যাওয়া তাঁর পক্ষে বিলাস।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাঁর গৃহের চারদিকে ছড়ানো যে দারিদ্র্য, তারই দিকে যেন নতুন করে নজর পড়ল। ভাবতে ভাবতে গেলেন, দেশের সম্পদ—প্রকৃত সম্পদ নয়, জীবনযাত্রার বাহ্যিক চাকচিক্য—দিন দিন বেড়ে চলেছে। তার মাঝখানে বসে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিতান্ত নিরাসক্ত হয়ে থাকবে, তাদের মনে অভাব-বোধ জাগবে না, ভোগের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেবে না—এতটা আশা বোধহয় করা যায় না। তাই বলে লোভকেই বা প্রশ্রয় দেওয়া যায় কেমন করে?

সামান্য একটু দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল শিরোমণির। নিয়মিত নয়, যেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত বাইরে থাকতে হত, ঘরে ফিরে স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতেন। আজ তাঁর চোখে ঘুম এল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লেন। বারান্দায় জলচৌকির উপর গিয়ে বসলেন। বাঁ হাতের কাছেই রয়েছে তাঁর নিজস্ব হুকাধার—দুধারে খুর-ওয়ালা একফালি সরু তক্তার উপর একটি গোলাকার গর্ত—তার মধ্যে কোন্ ভক্ত যজমানের দেওয়া রুপা-বাঁধানো হুঁকাটি দাঁড় করানো আছে। সেদিকে একবার তাকালেন। না; এখনো সময় হয়নি। আরো বেলা পড়লে গৃহিণীই ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে জলন্ত কলকেটি পাঠিয়ে দেবেন, কখনো কখনো নিজেও আসনে ফুঁ দিতে দিতে। এখনো তার দেরি আছে। বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবলেন, তারপর ডাকলেন, হরিশ!

ভিতরবাড়ির দিক থেকে সাড়া দিয়ে হরিশ এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। এ রকম অসময়ে তার ডাক পড়ে না। কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারল। কিছুক্ষণ আগে বাবা-মায়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়ে গেছে, সবটাই আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল, বাবার মুখের দিকেও নজর পড়ে থাকবে।

শ্যামাচরণ ছেলের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কুণ্ডুমশায় কী বলছিলেন তোমাকে?

হরিশ অনেকখানি আশ্বস্ত হল। সহজ সরল প্রশ্ন; তাপ নেই, শ্লেষও নেই। সোৎসাহে উত্তর দিল, বলছিলেন, বড় আশা করে এসেছিলাম, পণ্ডিত মশায় আমার এ দায়টুকু উদ্ধার করে দেবেন—

—তারপর?

—আপনাকে একবার বুঝিয়ে বলতে বললেন। কাল সকালে আবার লোক পাঠাবেন।

বোনের কাছে। শ্যামাচরণের কানে তার কোনো কথাই আসেনি, এবং সেই না আসার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে একটি নীরব নালিশ ছিল, সেটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। বুঝতে পাচ্ছিলেন, নিজের পরিবারে তিনি কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে পড়ছেন, অথচ খাপ খাওয়াতে হলে নিজেকে যতখানি নোয়াতে হয়, বদলাতে হয়, তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ওখানকার কাজকর্ম মিটে যাবার দু-তিনদিন পরে একদিন বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী এসে উপস্থিত। কখনো আসেন না। সামান্য দু-একটা অবান্তর প্রসঙ্গের পর প্রায়শ্চিত্তের কথা তুললেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই বিরাট রাজসিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেলেন। তারপরে খানিকটা ক্ষোভ—এই যাজনিক কাজ করে করেই তো মাথার সবগুলো চুল সাদা হয়ে গেছে, কোথায় কার চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে তিনি খাটো যে তাঁকে বাদ দিয়ে বাইরে থেকে পণ্ডিত আনবার দরকার পড়ল? পণ্ডিত এখানে নতুন আর কী কেরামতি দেখাবে? মন্তর তো সেই একই, বড়জোর সেগুলো একটু কায়দা করে পড়বে, এই তো? 'য' না বলে বলবে 'ইয়'। তার জন্যে তিনপুরুষের কুলপুরোহিত ত্যাগ করতে হবে?

অভিযোগগুলো তারস্বরে প্রচার করলেও তার মধ্যে যতটা ধার আশা করেছিলেন শ্যামাচরণ, ততটা যেন পাওয়া গেল না। তার কারণটাও বোঝা গেল। কাজ না করলেও প্রাপ্তির দিক থেকে গোসাঁই ঠাকুরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেননি কুণ্ডুমশায়। 'বাঁধা পুরুত' হিসাবে একটা মোটা 'বিদায়ের' ব্যবস্থা করেছেন।

গোস্বামী আবার পূর্ব সূত্রে ফিরে গিয়ে বললেন, বেশ; উপাধিধারী পণ্ডিত দিয়েই যদি কাজ করাতে হয়, তার জন্য নবদ্বীপে যাবার কী দরকার পড়ল? ঘরের পাশে তুমি তো ছিলে। ওদের কাছে তুমি কোন্ ফেলনা?

এবার গলা খাটো করলেন যজ্ঞেশ্বর, গোড়াতে নাকি তোমার কাছেই এসেছিল ভবানী। তুমি রাজীও ছিলে। তার পর কেন যে হঠাৎ মত পালটে গেল, ও-ই জানে। বড়লোকের খেয়াল তো। আমার মনে হয় এর মধ্যে ওর শ্বশুরবাড়ির কারসাজি আছে কিংবা বড় বোনের মাতব্বরি। রাণাঘাট কেষ্টনগর নবদ্বীপ সব তো শুনেছি পাশাপাশি। যাক, সেজন্যে তুমি দুঃখ করো না, শ্যামাচরণ। আমরা তো তোমাকে চিনি।

শ্যামাচরণ বিস্মিত হলেন। ভবানী কুণ্ডু হয়তো কাউকে কিছু বলেননি, তাঁর আভিজাত্যে বেধেছে, কিন্তু পীতাম্বর বিশ্বাসের কল্যাণে আসল ঘটনাটা চাপা ছিল না। যজ্ঞেশ্বর গোসাঁইএর মুখ চেয়ে ভবানী কুণ্ডুকে চটিয়ে দেওয়া যে ঠিক হয়নি, কিংবা এত বড় একটা প্রাপ্তিযোগ হাতছাড়া করা বোকামি হয়েছে—এই-জাতীয় মন্তব্য তিনি অনেকের কাছেই শুনেছেন। সকলে জানে, শুধু যার জানবার কথা সব চেয়ে বেশী, সেই কিছু জানল না, এ কেমন করে সম্ভব?

পরমুহূর্তেই সব বিস্ময় কেটে গেল। শ্যামাচরণ বুঝলেন, জানে বলেই আজ এই কড়া রোদ্রে এতখানি পথ হেঁটে তাঁর জন্যে এই সমবেদনার আঘাতটুকু বয়ে এনেছে গোস্বামী। তুমি আমার জন্যে কিছু করেছ, তোমার কাছে আমি ঋণী

—এই স্বীকৃতির মধ্যে একটা দীনতা আছে। মানুষ সেটা প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায়। শুধু অস্বীকার করেই নিরস্ত হয় না, উপকারবোধটা তখনো মনের মধ্যে খচ খচ করে বেঁধে, তাই উপকারীকে প্রত্যাঘাত করে সে খোঁচার হাত থেকে বাঁচতে চায়।

এই সত্যটি উপলব্ধি করে যজ্ঞেশ্বরের কাছেই বরং কৃতজ্ঞ বোধ করলেন শ্যামাচরণ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বিরস মৌনী মুখ তাঁর মনের মধ্যে যে মেঘের ছায়া ফেলেছিল, সেটুকু আর রইল না। যেখানে তিনি কিছু দিয়েছেন, সেখান থেকেই যখন এই প্রাপ্তি, যাদের কিছু দেননি, বরং বঞ্চিত করেছেন, সেখানে পাওনার আশা পোষণ করার মত অন্যায় আর কী হতে পারে? শুধু পোষণ নয়, সে আশা পূর্ণ হয়নি বলে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। এ তাঁর অহেতুক অভিমান!

এই কথা মনে হতেই ঐ কটি বিরস মুখ সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ, নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিল তাঁর কাছে।

ছ-বছর আগেকার সেই দিনগুলোর মধ্যে কখন যে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন শ্যামাচরণ, নদীপারের চওড়া পথ ছেড়ে জমির আইল ধরে বাড়ির দিকে চলতে চলতে আনমনে বসে পড়েছিলেন একটা ঝড়ে-পড়া খেজুরগাছের উপর, কিছুই জানতে পারেননি। কতক্ষণ কেটে গেছে সে খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে নজর পড়ল পায়ের কাছে বসানো খালুইটার দিকে, পরক্ষণেই বিদ্যুত-ঝলকের মত চেতনার মধ্যে জেগে উঠল পিছনে ফেলে আসা একটা সর্পিল ফাটল-রেখা। উঠে পড়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াবার আগে নিজের মনেই একবার মাথা নাড়লেন—উপায় নেই; প্রকৃতির অমোঘ নীতি তার নির্ধারিত পথেই চলবে, তার হাত থেকে নিস্তার নেই। যেমন সেবারেও নিস্তার পাননি ভবানী কুণ্ডু। তাঁর সাধের প্রাসাদ নিঃশেষে গ্রাস করেছিল আড়িয়াল খাঁ, সেই সঙ্গে আরো কত মানুষের খড়ের চালা, ক্ষেত-খামার, বন-বাদাড়। তার পর আবার নিজের মনেই একদিন থেমে গিয়েছিল, ফিরে গিয়েছিল অন্যপথে।

প্রায়শ্চিত্তের পর কয়েকদিন নাকি ভাঙনের বেগে মন্দা পড়েছিল। মানুষের সে কি উল্লাস! এত বড় যজ্ঞের ফল না ফলে পারে? ফাঁড়া কেটে গেল, মা-গঙ্গা মুখ তুলে চেয়েছেন। আর ভয় নেই।

তারা জানত না, ঐ সাময়িক বিরতি—ওটাও প্রকৃতির নিয়ম। যেমন ঝড়ের বেগ। কখনো ওঠে, কখনো নামে। যখন নেমে যায়, আশা হয় এবার বুঝি থামবে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার আসে আরো বড় ঝাপটা, আরো প্রচণ্ড তার গতি। এক দমকে গাছপালা, বাড়ি-ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়। নদীও ঠিক তাই। তার রসনার গতি কখনো দ্রুত কখনো মন্থর। কখনো বা স্থির, সেটা নতুন করে বেগ-সঞ্চারের সূচনা।

বাড়ির কাছে এসে পড়েছিলেন শ্যামাচরণ। দেখলেন উল্টো দিক থেকে একই পথ বেয়ে দুজন লোক আসছে। একজনের হাতে পাটকাঠির মশাল। আর একটু এগিয়ে এলে চিনতে পারলেন—তাঁর অনুগত প্রতিবেশী নিমাই মণ্ডল, তার

পিছনে হরিশ। নিমাই সানন্দে বলে উঠল—এই তো কত্তাঠাকুর এসে গ্যাছেন। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? মাঠাকরুন সেই সন্ধে থেকে ঘরবার করছেন। তারপর আর থাকতে না পেরে আমাকে ডেকে বললেন, নিমাই, তুমি এট্টু দ্যাখ।

শ্যামাচরণ কাষ্ঠ হাসি হেসে শুধু বললেন, একটা বিশেষ কারণে বড় দেরি হয়ে গেল।

আসন্ন মহাসঙ্কটের দুঃসংবাদটা দিলেন না। কাল তো নিজেরাই জানতে পারবে। অন্ততঃ একটা রাত একটু নিশ্চিন্তে কাটুক।

হরিশ কোন কথা বলল না। এগিয়ে এসে বাবার হাত থেকে খালুইটা নিয়ে নিল।

॥ ৪ ॥

শ্যামাচরণ শিরোমণি তাঁর প্রত্যুষের স্নান সেরে যখন বাড়ির পথ ধরেন, গ্রামের লোকেরা তখন সবে দুজন একজন করে নদীর দিকে চলতে শুরু করেছে। অতএব মাঠ প্রায় ফাঁকা। ফাল্গুনের শেষ কিংবা চৈত্রের প্রথমে রবি-খন্দ যখন উঠে গেছে, তখন হয়ত দেখা যায় এখানে ওখানে দু চারটে ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে চাষীরা। তাদের জমিতে 'জো'* এসে গেছে। ভোরবেলাকার পাতলা কুয়াসা এবং ফিকে অন্ধকারের আড়ালে চেহারাগুলো অনেকটা ঢাকা পড়ে গেলেও উচ্চ কণ্ঠের সম্ভাষণ স্পষ্ট শোনা যায়। সবই সদ্য-ঘুম-ভাঙা মন্থরগতি বলদ দুটির উদ্দেশে। তার মধ্যে কখনো শাসন, কখনো তোষণ, কখনো ডাইনে বাঁয়ে ধীরে কিংবা দ্রুত চলার নির্দেশ। তার বুলি আলাদা, সুর আলাদা, যা বোধহয় ঐ গরুগুলোই শুধু বুঝতে পারে এবং সইতে পারে।

ঠাকুরমশায় ছোট-বড় সকলেরই নিকটজন। কিন্তু ঐ বিশেষ সময়টিতে তিনি যেন বহুদূরের মানুষ। অনুচ্চ গভীর কণ্ঠে কী সব মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে যখন দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে ফেরেন, অত্যন্ত প্রিয় এবং পরিচিত যারা তারাও কাছে আসে না, কেউ কেউ দূর থেকেই প্রণাম জানায় এবং সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে যায়। অন্য সময় কারো সঙ্গে দেখা হলে তিনিও দু-একটা কুশল প্রশ্ন করেন, নানা বিষয়ে খোঁজখবর নেন—বহুজনের বহু সমস্যার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন—কিন্তু ঐ সময়ে তিনি কারো নন, কারো দিকে ফিরে দেখেন না। প্রতিদিন দিবারম্ভের ঐ কটি পল তাঁর নিজস্ব, তাঁর উপাস্য দেবতার উদ্দেশে বিশেষভাবে নিবেদিত।

সেদিন এই নিত্যকার প্রচলিত রীতি গোড়াতেই ওলট-পালট হয়ে গেল। স্নান শেষ করে পারে উঠতেই চোখ দুটো যেন আপনা হতেই চলে গেল একটি বিশেষ জায়গায়, একটি বিশেষ দৃশ্যের পানে, কাল সন্ধ্যা থেকে যার বহুদূর-প্রসারী ভয়াবহ রূপ দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রির দণ্ডে দণ্ডে তাঁকে অনুসরণ করেছে। দেখলেন, আজ আর তিনি তার একক দর্শক নন। এরই মধ্যে কেমন করে যে

* লাঙল দেবার উপযুক্ত সময়।

তাঁর কথা অনেকের কানে পেঁছে দিয়েছে, তিনি জানেন না। যেমন করেই হোক খবর পেঁছে গেছে। একদল ভীতি-বিহ্বল অসহায় নরনারী ছুটে এসে জড়ো হয়েছে। তিনি যখন পারে উঠে দাঁড়ালেন, মনে হল, তারা যেন ঐ মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল। দেখলেন, সবগুলো চোখ তাঁরই দিকে ফিরে গেছে। কিন্তু কেউ তাঁকে ডাকল না, ছুটে এল না অন্য সব আপদে-বিপদে যেমন আসে, সবাই শুধু তাকিয়ে রইল। এ এত বড় বিপদ যে প্রথম দর্শনেই মানুষের ভাষা কেড়ে নেয়, গতি কেড়ে নেয়, জ্ঞান কেড়ে নেয়, এক নিমেষে তাকে পাথর বানিয়ে দেয়। ঐ লোকগুলোও যেন একরাশ জড়বস্তু।

শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল কাল সন্ধ্যাবেলা যেটা ছিল শুধু একটা ফাটল, আজ এরই মধ্যে তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা গহ্বর। তারই কোনো গভীর তলদেশে কোন্ অদৃশ্য লোকে আত্মগোপান করে আছে এক বিশাল রাক্ষসী। তার বীভৎস কুৎসিত মুখটা রয়েছে আড়ালে, দেখা যাচ্ছে শুধু একটা প্রচণ্ড হাঁ। সেটা অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। ক্রমশঃ সে সর্বগ্রাসী রূপ নেবে। তার আর দেরি নেই।

—কত্তাঠাকুর! ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা কেমন ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ উঠল, যেন মানুষের গলা নয়। দীর্ঘ স্তব্ধতার মধ্যে আরো অদ্ভুত শোনাল শব্দটা। অনেকে চমকে উঠল। শুধু শব্দ নয়, একটু গতির লক্ষণও দেখা গেল। সামনের দিকে দু-চারটি মূর্তি সরে যেতে একটু পথের মত হল। সেখান দিয়ে এগিয়ে এল হারান ঘরামী। বয়স কত কেউ জানে না, সে নিজে তো নয়ই। কেউ জানতে চাইলে বলবে, ঐ যে অমুক সনে পেল্লায় ঝড় হয়েছিল, মানুষ গোরু কিছু ছিল না, তখন আমি কত বড়? ঐ অতখানি হবো—কাছাকাছি কোনো একটা ছেলেকে দেখিয়ে দেবে—আমার সব মনে আছে। কিংবা বলবে, আড়েলখাঁ যেবার চৌমুখোর কালীবাড়ি গেরাস করল, সেবার আমার মেজো-মেজো সবে হামা দেয়। বেঁচে থাকলে আজ সে সাত ছেলের বাপ হত।

গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বোধহয় হারাণ ঘরামী। এ অঞ্চলের যত পুরনো পুরনো খড়ের ঘর সব তার হাতের তৈরী। খড় বদল হয়েছে বহুবার, কিন্তু বাঁশের কাঠামো ঠিক আছে। মাঝে মাঝে হয়তো দু-একটা 'রুয়া', একখানা দুখানা 'আঠন' কিংবা কিছু কিছু 'ছাটন' পালটাতে হয়েছে, তাও খুব বেশী নয়। ঘরামীর দেহের কাঠামোও বিশেষ টসকায়নি। অনেক বছর ধরে রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে 'পল'ব অসার যেটুকু ছিল সব ঝরে গেছে, যেটা টিকে আছে একেবারে নিরেট ও খাঁটি।

আড়িয়াল খাঁর অনেক কুকীর্তি তার চোখে দেখা।

কোমর থেকে উপরের অংশটা বয়স ও জরার ভারে আগেই নুয়ে গেছে। এগিয়ে এসে শ্যামাচরণের সামনে আরো খানিকটা নুইয়ে দিয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকাল। তার পর মাথা তুলে বলল, লক্ষণ যা দেখছি, বড় সুবিধের নয়, কত্তাঠাকুর। ওধারে ঘূর্ণি-পাকটা একবার দেখে আসুন। কী এক-একটা গত্তো! গোড়াতেই এত চোট, রাক্ষুসী যে সহজে ঠাণ্ডা হবে, তেমন ভরসা দেখি না।

তুমি কি বল পেরতাপ ভাই ?

প্রতাপও বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ। বারুজীবী। নদীর পরে ফসলের মাঠ শেষ হয়ে যেখান থেকে ডাঙ্গা জমির শুরু তার কাছে দু-তিনটা পানের বরজ আছে তার। বাড়িতেও বড় বড় টিনের ঘর, খানিকটা দূরে। তবু সে-ই বোধহয় সব চেয়ে বেশী ভেঙে পড়েছিল। তাই হয়। যার যত আছে তার তত হারাবার ভয়, সে তত বেশী মুষড়ে পড়ে। ঘরামীর ডাকে একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল, বিড়বিড় করে কী একটা যেন বলতেও গেল, কিন্তু কথাগুলো ঠিক ফুটল না।

'ভদ্রলোকে'র পাড়াটা আরো একটু দূরে, সামনের সারির পিছনে। সেখান থেকেও অনেকে এসেছিল। রজনী সিকদার শ্যামাচরণ শিরোমণির যজমান। কিছু জমিজমা আছে, তাতেই মোটামুটি চলে যায়। তার উপরে বল্লভপুরে রেজেস্ট্রী অফিসে দলিল লেখে। তাতেও রোজ পাঁচসিকে দেড়টাকা থাকে। তখনকার দিনে নেহাত মন্দ নয়। ভিড় থেকে একটু আলাদা দাঁড়িয়ে অন্য সকলের মত এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার হারাণ ঘরামীর কথার শেষ সূত্র ধরে বলল, দেব্‌তা যেখানে বিমুখ সেখানে আর ভরসা কী ? মাঠ যাবে। এখানে ছিটেফোঁটা যার যা-কিছু আছে, খরচের খাতায় লিখে রেখে দাও। প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। ঘরামী যা বলছে তাই যদি হয়, মাঠ নিয়েও রাক্ষুসীর রোখ না থামে, ছেলেপিলের হাত ধরে কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে হবে তো। আমার মনে হয়, এখন থেকেই সেই চেষ্টায় নামা দরকার। ঠাকুরমশায় কী বলেন ? এ বিপদে আমাদের বল-ভরসা আপনি।

সকলেই শ্যামাচরণের দিকে তাকাল। তিনি চোখ না তুলেই সেটা অনুভব করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন নিঃশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, যাবো তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায় যাবো ?

এর মধ্যে আরো লোক এসে জড়ো হয়েছিল। সকলেরই চকিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই স্থানটিতে, যেখান থেকে হতাশাময় নিঃশ্বাসের সঙ্গে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে ভেসে এল অত্যন্ত সহজ এবং অতিশয় কঠিন দুটি কথা—কোথায় যাবো ! যে বলল, এ শুধু তার নিজস্ব উক্তি নয়, ওখানে যারা যারা ছিল, সকলেরই একান্ত মনের প্রশ্ন, এবং ঐ মুহূর্তে একমাত্র প্রশ্ন।

শ্যামাচরণও সেই দিকে তাকালেন, সম্ভবতঃ বক্তাকেও চিনতে পারলেন। সুরটি একক হলেও, তার ভিতর দিয়ে যে একটি নিরাশাচ্ছন্ন, গ্রাসকবলিত জনতার মিলিত সুর ধ্বনিত হল, সেকথাও উপলব্ধি করলেন। শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এটা পুঁথির কথা আওড়াবার সময় নয়। তবু বলছি, কেননা আজকের দিনে আমাদের কাছে এর চেয়ে দামী কথা আর নেই। সেইজন্যেই বোধহয় মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—তাবদ্‌ ভয়স্য ভেতব্যম্‌ যাবদ ভয়মনাগতম্‌। আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্যাৎ যথোচিতম্‌। ভয়কে ততক্ষণই ভয় করবে, যতক্ষণ সে আসেনি। এসে পড়লে আর ভয় নয়, তখন দেখতে হবে কী তার প্রতিকার, কেমন করে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

সিকদারের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, রজনী। আর

দেরি না করে যার যেখানে সংস্থান আছে কিংবা সম্ভাবনা আছে, নিজের নিজের আশ্রয়ের চেষ্টা দেখতে হবে বৈকি!

যাদের তা নেই, এবার সর্বসাধারণের দিকে মুখ ফেরালেন শ্যামাচরণ, তাদেরও ভেঙে পড়লে বা বসে থাকলে চলবে না। ভেবেচিন্তে একটা কোনো পথ বের করতেই হবে। বিপদ যখন আমাদের সকলের, তখন আমরা সবাই মিলে ভাববো।

এতেই যেন অনেকখানি আশ্বাস পেল লোকগুলো, আগের চেয়ে কিছুটা ভরসা নিয়ে বাড়ি ফিরল। 'ঠাকুরমশায়ে'র বৈষয়িক সঙ্গতি গ্রামের যারা গরীব মানুষ তাদের চেয়ে বেশী নয় এটা সকলেই জানে। তিনিও যে তাদের মত বিপন্ন, তাও বোঝে। তবু এমন একটা কিছু আছে এই মানুষটির মধ্যে, দুঃখের ও বিপদের দিনে যার উপরে নির্ভর করা যায়, নির্ভর করে খানিকটা বল পাওয়া যায়। অন্ততঃ এইটুকু বলে মনকে বোঝানো কিংবা সান্ত্বনা দেওয়া চলে, ঠাকুরমশায় তো আছেন, কর্তাঠাকুর যতক্ষণ আছেন, কোনো ভয় নেই।

শ্যামাচরণ যখন বাড়ি ফিরলেন, বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। মনোরমা এতক্ষণে ঝাট-পাট, ধোয়া-পোঁছার কাজ সেরে রান্নাঘরের দিকে চলে যান। এসময়ে তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর থাকে না। আজ দেখা গেল, বেঁকি বেড়ার* খুঁটি ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও কোনো ব্যস্ততার লেশমাত্র নেই। ঘনায়মান বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত মানুষের চোখেও যে উদ্বেগের ছায়া পড়ে, তারও কোনো চিহ্ন নেই। সমস্ত মুখখানা জুড়ে শুধু একটা কঠিন নিথর প্রশান্তি। এরই মধ্যে তিনি যেন সকল রকম ভয়-ভাবনা এবং চাঞ্চল্যের স্তর পার হয়ে এসেছেন, নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছেন অনিবার্য অদৃষ্টের হাতে। স্ত্রীর মুখের পানে এক পলক তাকিয়েই এই কথা মনে হল শ্যামাচরণের। মনে মনে চমৎকৃত হলেন। এরকম কজন পারে! ঐ অবিচল স্তব্ধতার ভিতর থেকে তাঁর ভিতরেও অনেকটা সাহস ও ভরসা সঞ্চারিত হল। তার সঙ্গে একটা গর্ববোধ। সংসারে বহু প্রকারে বঞ্চিত হলেও এই একটি দিকে তিনি ভাগ্যবান। তাঁর স্ত্রী শুধু প্রিয়া নয়, শিষ্যা নয়, সন্তানের জননী নয়, মহাকবি কালিদাসের ভাষায় সে সচিব। সে শুধু স্বামীর অনুগমন করে না, প্রয়োজন মত পাশে এসে দাঁড়ায়। তার মূল্য বোঝা যায় এমনি কোনো মহা সঙ্কটের দিনে।

তিনটি সন্তানকেও তিনি কাছাকাছি দেখতে পেলেন। হরিশ দাঁড়িয়ে ছিল ঠাকুরঘরের আঙিনার একধারে, দু-চোখে আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি। উমা ছিল তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় মেঝের উপর বসে। রক্তশূন্য শীর্ণ মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, যেন একটি দশ বছরের বালিকার মুখ। দিদির গা ঘেঁষে বসে ছিল যতীশ। আট বছরের ছেলে, চুপ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা কাকে বলে, সে কখনো জানে না। সারাক্ষণ মাঠে-ঘাটে বন-বাদাড়ে ঘুরে

* ভিতরের উঠোনের আব্রু রক্ষার জন্তে দুটো ঘরের মাঝখানকার ফাঁক বন্ধ করে ভেরেণ্ডা করে যে বেড়া দেওয়া হয়।

বেড়ায়। আজ যায়নি। কেন, সে-ই বলতে পারে, কিংবা হয়তো নিজেই জানে না। এখানে তাকে কেউ ডাকে নি। তবু কি মনে করে এসে বসেছে। সকলের মুখের দিকে চেয়ে এইটুকু বুঝতে পেরেছে, তাদের বড় বিপদ। তার কারণটাও অস্পষ্টভাবে শুনেছে। নদীর ভাঙন কী, সে কখনো দেখে নি, তার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। তবু চারদিকের ভয়-ভাবনার গভীর প্রতিচ্ছায়া তার শিশু-মুখেও জড়িয়ে আছে।

শ্যামাচরণ মেয়ে এবং ছেলেদের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারাও বাবার দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো তরফ থেকেই কথাবার্তা হল না। অন্যদিন এর বহু আগে প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করে তিনি ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। যেদিন যাজনিক বা অন্য কোনো কাজে দূরে কোথাও যাবার থাকে, সেদিন ঐ সঙ্গে নারায়ণ পুজোও সেরে নেন। আজ অনেক দেরি হেয়ে গেছে। ঠাকুরঘরের বারান্দার একপাশে জলচৌকি, জলভরা গাড়ু এবং তার মাথায় পাট-করা গামছা রোজকার মত সাজানো ছিল। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে নিয়ে শ্যামাচরণ ঘরে ঢুকে দেখলেন, নিত্যপুজার সমস্ত আয়োজন তৈরী। পিতলের পুষ্পপাত্রে ফুল বেলপাতা, তুলসী দূর্বা আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, একপাশে চন্দন ও অর্ঘ্যের চাল। কোষায় জল দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কুষিখানা উপুড় করে ডোবানো। সামনে শূন্য তামার টাট, বাঁদিকে নৈবেদ্যের থালা নিপুণ হাতে সাজানো। আরো বাঁয়ে পাশাপাশি রাখা আছে নারকেলের ছোবড়া ভরা ধুনুচি এবং পিলসুজের মাথায় তেল-ভরা পিতলের প্রদীপ। শুধু জ্বালিয়ে দেবার অপেক্ষা। তার সরঞ্জাম হাতের কাছেই গোছানো রয়েছে। একটি ছোট আগুনের মালসা, তার পাশে গুটিকয়েক গন্ধক লাগানো কাঠি। যে আসনে বসে তিনি পুজো করেন, সেটিও ঠিক জায়গায় পরিপাটি করে বিছানো।

সাধারণতঃ এইসব নিত্য আয়োজন শ্যামাচরণ নিজে করে থাকেন। ফুল তোলা বেল পাতা পাড়া থেকে, চন্দন ঘষা নৈবেদ্য সাজানো সব। উমার যখন বিয়ে হয় নি কিংবা বিয়ের পরে যতদিন শ্বশুরঘর করতে যায় নি, ততদিন সে টুকটাক সাহায্য করত, এটা এগিয়ে, ওটা সরিয়ে দিত। বাকীটুকু তিনি নিজেই সেরে নিতেন। ও চলে যাবার পর মনোরমা সবটাই করে দিতে চেয়েছিলেন, উনি দেন নি। হেসে, ছেলেমেয়েরা কেউ শুনতে না পায় এমনি চাপা গলায় বলেছিলেন, তুমি তো তোমার সাম্রাজ্য নিয়ে আছ, আমার এ ছোট্ট রাজ্যটুকুর ওপরে নজর কেন? এটা আমার।

'সাম্রাজ্য' কথাটির আভিধানিক অর্থ হয়তো বুঝতে পারেন নি মনোরমা, কিন্তু মর্মার্থটা ধরতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, আর ওটা বুঝি তোমার নয়?

—ওখানে আমি মহারানীর সামান্য প্রজা মাত্র।

'মহারানী' কথাটা উল্লেখের সঙ্গে ডান হাতখানা তুলে ধরেছিলেন স্ত্রীর দিকে, যার দেহে আভরণ বলতে দুটি মাত্র শাঁখা, বসন বলতে একখানি মোটা লালপেড়ে সাড়ে ন হাত শাড়ি। কিন্তু মুখখানাতে যে গর্বোজ্জ্বল আভাটুকু ফুটে উঠেছিল,

কোনো মহারানীর চেয়ে সেটা ছোট নয়। পরক্ষণেই কেন যেন চমকে উঠেছিলেন মনোরমা। অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, ও কথা বলতে নেই, ওতে আমার পাপ হয়। এগিয়ে এসে স্বামীর সম্মুখে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিলেন, রানী নয়, দাসীই যেন থাকতে পারি চিরকাল, এই আশীর্বাদ করো।

অক্ষরজ্ঞানহীনা ব্রাহ্মণীর মুখে এই ধরনের উক্তি শিরোমণিকে হয়তো সেদিন কিছুটা অবাক করে দিয়ে থাকবে, যদিও অবাক হবার আসলে কোনো কারণ ছিল না। মনোরমার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা যাই হোক, তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহিণী এবং দীর্ঘকাল তার সঙ্গে ঘর করেছেন।

মনোরমা স্বামীর ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন। নিজের হাতে ঘরদোর ঝাড়াপোঁছা, মেঝেটা রোজ পরিপাটী করে গোবর দিয়ে নিকানো, পুজোর বাসন মেজে তোলা, ধূপ দীপ নৈবেদ্যর উপকরণগুলো যথাসময়ে সংগ্রহ করে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা—এই জাতীয় কাজ ছাড়া ঠাকুরঘরের আর কোনো ব্যাপারে তিনি হাত দিতেন না। (বিশেষ পর্ব বা অনুষ্ঠানের কথা অবশ্য আলাদা)।

আজ স্বামীর ফিরতে দেরি হচ্ছে, কখন ফিরতে পারবেন, তারও কোনো স্থিরতা নেই। যখনই ফিরুন, যে মন নিয়েই ফিরুন, সকলের আগে তিনি যে তাঁর নিত্য-উপাসিত গৃহদেবতার চরণপ্রান্তে গিয়ে বসবেন, মনোরমা তা জানেন। তাই সব কাজ ফেলে যতটা সম্ভব তারই উদ্যোগে নিজেকে নিয়োজিত করে-ছিলেন।

শ্যামাচরণ ঘরে ঢুকেই নারায়ণের চতুর্দোলের সামনে সযত্নবিন্যস্ত পুজোপ-করণের দিকে চেয়ে প্রতিটি বস্তুতে স্ত্রীর হাতের অতিপরিচিত শুচিস্পর্শ অনুভব করলেন। তার মধ্যে কত প্রাণ, কত নিষ্ঠা, কত অনুরাগ, অভিনিবেশ, আর কী নিখুঁত নৈপুণ্য! এরই অবিচল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সংসার, তাঁর এতদিনের গার্হস্থ্য জীবন। তার উপরে আজ প্রচণ্ড আঘাত উদ্যত। কে জানে কী তার পরিণাম, কোথায় গিয়ে তাঁদের দাঁড়াতে হবে।

এ চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দিলেন না শ্যামাচরণ। ঐখানেই থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পুজোর আসনে বসলেন।

ভাঙন শুরু হয়ে গেল। গোড়া থেকেই পুরোদমে। সেটা সাধারণ নিয়ম নয়। প্রথম দিকে তার গতি কিছুটা মন্থর। ভিতরে ভিতরে তখনো আয়োজন পর্ব চলতে থাকে, ক্রমশ কোথা থেকে বেগ সঞ্চয় করে নদী, তারপর এগিয়ে চলে দুর্বার পদক্ষেপে। এবারে দেখা গেল সেই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। ফাটল দেখা দেবার পরদিন থেকেই দুর্জয় আঘাত হানল আড়িয়াল খাঁ।

ভাঙনের ধরনটাও আলাদা। এতদিন দেখা গেছে, শুরুতে মাটির উপর লম্বা ফাট ধরে, তারপর এক-একটা করে ছোট বড় চাপ ভেঙে ভেঙে পড়ে, আবার কিছু দূরে নতুন ফাটল দেখা দেয়। ছ বছর আগে বল্লভপুরের অকাল ভাঙনেও এই নিয়মের বিশেষ হেরফের হয় নি। বছর দুই হল ওপারে একে একে পাঁচখানা

গ্রাম গ্রাস করেছে আড়িয়াল খাঁ। সেও এই ভাবেই।

এবারকার চেহারাটা অন্যরকম। বিরাট বিরাট মাটির চাঁই আলগা হয়ে হয়ে বিপুল শব্দে ধসে পড়ল, বড় বড় গাছ অসংখ্য শিকড় সমেত উপড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে নদীগর্ভে, একখানা ঘরের অর্ধেকটা নেমে গেল, বাকীটুকু ঝুলতে লাগল পড়ার অপেক্ষায়—এসব দৃশ্য বিরল। তার বদলে, সভয়ে তাকিয়ে দেখছে গ্রামের মানুষ, হঠাৎ খানিকটা করে জায়গা আলগোছে বসে যাচ্ছে, নিমেষ হারিয়ে যাচ্ছে অতল তলে। এই মুহূর্তে যেখানটা ছিল নিরেট মাটি, পরমুহূর্তে সেখানে গভীর গহ্বর, তার নিচে খলখল করছে ঘোলা জল। এ এক নতুন খেলা আড়িয়াল খাঁর। ফাটলের বাঁশগাড়ি নেই, সরে যাবার নোটিশ নেই, সাড়া-শব্দ হাঁকডাক নেই, আচম্বিতে অতর্কিত আক্রমণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে দখল।

—এ তো দেখছি পদ্মার পথ ধরেছে আড়িয়াল খাঁ, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন কুশীডাঙ্গার নায়েব। এ্যাদ্দিন জানতাম এটা তাঁরই একচেটে, কীর্তিনাশার বিশেষ কীর্তি। ছোটনদীর ভাঙন মানে পাড় ভেঙে পড়া, এমন টুক করে বসে যায় শুনি নি।

—আজ্ঞে আমরাও শুনি নি, অনুচরদের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, পদ্মার চেয়ে ইনিও দেখছি কম যান না।

গ্রামের বয়স্ক লোকেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত। তার মধ্যে হারাণ ঘরামীও ছিল। তারই গলা শোনা গেল—এড়েল খাঁকে ছোট মনে করবেন না, কত্তা। বলে, নদীর দিকে চেয়ে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। আরো অনেকে তার অনুসরণ করল।

নায়েব অপাঙ্গে লোকটিকে লক্ষ্য করলেন, তার কথার কোন জবাব দিলেন না। যে চার-পাঁচজন তাঁর কাছাকাছি ছিলেন—সকলেই 'ভদ্রশ্রেণীর'—তাদের উদ্দেশে বললেন, চলুন, ফেরা যাক। এ আর কী দেখবো ? গ্রাম তো ধরল বলে। কিন্তু আমার কাছারির মাঠে তো এত লোকের জায়গা হবে না।

বলে, চলতে চলতে শ্যামাচরণের মুখের দিখে চোখ ফেরালেন। দুদিন আগে গ্রামের বিপন্ন লোকদের আশ্রয় দেবার আবেদন নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন নায়েবের কাছে এবং ঐ মাঠের প্রস্তাবও তাঁর। নায়েব কথা দিয়েছিলেন, তিনি নিজে গিয়ে ওখানকার অবস্থা বুঝে কী করা যায় বিবেচনা করে দেখবেন। সেই সূত্রে তাঁর আসা। সরেজমিনে তদারক।

শ্যামাচরণ বললেন, সকলের যাবার দরকার হবে না। কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনের কাছে আশ্রয় নেবে, একটু যাদের সঙ্গতি আছে তারা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। তাও যাদের নেই, তারাই শুধু আপনার দ্বারস্থ হতে চায়। পঁচিশ-তিরিশ ঘরের বেশি হবে বলে মনে হয় না। অত বড় মাঠ, ওর অর্ধেকেই বোধহয় কুলিয়ে যাবে।

—আসল কথা কি জানেন, পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়লেন নায়েব মশাই। অন্য সব লোকের দল থেকে বেশ খানিকটা তফাতে চলে এসেছিলেন তাঁরা। —আপনাদের কাছে বলতে বাধা নেই। একপাল ছোটলোক গিয়ে কাছারির

কাছে ভিড় করে এটা আমার ইচ্ছে নয়, আমার বাবুরাও তা চাইবেন না। চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা, বদমাস, কত রকম লোক আছে ওর মধ্যে। তা ছাড়া রোগব্যাধিরও অন্ত নেই। ওসব মাল যত দূরে থাকে ততই ভালো। শাস্ত্রে বলেছে না, শতহস্তেন বাজিনঃ, বলে যেন মস্ত একটা রসিকতা করে ফেলেছেন, এমনি ভাবে হো হো করে হেসে উঠলেন। গ্রামের কোন লোক তাতে যোগ দিল না।

মাঠের এপাশেই কাছারির পালকি অপেক্ষা করছিল। তাতে গিয়ে উঠলেন নায়েব মশাই। উঠবার আগে শ্যামাচরণকে যথারীতি প্রণাম এবং তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও একটা পাইকারি নমস্কার জানালেন।

'চাষাভুষো'র দল দূরে দাঁড়িয়ে রইল। পালকি রওনা হবার পর এগিয়ে এল 'কত্তাঠাকুরে'র কাছে—কী বলে গেল নায়েব মশায়, যদিও তার হাবভাব থেকে সকলেই বুঝেছিল, ভরসা বিশেষ নেই।

তিন চার রশি গিয়েই পালকিটা হঠাৎ থেমে গেল। একজন পশ্চিমা পাইক এল ছুটতে ছুটতে। শ্যামাচরণের সামনে এসে সেলাম করে বলল, হুজুর একবার বোলাইছেন আপনাকে।

—আমাকে?

—জী।

কাছে এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই নায়েব বললেন, সকলের সামনে কথাটা আপনাকে বলতে চাই নি, পণ্ডিত মশায়। ব্রাহ্মণ মানুষ, কষ্ট করে অতটা পথ হেঁটে গিয়ে আশ্রয় চাইলেন! না দেওয়াটা অধর্ম হবে। আপনি যদি আসতে চান, যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। বসত জমির সঙ্গে দু-চার বিঘে ব্রহ্মোত্তর—

—আপনি ভুল করছেন, নায়েব মশায়! আশ্রয় আমি নিজের জন্যে চাই নি।

—কিন্তু আপনাকেও তো উঠতে হবে!

—হবে বৈ কি!

—কোথায় যাবেন, স্থির করেছেন কিছু?

—এখনো করি নি।

—আমার তাহলে বলা রইল। যে কোনো দিন চলে আসুন।

বলে স্মিতমুখে শিরোমণির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে চাহনিতে বোধ-হয় একটা উত্তরের অপেক্ষা ছিল, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা।

শ্যামাচরণের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিল। কিন্তু তার মধ্যে ওর কোনো-টার আভাস পাওয়া গেল না। নিছক সৌজন্যের হাসি।

পরক্ষণেই নায়েবের গম্ভীর উচ্চকণ্ঠের আদেশ শোনা গেল—'চল্ রে।'

নদীর ভাঙনের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলল এদিকের ভাঙন—ঘর দোর ভাঙাচোরা। দেখা গেল খড়ের তুলনায় টিনের চালের সুবিধা অনেক।

টিনগুলোকে খুলে বাণ্ডিল বেঁধে মাথায় করে নিয়ে গেলেই হল, কাঠের ফ্রেমের টুকরোগুলোকেও অনেকটা অক্ষত অবস্থায় সরানো চলে, কিন্তু খড়ের চাল নাড়াচাড়া করতে গেলে টেকে না। ও অঞ্চলে গরুর গাড়ির চলন নেই। নদীর যা অবস্থা, নৌকোর কথা ভাবাই চলে না। ঘর দরজা জিনিসপত্র সব চলল লোকের মাথায়। সবাই মিলে সবাইকে পৌঁছে দিল কাছে কিংবা দূরে, যেখানে যে জোটাতে পারল কোনোরকম একটা আস্তানা, আত্মীয়-বান্ধবের বাড়িতে, অনাত্মীয় দয়ালু গৃহস্থের ঘরের পাশে বা শূন্য ভিটায় একটুখানি মাথা গোঁজবার ঠাঁই।

চলে যাবার আগে অনেকেই এসেছিল শ্যামাচরণের কাছে—আপনিও চলুন, ঠাকুর মশায়। আর দেরি করা ঠিক নয়। অনেক দিনের পুরনো বহু যত্নে তৈরী পুরু খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর কখানার দিকে চেয়ে কেউ কেউ বলেছিল, এগুলো পড়ে থাকে থাক, আপনার দুখানা চালা আমরাই হাতে হাতে তুলে দেবো। দু-একটি দূরের যজমান প্রস্তাব এনেছিল, পুরুত ঠাকুর যদি যান, যা হোক একটা ব্যবস্থা তারা করে দেবে। শ্যামাচরণ সম্মতি দেন নি, কাউকে প্রত্যাখ্যানও করেন নি। শুধু বলেছেন, উঠতে তো হবেই। আর, তোমাদের কাছে ছাড়া যাবোই বা কোথায় ? দেখি আর কটা দিন।

আসল কথা—যা তিনি কাউকে কখনো বলেন নি, এমন কি মনোরমাকেও না, যে-কথা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামী ছাড়া সকলের কাছে ছিল অজ্ঞাত—এমন কোনোখানে তাঁর মন যেতে চায় নি, যেখান থেকে প্রভাতের প্রথম আলোয় চোখ মেলে ঐ নদীটাকে দেখা যাবে না, ওর সিক্ত বাতাসের প্রথম স্পর্শটুকু পাওয়া যাবে না। ঐ আড়িয়াল খাঁর সঙ্গে তাঁর আজন্ম নাড়ির বন্ধন। ওর আর তাঁর মাঝখানে কোনো ব্যবধান তিনি সইতে পারবেন না। অথচ যেতে তো হবেই, এই নির্মম সত্যের বাস্তব দিকটাকে তিনি দেখতে পান নি তা নয়। স্ত্রী পুত্র কন্যার নিরাপত্তা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। একবার ভেবে-ছিলেন, উমাকে তার শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দত্তা কন্যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর উচিত হবে না। বিশেষ করে সে অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভে রয়েছে শ্বশুরকুলের বংশধর। এই বিপৎকালে, এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ওকে এখানে রাখা ঠিক নয়। স্ত্রীকেও জানিয়েছিলেন কথাটা। মনোরমা বলেছিলেন, বেয়ান থাকলে অবিশ্যি কথা ছিল না। একটা সেয়ানা ননদ বা জা যদি থাকত, অসময়ে একটু ভাত জল দিতে পারত। তাও নেই। ওখানে কার ভরসায় যাবে ? প্রথম পোয়াতী, একেবারে হেদিয়ে পড়েছে। কাছেও নয়, যে খবর পেলে চট করে গিয়ে দেখে আসবো।

কথাটা যে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, শ্যামাচরণ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাছড়া আরেকটা বাধা ছিল—কেমন করে যাবে। নৌকো বন্ধ হয়ে গেছে। ডুলিতে করে অতখানি পথ নিয়ে যাওয়া এ অবস্থায় রীতিমত বিপজ্জনক। ডুলি বেয়ারারাও চলে গেছে। সুতরাং আসন্ন-প্রসবা কন্যার সমস্ত ভার তাঁকেই নিতে হয়েছিল।

ষাজনিক কাজ প্রায় বন্ধ। এ-সময়ে চাষবাসের তদারকে খানিকটা সময় দিতে হয়। তার থেকেও মুক্তি দিয়েছে আড়িয়াল খাঁ। বেশির ভাগ জমি এরই মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে, যে কখানা বাকী, তাও নিতে দেরি নেই। সকালে উঠে অনেক দূরে কোন ঘাট থেকে—ভাঙন যেখানে এখনো বিস্তৃত হয় নি—স্নান সেরে ঠাকুরপুজোর পাট মিটিয়ে বেরিয়ে পড়েন শ্যামাচরণ। গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ান। প্রায় সব বাড়িই জনশূন্য। কোথাও কোথাও দু-এক ঘর এখনো পড়ে আছে। তারাও যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। হয়তো কাল এসে দেখা যাবে, নেই। যে-সব বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল, সামনে এসে দাঁড়াতেই এক দল লোক কলরব করে অভ্যর্থনা জানাত, সেখান দিয়ে যখন যান, পরিত্যক্ত গৃহস্থালির ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি এবং স্তূপীকৃত জঞ্জালের ভিতর থেকে কখনো হয়তো বেরিয়ে আসে দুটো একটা শীর্ণকায় কুকুর, বিকৃতমুখে তাকায়, ল্যাজ নাড়ে, কী বলতে চায় তারাই জানে।

একদিন এমনি একটা ছাড়া বসতি থেকে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, একটা কুকুর তাঁর সঙ্গ নিল। দু-একবার তাড়াতে চেষ্টা করলেন; গেল না। তারপর আর বাধা দিলেন না। মেঠো রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচুতে তাঁর বাড়ি। সেই পর্যন্ত এসে সে হঠাৎ থেমে গেল। দুপুর গড়িয়ে গেছে। মাথার উপর কড়া রোদ। কুকুরটা জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল, কিন্তু সেই সামান্য চড়াই পথটুকু উঠবার চেষ্টা করল না। শ্যামাচরণ বিস্মিত হলেন। প্রথমে মনে করে-ছিলেন, কদিন খেতে পায় নি, তাঁকে দেখে দুটো ভাতের আশায় সঙ্গ নিয়েছে। এখন মনে হল, এটা ওর সঙ্গ নেওয়া নয়, সঙ্গ দেওয়া। শ্মশানের মত শূন্য রিক্ত জনপ্রাণীহীন গ্রামের পথে একটা মানুষ বিষণ্ণমনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাই দেখে সে যেন তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছে।

এই প্রাণীটির প্রতি তাঁর কোনোদিন কোনো বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কার এদের বরং অস্পৃশ্য এবং অশুচি বলে গণ্য করতে শিখিয়েছে। এই মুহূর্তে কী মনে করে শ্যামাচরণ কুকুরটাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। কিন্তু সে যেখানে ছিল, সেইখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। মনোরমা বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে বললেন, ওকে দুটো ভাত দাও। অনেকটা পথ আমার সঙ্গে এল, কিন্তু এটুকু আর উঠতে চাইছে না।

মনোরমা মুখে একটা শব্দ করে 'আয় আয়' বলে ডাকতেই কুকুরটা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল তাঁর কাছটিতে। তিনি তাড়া দিয়ে উঠলেন, দাঁড়া, ছুঁয়ে দিবি নাকি?

গ্রামে সবাই যখন চলে যাচ্ছে, এবং ভাঙনের কিছুমাত্র বিরতি নেই, তখনো তাদের এমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা হরিশের কাছে শুধু দুর্বোধ্য নয়, রীতিমত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। পিতার গতিবিধি সে কোনোকালেই বুঝতে পারে না, তাঁর মতামতের সঙ্গে তার কম ক্ষেত্রেই মেলে, তবু তাকে কোনোদিন অবাধ্য হতে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে; তাও মায়ের

কাছে। তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। যেখানে তার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারেন না, কিংবা মনে করেন সে যা বলছে, ঠিক, সেখানেও শুধু একটি কথাই বলে থাকেন,—উনি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবেন, কিংবা উনি যা করছেন, সকলের ভালোর জন্যেই করছেন।

এবারেও অসহিষ্ণু পুত্রকে প্রথমদিকে ঐ সব কথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ হাল ছেড়ে দিলেন। একদিন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, আমার কাছে প্যান প্যান করে কী হবে? ওঁকে বলতে পারিস না? বড় হয়েছিস, তুই নিজেও তো একবার বেরিয়ে দেখতে পারিস?

—বেশ, তাই দেখছি। চেষ্টা করলে একটা ভিটে-ঘাটা যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু তোমাদের আবার সেটা পছন্দ হবে তো?

প্রশ্নটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল। মনোরমা সেটা বুঝেও চুপ করে রইলেন।

হরিশ তার পরদিনই সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসুদেবপুর রওনা হয়ে গেল। বাবাকে কিছু জানালো না। মাকে শুধু বলে গেল, ফিরতে কদিন দেরি হবে, কিন্তু গন্তব্যস্থানের কোনো উল্লেখ করল না।

সেদিন আর বড় ছেলের সম্বন্ধে কোনো খোঁজ নিলেন না শ্যামাচরণ। বিপদ, তার থেকে মুক্তিলাভের আশু প্রয়োজন, তাকে আশ্রয় করে চারদিকের সেই বিধ্বস্ত রূপ—এইসব নানা দুর্ভাবনায় মনটা হয়তো পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়েছিল, অন্য কোনো দিকে নজর পড়ে নি। পরদিন সকালে হঠাৎ খেয়াল হল। ছোট ছেলেকে সামনে পেয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোর দাদা কোথায় রে যতি?

—দাদা বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছে, জানিস?

—না, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।

সে আর এল না, এল উমা। তার মুখেই শুনলেন, হরিশ কাল সকালের দিকে দুটো ডাল ভাত মুখে দিয়ে আশ্রয়-সন্ধানে বেরিয়েছে, কোথায় বা কোন্ দিকে, কাউকে বলে যায় নি। শ্যামাচরণ আর কিছু জানতে চাইলেন না। প্রথমে মনে হল, এরা আর তাঁর উপরে আস্থা রাখতে পারছে না। তারপর ভাবলেন, এ ঠিকই হয়েছে। হরিশ তাঁর প্রথম পুত্র, বড় হয়েছে। তার একটা দায়িত্ব আছে বৈকি। পিতার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে সে যদি মনে করে এ সঙ্কটে তারও কিছু করণীয় আছে, সেইটাই স্বাভাবিক। মনে মনে খুশী হবার চেষ্টা করলেন শ্যামাচরণ, একটা প্রশ্ন তবু রয়ে গেল—তাঁকে একবার বলে গেলে কী ক্ষতি হত?

বাইরের উঠোনে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলে দেখলেন, একজন রুগ্ণ দুর্বল লোককে দুদিক থেকে দুজনে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। আরেকটু কাছে এলে চিনতে পারলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, কে, লক্ষ্মণ? এ কি চেহারা হয়েছে তোমার?

লক্ষ্মণ সেই অবস্থাতেই কোনোরকমে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে ক্ষীণ স্বরে

বলল, মরে গিয়েছিলাম, বাবাঠাকুর। আপনার আশীর্বাদে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছি।

॥ ৫ ॥

আড়িয়াল খাঁর এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব বেশী দিনের নয়—অন্যত্র সে যে ভাবেই আসুক, এখানে সে পাট-বাহন, অর্থাৎ প্রথম আগমন পাটের পিঠে—কিন্তু কলেরার সঙ্গে পরিচয় এদের অনেক দিনের। পাঁচ-ছ বছর পর পর এক-বার করে আসত। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাস দুয়েকের মধ্যে বেশ ভারী রকম বলি সংগ্রহ করে সরে পড়ত। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ঐখানে তার মৌলিক তফাত এবং কলেরার নামে লোকের যে ভীষণ আতঙ্ক, তার কারণও ঐ প্রচণ্ড গতিবেগ।

হিসাব নিলে হয়তো দেখা যেত সারা বছরে ম্যালেরিয়ার মবলগ মাশুল তার ঐ দুরন্ত দোসরটির চেয়ে বিশেষ কিছু কম নয়! কিন্তু সেটা লোকের চোখে পড়ত না, যেহেতু ম্যালেরিয়ার স্বভাবটি মৃদুমন্থর, চালচলন ঢিলেঢালা, সে যা নিত, ধীরে-সুস্থে, গৃহস্থকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিয়ে। কলেরার রীতিনীতি একেবারে উলটো। যখনই আসবে, ধর, মার, কাট। কোনো নোটিশ নেই, চিকিৎসা দূরে থাক, দুদণ্ড শুশ্রূষার অবসর দেবে না, যাকে ধরবে, যত বড় জোয়ানই হোক, দেখতে না দেখতে জল করে দেবে। তাই, যখনই কলেরা লাগত, গ্রামে গ্রামে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যেত। এই দুর্ধর্ষ মহাব্যাধিকে ঠেকাবার কোনো অস্ত্রই তখন এসব মানুষের হাতে ছিল না। একমাত্র ভরসা দৈবানুগ্রহ। তারই প্রার্থনা জানাত সবাই। গ্রামে গ্রামে রক্ষাকালী, কোথাও বা শ্মশানকালীর পূজার আয়োজন হত। বারোয়ারী পূজা। তাতে সকল শ্রেণীর হিন্দুরা তো বটেই, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাও দূর থেকে যতটা সম্ভব পরোক্ষে যোগ-দান করত।

ঐ অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারে কলেরার সর্বনাশী করাল মূর্তি বারংবার দেখা দিয়েছে। ক্ষতি যা রেখে গেছে, অপূরণীয়। কত কোলাহলমুখর গৃহে দিয়ে গেছে শ্মশানের স্তব্ধতা।

শ্যামাচরণ শিরোমণি তাঁর প্রথম জীবনে ঘরে ঘরে কলেরার যে সংহাররূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, (পরবর্তীকালে তার প্রকোপ অনেকটা কমে এসেছিল) তারই প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, আমরা প্রায়ই বলি, মানুষের জীবন বড় নশ্বর, বড় অনিশ্চিত, আর বলি, মৃত্যুর আচরণে বিন্দুমাত্র পক্ষপাত নেই, সে নির্মম, কিন্তু সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। মুখে বললেও এই দুটো কঠোর সত্য আমরা ভুলে যাই। তাই মাঝে মাঝে জীবন-মৃত্যুর যিনি নিয়ামক এই দুর্দান্ত রোগটাকে পাঠিয়ে দেন। এ আমাদের সজাগ করে দিয়ে যায়।···

তাঁর চোখের উপর যারা চলে গেছে, তার থেকে দুটো দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন —ভোলা সর্দারকে তোমরা দ্যাখ নি। বিকেল বেলা দেখলাম, দু-মণী বোঝা

মাথায় নিয়ে হন হন করে ছুটে চলেছে হাটের পথে, পাহাড়ের মত মানুষটা, ভোরে গিয়ে তাকে আর চিনতে পারি না। একটা রাতের মধ্যে অত বড় বলিষ্ঠ প্রাণটা তো গেছেন, অমন দশাসই দেহখানাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পড়ে আছে শুধু একটা কঙ্কাল। নকুল ঘোষের সাত বছরের মেয়েটি, মেয়ে তো নয় একরাশ তাজা টগর ফুল। সকাল বেলা ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে এক সাজি ফুল দিয়ে গেল। সন্ধ্যা হতে না হতেই শেষ।

দেহী মাত্রেরই মৃত্যু আছে। রোগব্যাধিগুলো তার বাহন। কিন্তু এর মত এত নিশ্চিত, বিশ্বস্ত বাহন তার আর নেই, এমন করে অতর্কিতে, অসময়েও কেউ তাকে বয়ে নিয়ে আসে না।

শ্যামাচরণের পিতৃগৃহেও কলেরা কয়েকবার হানা দিয়েছে এবং প্রায়ই খালি হাতে যায় নি। তাঁরা প্রথমে ছিলেন তিন ভাই, ঐ ব্যাধির কল্যাণে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালেন একা। চার বোনের মধ্যে একটি ঐ কলেরার হাতেই অকালে প্রাণ দিয়েছিল।

তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই দুর্গাচরণের ক্ষতিটাই বোধহয় ওঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী—সংখ্যায় নয়, গুরুত্বে, পরিমাণে। পর পর চারটি মেয়ে। একটি পুত্র-সন্তানের কামনায় এমন কোনো দেবতা নেই যার শরণ নেন নি, এমন কোনো ব্রত নেই তাঁর স্ত্রী যেটা পালন করেন নি। নিরন্তর উপবাসে নিস্তারিণীর শরীর শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গিয়েছিল।

অনেক দিন কৃচ্ছ্রসাধনার পর শেষ বয়সে দেবতার দয়া হল। এবার যে এল সে পুত্রসন্তান। কিন্তু জন্ম থেকেই ক্ষীণজীবী। যত্নের ত্রুটি হল না। ধীরে ধীরে বড় হল। গায়ে একটু মাংসও লাগল। বাপ-মায়ের ভরসা হল, বেঁচে যাবে। আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীরাও বলল, আর ভয় নেই। যেখানে যত মানসিক পুজো ছিল, একে একে দিতে শুরু করলেন দুর্গাচরণ। এমনি কোন্ দূর গ্রামে কোনো এক জাগ্রত কালীর মানত শোধ দিয়ে ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরতেই শুরু হল ভেদবমি। যেখানে পুজো দিতে গিয়েছিলেন, সে অঞ্চলে তখন কলেরার প্রকোপ চলছে। এক বেলার মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল ছেলেটা। ভোর হতে না হতেই শেষ।

মেয়েরা সব যে-যার শ্বশুরবাড়ি। কাউকে খবর দেবারও ফুরসৎ হল না। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই নেই। শ্যামাচরণ দু-একটা বড়ি দিয়েছিলেন, যদিও জানতেন, কোনো ফল হবে না। এ রোগ পরিচর্যার অবসর দেয় না। তবু সারারাত জেগে যতটুকু করণীয়, সেঁক তাপ, মাথায় একটু হাওয়া, ঘন ঘন বিছানা বদলানো, ঘরদোর পরিষ্কার করা—সবটাই করতে হয়েছিল মনোরমাকে। বলতে গেলে একই বাড়ি, পাশাপাশি উঠোন, মাঝখানে শুধু একটা পেটকাটা দোচালা ঘর। দু জায়ের মধ্যে খুব যে মিলমিশ ছিল তা নয়। তার মূলে একটা কারণই বড়—মনোরমার দুটি ছেলে আর ও তরফে শুধু মেয়ের পাল। বড় জাকে সেটা উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধত। সে জ্বালা তিনি চেপে রাখতে পারতেন না, কিংবা চাইতেন না। তাই মনোরমাও পারতপক্ষে ওদিকে বড় একটা ঘেঁষতেন না।

কিন্তু এ ঘোর বিপদে অতি বড় শত্রুও দূরে থাকতে পারে না, আর এ তো একান্ত নিকটজন। খবর পেয়েই ছুটে গেলেন মনোরমা। এতকাল পরে যদিবা একটি দিলেন ভগবান, সেও বুঝি টেঁকে না। এ কথা ভেবেও তাঁর বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। এ রোগ তো ওদের অচেনা নয়। লক্ষণ টের পেয়েই ছেলের বাবা-মা দুজনের আর হাতে পায়ে কোনো সাড় ছিল না। মনোরমা স্বামীকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। যতীশ তখন সবে হামা দিতে শিখেছে। তার ভার দিলেন মেয়ের উপর। হরিশ রইল বাইরের দিকে—কখন কী দরকার পড়ে কাকে ডেকে আনতে হবে, কোথায় ছুটতে হবে, এই সব নিয়ে। তারই বা বয়স কত।

সকলের সব চেষ্টাই নিষ্ফল হল।

ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর নিস্তারিণী দু হাতে বুক চেপে ধরে গৃহদেবতা নারায়ণের কাছে নালিশ জানাচ্ছিলেন, কেড়ে নেবার ইচ্ছেই যদি ছিল ঠাকুর, সেদিন কেন নিলে না, যেদিন কোনো সাড় ছিল না, চোখ চায় নি, কাঁদে নি, সবাই বলেছিল মরা!······এতগুলো বছর কার জন্যে রক্ত জল করলাম, টানলাম, বড় করলাম······!

তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না, গলা দিয়ে শুধু একটা ক্ষীণ ভাঙা ভাঙা আওয়াজ বেরোচ্ছিল। মনোরমা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃত্যু তিনি অনেক দেখেছেন। শোকাচ্ছন্ন নরনারীর, বিশেষ করে এর মত মা, যার কোল শূন্য করে একমাত্র সন্তান চলে গেছে, তাদের সেই মর্মভেদী আর্তনাদ, তাও কম শোনেন নি। কিন্তু শোক যে মানুষকে এমন নিঃস্ব এমন রিক্ত করে দিয়ে যায়, তার কাঁদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত রেখে যায় নি, সে দৃশ্য আজ এই প্রথম দেখলেন। এইমাত্র সকলে মিলে যাকে শ্মশানে নিয়ে গেল, তার জন্য নয়, এই যে হতভাগিনী পড়ে রইল সারা জীবনব্যাপী মহাশ্মশানের শূন্যতা নিয়ে, তার দিকে চেয়ে মনোরমার পুত্রসুখ-তৃপ্ত মাতৃহৃদয় তীব্র বেদনায় ছট্‌ফট করতে লাগল।

এই রকম অবস্থাতেই মানুষের মনে কোনো একটা বৃহৎ ত্যাগের আকাঙ্খা জাগে। নদীর বুকে যখন প্লাবন আসে, সে সময় তার নিজেরই কূল থেকে রাশি রাশি মাটি ছিনিয়ে নিয়ে স্রোতের মুখে বিলিয়ে দেয়, না দিয়ে তার তৃপ্তি নেই, উদ্বেলিত ভাবাবেগে হৃদয় যখন পরিপূর্ণ, মানুষও তেমনি তার একান্ত নিজস্ব কোনো প্রিয় বস্তু দু হাতে বিলিয়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনোরমার অন্তরেও এক দুর্বার ব্যাকুলতা জেগে উঠল। যে জায়ের উপর তিনি কোনো-কালেই প্রসন্ন ছিলেন না, যার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না বলা চলে, ঐ মুহূর্তে তার জন্যে কী করবেন, কী দিয়ে তার হৃতসর্বস্ব জীবনের শূন্যতাকে ভরে দেবেন, এই চিন্তাই তখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ দেখলেন ঠাকুর-ঘরের বারান্দার ওধারে একটা খুঁটি ধরে হরিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেও বড় ভেঙে পড়েছিল। জ্যাঠাইমার ঐ রোগা ছেলেটা তার প্রায় সমবয়সী, সামান্য কিছু ছোট ছিল।

হরিশকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিলেন মনোরমা। কী মনে করে তার

হাতখানা চেপে ধরে বড় জা'এর পাশটিতে গিয়ে ডাকলেন, দিদি—

নিস্তারিণী সাড়া দিলেন না, চোখ তুলেও চাইলেন না। মনোরমা বসে পড়ে ডান হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, একবার চেয়ে দ্যাখ কে এসেছে। তোমার হ'রে। ওকে একবার কোলে নাও। তোমার পাঁচুও যা, হ'রেও তাই।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে যমের কাছ থেকে পাঁচ কড়া কড়ি দিয়ে ছেলেকে কিনে রেখেছিলেন নিস্তারিণী। তাই তার নাম পাঁচকড়ি।

মনোরমার শেষের দিকের কথা কটি কানে যেতেই তিনি হঠাৎ মুখ তুলে চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন। হরিশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে কী যেন দেখলেন। তারপর দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে কেঁদে উঠলেন।

এতক্ষণে তাঁর গলায় স্বর ফুটল।

তখন থেকে এক আশ্চর্য পরিবর্তন হল নিস্তারিণীর। প্রতিবেশিনীরা এত বড় শোকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতে এসে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ স্পষ্টতঃ নিরাশ হল। যার যা রীতি। কেউ এসে দাঁড়ালেই সদ্যমৃত সন্তানের মা ছুটে এসে মাটিতে মাথা খুঁড়ে কিংবা বুক চাপড়ে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন, কান্নার সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকবেন তার রোগের কাহিনী, কিংবা মৃত্যুর দু'দিন আগে যে-সব কথা সে বলে গেছে, কী খেতে চেয়েছে, কাকে দেখতে চেয়েছে, আর পড়শী-গৃহিণী সন্তানহারা জননীকে টেনে তুলে জীবনের অনিত্যতা, 'পোড়া বিধাতা'র অবিচার ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দুটো জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তত্ত্ব শোনাবে। এই তো চলে এসেছে বরাবর। কোথায় সে-সব? নিস্তারিণীর কণ্ঠে কান্নার সেই বিশেষ সুরটি কখনো শোনা গেল না। মুখেও কোনো কথা নেই। লোকজন দেখলে চোখদুটো একটু ছলছলিয়ে ওঠে। তাই দেখেই পড়শীরা যখন মৃতের নাম উল্লেখ করে, তার কল্পিত গুণাবলীর তালিকা দিতে বসে, উনিই যেন তাদের প্রবোধ দেন,—"লোকে কথায় বলে পেটের শত্তুর। ও ছিল তাই, আমার সাতজন্মের শত্তুর। যে কদিন ছিল হাড়ে কালি দিয়ে গেছে"......বলে, এদিক ওদিক চেয়ে হরিশকে খোঁজেন, চোখের উপর না দেখলে ডাকতে থাকেন, সাড়া না পেলে উঠে পড়েন। যারা দুঃখ জানাতে এসেছিল, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উলটে ইশারা করে,—ব্যাপার কী? আরেকজন ডান হাতের আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ইশারাতেই জবাব দেয়, কে জানে? সরব মন্তব্যও করেন নিজেদের মধ্যে—কেউ বলে আদিখ্যেতা, কেউ বলে ঢং।

এরপরে সান্ত্বনাদায়িনীর দল খানিকটা অপমানিত বোধ করেই বোধহয় এ বাড়িতে যাওয়া আসা ছেড়ে দিল। নিস্তারিণীও তার জন্যে বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন বলে মনে হল না।

হরিশ কিছুদিন 'বড়মা'র কাছেই থেকে গেল। ওখানে খায়, ওখানেই শোয়। মাঝে মাঝে ও বাড়িতে, মা-ভাই-বোনের কাছে আসে। ফিরতে দেরি হলে নিস্তারিণী ডাকাডাকি করেন, কখনো নিজেই এসে এ তরফে উপস্থিত হন। মনোরমা রান্নাঘর কিংবা তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে

বসতে বলেন। নিস্তারিণী বড় একটা বসেন না। হরিশ যদি থাকে, তাকে ডেকে নিয়ে চলে যান, আর যদি মাঠে-ঘাটে কিংবা পাড়ায় কোথাও বেরিয়েছে দেখতে পান, এলেই পাঠিয়ে দেবার তাগিদ দিয়ে চলে যান।

পাশের গ্রামে মাইনর স্কুলে পড়ত হরিশ। তখন গরমের ছুটি যাচ্ছিল। যখন স্কুল খুলল, আপনা থেকেই বড়মার কাছে যাওয়া-আসাটা কমে গেল। তখনো কোনো কোনো দিন নিস্তারিণী সকাল সকাল রান্না করে সামনে বসে খাইয়ে ওখান থেকেই ওকে স্কুলে রওনা করে দিতেন। পাড়াগাঁয়ের সেটা সাধারণ দস্তুর নয়, অন্ততঃ ঐ সময়ে ও অঞ্চলে ছিল না। ছেলেরা আগের রাতের রান্না করা বাসী ভাত—গরমের দিনে পান্তা, শীতের দিনে শুকনো (ওখানকার ভাষায় করকরা)—ডালপোড়া, মাছচচ্চড়ি বা ঐরকম একটা কিছু দিয়ে খেয়ে স্কুলে যেত। মনোরমাও ছেলেকে তা-ই খাইয়ে পাঠাতেন। জা-এর এই নতুন ব্যবস্থা অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠেই সাত-তাড়াতাড়ি ইস্কুলের ভাত রেঁধে দেওয়া, তাও মাঝেসাঝে নয়, একদিন দুদিন পর পর, তাঁর ঠিক মনঃপূত হল না। এটা যেন নিজেদের অবস্থাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, সুতরাং ছেলের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক। গরম ভাতের কোলে অতটা করে সর-বাটা গাওয়া ঘি, বাটির পর বাটি সাজিয়ে ডাল তরকারি মাছ, তার সঙ্গে ঘন-আঁটা দুধ ছেলেকে তিনি ক্বচিৎ কখনো ছাড়া কোনো দিনই দিতে পারবেন না। ও ছেলেমানুষ, দুদিন পরে নিজের বাড়িতে ভাতের থালার সামনে বসে তার জন্যে ওর মনটা যদি খুঁতখুঁত করে, তাকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া, তাঁর তো ঐ একটি নয়। কোলেরটি না হয় এখনো কিছু বোঝে না, কিন্তু মেয়ে? সে কি ভাবছে?

একদিন সকালে উঠে মুখহাত ধুয়ে বারান্দায় মাদুর পেতে হরিশ যখন পড়তে বসবার আয়োজন করছে, মনোরমা বললেন, আজ স্কুলে যাবার আগে বাড়ি থেকে খেয়ে যাস।

হরিশ মাথা চুলকে বলল, বড়মা যে কাল বলে রেখেছে ওখানে খেতে।

—আচ্ছা, আমি তাকে বলে পাঠাচ্ছি।

তখনই উমাকে ডেকে বলে দিলেন, তোর বড়মাকে বলে আয় হ'রে আজ বাড়িতে খেয়ে স্কুলে যাবে।

উমা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। স্বাভাবিক কারণেই সে এই নতুন বন্দোবস্তটা মোটেই পছন্দ করছিল না। এতকাল যাবৎ যিনি ওদের দু ভাই-বোনকে একটা দিনও ডেকে দুটো মুড়ি খেতে দেন নি, তাঁর হঠাৎ এতটা মায়া উথলে ওঠা, তাও একজনের জন্যে, ওর কাছে নেহাত বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে গেল।

খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ এ বাড়িতে এলেন নিস্তারিণী। বললেন, আমি তো ভাত চাপাতে যাচ্ছিলাম। তুই আমার মানা করে পাঠালি কেন?

—আজ থাক, দিদি। এখানেই দুটো খেয়ে যাবে। রোজ রোজ তোমার কষ্ট করবার কী দরকার?

—অবাক করলি, মেজবৌ। দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে আমার কষ্ট হবে!

—শুধু তো ভাত ফোটানো নয়, তার সঙ্গে অতগুলো করে রান্না।

—কোথায় অতগুলো? ডাল, একটা তরকারি আর একটু মাছ। সব দিন তাও পেরে উঠি না। কাল একটা 'ইলশে' মাছ এনেছিল ওর জ্যাঠা। ভাবছিলাম, বেশী কিছু না করে তার দুখানা ভেজে দেবো।

উমার মনে বোধহয় দীর্ঘদিনের ক্ষোভ জমেছিল। হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আমাদেরও একটা এত বড় 'ইলশে' মাছ দিয়ে গেল এই মাত্তর।

আড়িয়াল খাঁয় যখন ইলিশের ঝাঁক আসে, এক-একটা মাছ এক আনা কখনো বা দু পয়সায় গিয়ে নামে। বাজারে বয়ে নিয়ে যাবার মেহনত না করে জেলেরা পাড়ে এসে বেচে দেয়, খদ্দের না পেলে বিলিয়েও দেয়। দুর্গাচরণ সকলের মত হয় বিনামূল্যে নয়তো বড় জোর গোট-দুই পয়সা দিয়ে নদীর ঘাট থেকেই মৎস্যটিকে সংগ্রহ করে থাকবেন। শ্যামাচরণের কথা আলাদা। তিনি কখনো ওভাবে মাছ সংগ্রহ করেন না, জেলেরা অনেক সময় তাঁর বাড়িতে পোঁছে দিয়ে যায়। সকালের মাছটা সেইভাবেই এসেছিল।

মনোরমা যদিও বুঝলেন উমা ওটা কথার পৃষ্ঠে হঠাৎ বলে ফেলেছে তাহলেও ধমকে উঠলেন, কী কথার ছিরি? দিনদিন কী তরিবতই শিখছেন মেয়ে! তোকে না বললাম, যতের কাঁথা দুখানা কেচে আনতে?

মায়ের ধমক এবং বকুনি উমার বিশেষ লাগল বলে মনে হল না। এতে সে অভ্যস্ত। তবু অন্য সময় হলে মুখ কালো করে সরে যেত। এখনও গেল, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে ঠোঁটের কোণে একটি সূক্ষ্ম হাসির ঝলক খেলে গেল। এই সুযোগে 'জেঠী'কে যে একটা বেশ মনের মত কথা শুনিয়ে দিতে পেরেছে, তাতেই সে খুব খুশী।

মনোরমা ছেলেকেও একটা তাড়া দিলেন, কি হল? পড়তে পড়তে চুপ করে গেলি যে?

হরিশ গলা চড়িয়ে পাঠ শুরু করল।

নিস্তারিণী আর দাঁড়ালেন না। কোনো কথাও বললেন না। মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

কয়েকদিন হরিশকে ডাকলেন না। সেও ওদিকে গেল না। মা তাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ না করলেও সে বুঝে নিয়েছিল, এই যাওয়া-আসাটা তাঁর পছন্দ নয়।

দিন-তিনেক পরে আবার এলেন নিস্তারিণী। এমন একটা সময় বেছে নিলেন, যখন বাড়িতে মনোরমা একা। উত্তরপোতার ঘরের (ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে তিনি শোন) বারান্দায় বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। মুখ তুলে বললেন—কী দিদি?

—তোকে একটা কথা বলতে এলাম, মেজবৌ।

আপনজনের কাছে বিশেষ কিছু চাইতে হলে মানুষের কণ্ঠে আপনা থেকেই যে সুর আসে, সেই সুর; বড় জায়ের কাছ থেকে যা কখনো শোনেন নি মনোরমা। 'বসো' বলে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে মনে মনে বেশ কিছুটা

কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নিস্তারিণী বললেন—তুই নিজেই একদিন বলেছিলি, ভরসা দিয়েছিলি, তা না হলে হয়তো আমি সাহস করতাম না।

মনোরমার বুকের ভিতরটা অজানা কারণে নড়ে উঠল। গভীর উৎকণ্ঠায় নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন জায়ের মুখের দিকে। কী শুনবেন কে জানে—সেই ভয়ে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হল না। নিস্তারিণী ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করে যেন ভিক্ষা চাইছেন, এমনি সুরে বললেন—বড় ছেলেটাকে তুই আমায় দিয়ে দে, মেজবৌ। তোর কোলে তো আরেকটা আছে, ঠাকুরের আশীর্বাদে আরো হবে।

মনোরমার চোখ দুটো নেমে এল, মুখে কোনো কথা ফুটল না। ভিতরে ভিতরে যেন পাথর হয়ে গেলেন। নিস্তারিণী বোধহয় জায়ের এই রূপান্ত ঠিক বুঝতে পারলেন না। আরো একটু এগিয়ে গেলেন, ওকে আমরা পুষ্যি নেবো। ওর জ্যাঠার ছিটেফোঁটা জমি-জিরেত যেখানে যা আছে, সব ও-ই পাবে।

—তার মানে ছেলেটাকে তুমি বিক্রী করতে বলছ!

নিস্তারিণী চমকে উঠলেন। ছোট জায়ের সঙ্গে এর আগে অনেক ঝগড়া বিরোধ হয়ে গেছে। কটু-কাটব্য তিনি যেমন বলেছেন, সেও কম বলে নি। কিন্তু এমন কঠিন স্বর তার গলায় শোনেন নি। তবু একবার প্রতিবাদের চেষ্টা করলেন—ছি ছি, এ তুই কী বলছিস্! পুষ্যি দেওয়া মানে কি বিক্রী করা?

—তা ছাড়া কী? দৃপ্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন মনোরমা। তোমার দেওর গরিব মানুষ; তিনটি সন্তানকে তেমন করে খাওয়াতে পরাতে পারি না। তাই বলে দু-বিঘে জমির লোভে ছেলেটাকে ভাসিয়ে দিতে পারব না। না খেয়ে মরলেও, না।

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। নিস্তারিণী তৎক্ষণাৎ উঠতে পারলেন না। হাতে-পায়ে জোর পেলেন না। ভিতরটাও ভেঙে আসছিল। তিনদিন ধরে অহরহ যে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছিলেন, তার উপরে এই ব্যর্থতার আঘাত। চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। চলতে চলতে বললেন—তুই আমাকে ভুল বুঝলি, মেজবৌ।

দুই পরিবারের যাতায়াত মেলামেশা আগেও তেমন ছিল না। পাঁচকড়ি যেদিন থেকে পড়ল, আর উঠল না, তার পর থেকে যেটুকু শুরু হয়েছিল, এবার একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বিরোধ বন্ধ হল না। তবে সেটা প্রায় এক-তরফা। নিস্তারিণী নেপথ্য থেকে যে-সব শব্দভেদী বাণ ছোট জাকে লক্ষ্য করে ঘন ঘন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তার তীক্ষ্ণতা যতই দুঃসহ হোক মনোরমা বেশির ভাগ সময় সয়ে যেতেন। কুৎসা, গালিগালাজ, অভিসম্পাত ইত্যাদির বহর যখন সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন আর চুপ করে থাকতে পারতেন না। মাঝে মাঝে দু-একটা ফিরিয়ে দিতেন। একদিন শ্যামাচরণ বললেন—ওসব কথার জবাব দিতে নেই। মনে করো ওগুলো আমাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে না।

—ছেলেমেয়ে তিনটার নাম করে 'অষ্টপহর' কানের গোড়ায় কেউ শাপমন্যি

করতে থাকলে কদ্দিন সহ্য করা যায় ?

—কী হবে ও'র শাপে ? উনি তো আর ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নন। তাছাড়া কোথায় ও'র জ্বালা তা তো জানো !

এর পর থেকে মনোরমা ওদিকে আর কান দিতেন না। যখন অসহ্য মনে হত, বাড়ির সামনে মাঠের দিকে গিয়ে দাঁড়াতেন, যেখান থেকে সব কথাগুলো শোনা না যায়।

দু ভায়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ কম হত কিন্তু বিরোধ ছিল না। জায়েদের সম্পর্কটা যখন তিক্ততার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে. একদিন দুর্গাচরণ এসে বাইরের আঙিনা থেকে ডাক দিলেন—শ্যামা আছিস ?

শ্যামাচরণ বেরিয়ে আসতেই তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নদীর দিকে। যেতে যেতে বললেন—কাল খবর পেলাম, বাসুদেবপুরের বোসেরা মন্দিরের জন্য একজন পুরুত খুঁজছে। বাড়ি দেবে, বিঘে কয়েক ব্রহ্মোত্তর জমিও আছে সেই সঙ্গে। 'পুজরী' যে ছিল হালে মারা গেছে। তোকে তো ওরা খুব মানে-টানে। একটা চিঠি যদি লিখে দিস, ওটা নিয়ে আমি গিয়ে দেখা করতে পারি।

শ্যামাচরণ সবিস্ময়ে বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি পুজরীর কাজ করবেন !

—দোষ কী ? লোকে নিন্দে করবে ? করুক। একঘরে করলেই বা আমার কী আসে যায় ? মেয়েগুলোকে পার করে দিয়েছি। কদ্দিনই বা বাঁচব ? তার পরেও যদি বুড়ীটা বেঁচে থাকে, কোনো একটা মেয়ের কাছে গিয়ে থাকবে।

কথাগুলো হালকা সুরে বললেও তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন বেদনাটুকু শ্যামাচরণকে স্পর্শ করল। এই পুত্রহীন বৃদ্ধের অন্তরটা তাঁর অগোচরে ছিল না। এই মুহূর্তে তাঁকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

পুরোহিতের পেশাকে লোকে তখন যতই শ্রদ্ধার চোখে দেখুক (তার মধ্যে শ্রদ্ধার চেয়ে অনুকম্পার অংশটাই বড়), পুজারী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্য-পুজার বিনিময়ে যাকে জীবিকার্জন করতে হত, সাধারণের কাছে অবজ্ঞেয় এবং ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষভাবে নিন্দিত ছিল। মন্দিরের মালিকেরা তাকে একজন নীচস্তরের আশ্রিত এবং সামান্য বেতনভুক্ কর্মচারী বলে গণ্য করতেন ; কিংবা বলা যেতে পারে, তার চেয়েও নীচের কোঠায় ফেলতেন। কারণ বোধ হয় এই, বেতনটা এক্ষেত্রে নগদ মুদ্রায় দেওয়া হত না, সেরেস্তার কর্মীরা যা পেতেন, ঐ বাবদ কিছু জমি বরাদ্দ ছিল। সেদিক দিয়ে 'পুজরী-ঠাকুর'কে ঐ জাতীয় জমিভুকদের (এই যেমন ঢাকী, ক্ষৌরকার, পালকি-বাহক, প্রতিমা-শিল্পী ইত্যাদি) প্রায় সমপর্যায়ে ফেলা হত। ঐ সব শ্রেণীর লোকেরা যে জমি ভোগ করত, তাকে বলা হত 'চাকরাণ', আর পুজারী যে জায়গীর পেতেন, তার নাম ছিল ব্রহ্মোত্তর। নাম যাই হোক, স্বত্ব এক, এবং পদের দিক থেকেও লোকে এদের মধ্যে বিশেষ তারতম্য করত না। সাধারণতঃ নীচ-শ্রেণীর দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা এই পদ গ্রহণ করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ অন্য কোনো জীবিকা সংগ্রহ করতে না পেরে।

দুর্গাচরণের বেলায় এই ধরনের কোনো কারণই ছিল না। তাঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, এবং বংশমর্যাদা কারো চেয়ে হীন নয়। পুজারীর বৃত্তিকে সমাজ কী দৃষ্টিতে দেখে থাকে, তাও তাঁর না-জানবার কথা নয়। এ বিষয়ে তাঁর নিজের সংস্কার শ্যামাচরণের চেয়ে বরং দৃঢ়তর হবার সম্ভাবনা। ছোট ভাইয়ের শিক্ষা এবং উদার দৃষ্টি তাঁর ছিল না। তবু যে তিনি ঐ অসম্মানের মধ্যে নিজেকে টেনে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, তার কারণ যেমন প্রবল, তেমনি গভীর। তার সঙ্গে হরিশ এবং তাকে আশ্রয় করে যে-সব অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে প্রায় পাশাপাশি ঘরে বসবাসকারী দুটি পরিবার নিজেদের ভিতরকার রক্তের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে শত্রুতার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলো স্মরণ করে শ্যামাচরণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে যেন তাঁরও একটা বৃহৎ অংশ রয়ে গেছে। দুর্গাচরণের এই শোচনীয় সিদ্ধান্তের জন্যে তিনিও অনেকখানি দায়ী। যে মানুষটি আজ এত বড় একটা মর্মান্তিক প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, যাকে তিনি সহোদর অগ্রজের থেকে আলাদা করে কখনো দেখেন নি, লজ্জায় তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারছিলেন না।

তাঁকে নতমুখে চুপ করে থাকতে দেখে দুর্গাচরণ বললেন—তোর মনের কথাটা আমি বুঝতে পারছি, শ্যামা। কিন্তু কী করবি তুই? আমিই বা কী করবো? আমার কি ভয় জানিস, ঐ বৌ দুটোর মত আমরাও কোন্‌দিন কোমরে কাপড় বেঁধে তাল ঠোকাঠুকি শুরু করে দেবো—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। শ্যামাচরণের মনে হল, সে হাসি কান্নার চেয়েও মর্মস্পর্শী।

হাসিটা যেন মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল। দুর্গাচরণ গম্ভীর ভাবে বললেন—তুই আর দোমনা করিস নে। যা-হোক দু-কথা লিখে দে, আমি চলে যাই।

শ্যামাচরণ আর আপত্তি করেন নি। তাঁর চিঠিতে সঙ্গে সঙ্গে ফল হল। খাটরা বাসুদেবের মন্দিরে পুজারীর কাজে নিযুক্ত হলেন দুর্গাচরণ। যাবার আগে আরেকবার এলেন ছোট ভাইয়ের কছে, তেমনি বৌদের লুকিয়ে নতুন প্রস্তাব দিলেন আরেকটা—জমি কখানা তুই নিয়ে নে শ্যামা!

—না, বড়দা। ওটা পারবো না।

—কেন, টাকা নেই বলে?

—সে তো নেইই। থাকলেও নিতাম না।

—ভেবে দ্যাখ্। জমিগুলো ভালো, আর তোর জমির লাগোয়া। টাকা না হয় তুই আস্তে আস্তে দিতিস।

—আপনাকে আমি ভালো খদ্দের এনে দিচ্ছি। আমাকে নিতে বলবেন না।

—বুঝেছি। আচ্ছা, তাই দে। তোর যাদের ওপর বিশ্বাস আছে, সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল বাধাবে না, তেমন লোক দ্যাখ্। দাম যদি কিছু কম দেয়, তার জন্যে ভাবিস না। দশ টাকা কম-বেশিতে কী আসে যায়? টাকা দিয়ে করবোটা কী?

নিস্তারিণী যাবার সময়েও অভিশাপ দিতে দিতে গেলেন। ডাক ছেড়ে বললেন—আমাকে দিলি না, ও ছেলে তোর কপালেও টিঁকবে না, এই আমি

বলে গেলাম।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের চালে টিকটিকি ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, সত্যি, সত্যি, সত্যি।

চিৎকারটা ওবাড়ি গিয়ে পৌঁছল। মনোরমা হাহাকার করে উঠলেন—শুনলে? এই ভর-মঙ্গলবার! বাছার আমার—

বলতে বলতে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। শ্যামাচরণের বুকেও কথাটা হঠাৎ শেলের মত গিয়ে লাগল। মনোরমা মা। তার আঘাতটা সহজেই অনুমান করতে পারলেন। বারান্দায় বসে তামাক টানছিলেন। পলকের জন্যে থেমে গেলেন। তারপর আবার শুরু হল সেই একটানা শব্দ। ঘরের ভিতর থেকে স্ত্রীর ফোঁপানির আওয়াজ আসতে লাগল। কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেবেন খুঁজে পেলেন না।

নিস্তারিণী যাচ্ছিলেন ডুলিতে। তার পিছনে লাঠি হাতে দুর্গাচরণ। বেহারাদের সঙ্গে পারবেন কেন? অনেকটা পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। দূর থেকে দেখলেন, ডুলিটা একটা বটগাছতলায় নামানো হচ্ছে। চিন্তিত হলেন। বেশীদূর তো আসেন নি, এখনই বিশ্রামের দরকার পড়ল কেন? পা চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন গাছের কাছে। যে দৃশ্য দেখলেন, তার পর আর পা চলল না। ডুলিতে বসেই হরিশকে বুকে চেপে ধরে আকুল হয়ে কাঁদছেন নিস্তারিণী। বেহারা দুটো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। একবার মনে হল, ভুল দেখছেন না তো! কে বিশ্বাস করবে, এই সেই নির্মম নারী, সামান্য কিছুক্ষণ আগেও যে তারস্বরে চিৎকার করে এই ছেলেটার মৃত্যুকামনা করছিল!

'বড়মা'র সেই প্রচণ্ড আকর্ষণ, যার জোরে একদিন একটি ভীরু গ্রাম্য বালক মায়ের ইচ্ছা ও আদেশ উপেক্ষা করে লুকিয়ে এসে পথের ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল—তার কাছ থেকে চিরদিনের তরে চলে যাবার আগে একবারটি শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখবার জন্যে, এতগুলো বছর পরেও হরিশের মন থেকে হারিয়ে যায় নি। দ্রুত ঘনায়মান সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন কোনো আশ্রয়ই চোখে পড়ছিল না, তখন তাদের সেই মহাশত্রুর কথা মনে পড়েছিল। আজও তাই কাউকে কিছু না বলে সেই অজানা বাসুদেবপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

বেরিয়েছিল সকাল সকাল দুটো ভাতে-ভাত খেয়ে। জিজ্ঞাসাবাদ করে গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চারদিক জঙ্গলে ঘেরা একটা ছোট্ট খড়ো বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। তাদের পিছনে একটি প্রায়-প্রৌঢ়া বিধবা। হরিশকে তারা কেউ চিনতে পারল না। সেও অনেকটা আন্দাজে ধরে নিল বিধবাটি নিস্তারিণীর বড় মেয়ে জ্ঞানদা। বিয়ের পর মাঝে মাঝে আসত বাপের বাড়ি, একটু একটু মনে আছে। পরিচয় পেয়ে বলল—আমাদের সেই হ'রে! ইস্ কত বড় হয়ে গেছিস! আয়, ঘরে আয়।

জ্ঞানদার পিছন পিছন বারান্দায় গিয়ে উঠল। খবর পেয়ে ভিতরের উঠোনের ওধারে বোধহয় রান্নাঘর থেকে নিস্তারিণী এলেন। অনেকটা ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে। দাঁত একেবারে নেই, চোখেও খুব কম দেখেন। হরিশ গিয়ে প্রণাম করতেই কিরকম একটা খসখসে গলায় বললে,—অ্যাদ্দিন পরে কী মনে করে?

নিতান্ত নিরুত্তাপ স্বর, একটু যেন শ্লেষের টান রয়েছে তার মধ্যে। হরিশের বুকে ধক করে গিয়ে লাগল। এই সেই 'বড়মা'!

জ্ঞানদা বলল—কখন বেরিয়েছিস?

—সকালবেলা।

—দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হয় নি তো?

—বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম।

—কথাবার্তা পরে হবে। এখন যা; হাত-পা ধুয়ে আয়! কিছু একটা মুখে দে। আমি এখ্খুনি ভাত বসিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেমেয়েগুলোর একটা কাকে ডেকে বলল, মামাকে পুকুরঘাটে নিয়ে যা তো।

হরিশ বলল—জ্যাঠামশায় কোথায়?

—ঠাকুরের বৈকালী দিতে গেছেন, এখ্খুনি এসে পড়বেন।

ঘাট থেকে ফিরে দেখল দুর্গাচরণ এসে পড়েছেন। জেঠীমার তুলনায় তিনি বেশ শক্ত আছেন, মনে হল। খুব খুশী হলেন ওকে দেখে। কে কেমন আছে বার বার করে জিজ্ঞাসা করলেন।

রাত্রে খেতে বসে তার আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল হরিশ। আর কদিনের মধ্যে আড়িয়াল খাঁ তাদের বাড়ি পর্যন্ত এসে যাবে, অথচ এখনো কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় নি, সে কথাও যোগ করল ঐ সঙ্গে। দুর্গাচরণের পাশেই ছিল তার আসন; পরিবেশন করছিল জ্ঞানদা, আর নিস্তারিণী সামনে বসে মালা জপ করছিলেন।

শুনেই প্রথমে জ্ঞানদা চমকে উঠল—বলিস কি! কাকা কোনো চেষ্টা করছেন না।

—করছেন নিশ্চয়ই। সুবিধেমত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না।

দুর্গাচরণ বললেন—তোর বাবা যেরকম মানুষ তাতে সহজে কিছু পাবে বলেও মনে হয় না। কেউ কিছু দিতে চাইলে নেবে না, অথচ নিজের মুরোদ তো ঐ। বামুন-পণ্ডিতদের কি আর সেই দিন আছে যে লোকে এসে মাথায় করে নিয়ে যাবে?

—তাই তো এলাম আপনাদের কাছে। যদি কটা দিনের জন্যে কোনো রকমে একটু মাথা গুঁজে থাকা যায়। ভাঙন বন্ধ হলেই চলে যাবো।

দুর্গাচরণ কিছু বলবার আগেই নিস্তারিণী বলে উঠলেন—এখানকার হাল তো নিজের চোখেই দেখলি। ঐ শুয়োরের পাল না থাকলে না হয় বলতাম আসতে। ঐগুলোরই জায়গা হচ্ছে না।

জ্ঞানদা গিয়েছিল ভাত আনতে। ফিরবার পথে মায়ের মধুমাখা কথাগুলো কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কালো হয়ে উঠল। হরিশেরও সেটা নজর এড়াল না। ভাত দিয়ে সেই যে চলে গেল জ্ঞানদা, আর এল না। বড়দি হয়তো নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বাপের আশ্রয়ে এসে উঠেছে। ছেলেপিলেও অনেক। তার উপরে আবার তারা এসে ভিড় বাড়াতে চাইছে, একথা ভাবতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হল। আর কিছু বলল না।

পরদিন সকালেই চলে যেত। জ্যাঠামশায় যেতে দিলেন না। বললেন— দাঁড়া, বাবুদের একবার বলে দেখি। কত ফালতু ঘর পড়ে আছে, একখানা যদি ছেড়ে দেয়, অনায়াসে এসে থাকতে পারবি তোরা। পাঁচটা তো প্রাণী!

'কত্তাবাবু' অর্থাৎ বোস-গোষ্ঠীর যিনি প্রধান, তিনি গিয়েছিলেন সদরে। দু-তিনটা মামলা ছিল। ফিরতে চার-পাঁচ দিন লেগে গেল। ততদিন ভাইপোকে আটকে রাখলেন দুর্গাচরণ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পুজোবাড়ির কোনো একটা 'নাকারি ঘরে' কিংবা অন্য কোথাও একঘর বিপন্ন ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে তিনি কখনো অসম্মত হবেন না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে কোনো জায়গা দিতে তাঁকে রাজী করানো গেল না। আশেপাশে তাঁদের অনেক ভিটেঘাটা পড়ে আছে। ইচ্ছা করলে ওর কোনোটাতে এসে উঠতে পারেন—এইটুকু মাত্র বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া গেল জমিদারবাবুর কাছ থেকে। দু-তিনটা ভিটে দেখাতে নিয়ে গেলেন দুর্গাচরণ। হরিশ কাছাকাছি গিয়েই ফিরে এল। এত জঙ্গল তার জীবনে কখনো দেখেনি। এত রকমের গাছ আর ঝোপঝাড় আছে পৃথিবীতে, তাও তার জানা ছিল না। এখানে এসে বাস করা দূরে থাক, গ্রামের পথে হাঁটতেই তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আর একটা কারণে তার মন ভেঙে গিয়েছিল। 'বড়মা'র এই আশ্চর্য রূপান্তর সে একেবারেই আশা করে নি। তিনি যেন কোথায় চলে গেছেন! যাকে একদিন না দেখতে পেলে পাগল হয়ে যেতেন, তাকে যেন চিনতেই পারছেন না। স্নেহ-মমতা সব শুকিয়ে গেছে। সামান্য একটু আদর-যত্ন, নিতান্ত নিষ্পরও যার থেকে বঞ্চিত হয় না, তাও বুঝি তার জন্য অবশিষ্ট নেই।

তা-ই হয়। হরিশ ছেলেমানুষ, জীবনের কতটুকুই বা দেখেছে। তাই সে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। আসলে এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

প্রায় সপ্তাহখানেক খাটরায় কাটিয়ে হরিশ এসে পৌঁছল তাদের গ্রামে। কিন্তু এ কোথায় এল সে? তেঁতুলডাঙ্গার হাট পার হলেই তাদের ঠাকুরঘরের পিছনে লম্বা আমগাছটা দেখা যায়। কই সে গাছ? পথ ভুল করে নি তো? না, চারদিকে সবই তো ঠিক আছে।

হরিশ ছুটতে আরম্ভ করল। ফাঁকা মাঠ; কোথাও কোন লোকজনের দেখা পেল না। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল, অত বড় বড় চারখানা ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। মায়ের ঘরের পিছনে যে বাঁশঝাড়, সন্ধ্যাবেলা যেখানে শালিকের পাল এসে তুমুল কিচিরমিচির বাধিয়ে দিত, সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তার ঠিক

নীচেই গর্জন করছে আড়িয়াল খাঁ!

তখনো কিছু বেলা ছিল। কিন্তু হরিশের চোখের সামনে ঘোর অন্ধকার নেমে এল। ছুটতে ছুটতে প্রায় ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেইখানেই বসে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকবার মত জোরটুকুও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আড়িয়াল খাঁ যে বসে নেই, ঠিক তার পায়ের নীচেই ঘূর্ণির পাক ঘুরিয়ে চলেছে, যে-কোনো মুহূর্তে বৃহৎ একচাপ মাটির সঙ্গে তাকেও অদৃশ্য জঠরে টেনে নিতে পারে, সে হুঁশও সে হারিয়ে ফেলেছিল।

আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ সেখানে কাটিয়েছিল, কী ভাবছিল, হরিশের কিছুই খেয়াল নেই। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল, চারিদিকের দৃশ্য এবং দশা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওপারের ধার বরাবর কে যেন একরাশ গলানো সোনা ঢেলে দিয়েছে। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই।

এভাবে বসে থাকলে তো চলবে না। নিজেকে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুলল হরিশ। নদীর দিকে পিছন ফিরে এপাশে ওপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সামনে মাঠ, ডাইনে বাঁয়ে ছেড়ে চলে যাওয়া বসতির ভগ্নাবশেষ। কোথাও খড়ের চালগুলো খুলে নিয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে দু-সার ন্যাড়া বাঁশের খুঁটি। কোথাও বা তা-ও নেই, শুধু ভাঙাচোরা মাটির ঢিবিগুলো নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে, কদিন আগেও তাদের নাম ছিল গৃহ, জীবন্ত মানুষের আশ্রয়, আজ তাদের সঙ্গে শ্মশানের কোনো তফাৎ নেই।

তবু তো মাটিটুকু পড়ে আছে, তার উপরে এখানে ওখানে ছড়ানো দু-একটি স্মারকচিহ্ন—ঐ উঠোনের কোণে গোবর-নিকানো মাটির বেদির উপর একটি সজীব তুলসীগাছ, ওপাশে একটা লাউ-এর মাচা, তার তলায় কয়েকটা হাঁড়িকুঁড়ি। আর,—এবার দৃষ্টি পড়ল নুইয়ে-পড়া বাঁশঝাড়ের সামনে শূন্য নদীগর্ভের দিকে—আর তাদের আজ কিছু নেই। কী ছিল, তার এক কণা স্মৃতিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঐ শূন্যস্থানে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, এই কদিন আগে যাদের সে রেখে গেছে, তারাও কি ঐ মাটির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আড়িয়াল খাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। গভীর রাত্রির অতর্কিত অন্ধকারে গাছপালা ঘরবাড়ি, তাদের কোলে আশ্রিত কটি ঘুমন্ত প্রাণী বিসর্জিত প্রতিমার মত তার গভীর অতলে হারিয়ে যেতে পারে। কেউ জানতেও পারবে না। আশেপাশে গ্রামের লোকেরা পরদিন এই পথ দিয়ে যাবার সময় একবার তাকিয়ে দেখবে, ক্ষণকালের জন্যে হয়তো একটু দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, কিন্তু বিস্মিত হবে না।

সবই সম্ভব। তবু এত বড় একটা সর্বনাশ হরিশ কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তার মন বারংবার বলতে লাগল, এ হতে পারে না। শেষ মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোনো আশ্রয় পাওয়া গেছে। মাথা গুঁজবার মত কারো বাড়ির একখানা চালাঘর, তাও যদি না হয়, পথের ধারে কোনো গাছের ছায়া। কে জানে সে কোন্‌খানে, কত দূরে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? চারদিকে শ্মশানের স্তব্ধতা। জীবজগতের কোনো সাড়া নেই, মানুষের একটা ছায়া পর্যন্ত কোথাও চোখে

পড়ছে না।

কাছাকাছি গ্রামগুলোয় তাদের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। জানাশুনো যারা আছে, তাদের দু-একজনের কথা মনে পড়ল এবং তাদেরই কারো উদ্দেশ্যে একদিকে চলতে শুরু করল।

কয়েক পা যেতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, ওদিকের গাছপালার আড়াল থেকে কে যেন লাঠি ভর করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বেশ খানিকটা দূরে। হরিশ চিনতে পারল না। তবু মনটা খুশী হয়ে উঠল। এতক্ষণে একজন মানুষের মুখ দেখা গেল। লোকটির চলার ধরন দেখে মনে হল, সে সুস্থ নয়, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে হরিশ ছুটে গিয়ে তার সামনে পড়তেই সে মুখ তুলে কলরব করে উঠল—দাদাঠাকুর! তুমি এসে পড়েছ! আমি রোজ দু বেলা তোমার জন্যে এখানে ধর্না দিচ্ছি।

হরিশের কানে এসব কিছুই গেল না। মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটিমাত্র ব্যাকুল প্রশ্ন—এরা কোথায়, লক্ষ্মণ ?

—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না ? মৃদু হেসে বলল লক্ষ্মণ মাঝি—পাবার কথাই। ভয় নেই ; মা-গঙ্গার কিরপায় সবাই ভালো আছেন।

বলতে বলতে লাঠিটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পথের উপরেই বসে পড়ল। হরিশ তখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। উদ্বেগের সুরে বলল—কোথায় গ্যাছেন ওঁরা ?

—কোথায় আবার যাবেন ! আমরা নিয়ে গেছি। আমাদের কাছে আছেন।

—তোমাদের গ্রামে ?

—হ্যাঁ।

ঘোষখালী জেলেপাড়ায় চারজন লোককে আশ্রয় দেবার মত জায়গা হরিশের মনে পড়ল না। বলল, কোন্ বাড়ি ?

—বাড়ি নয়। আমরা হলাম ছোট জাত, মেছো; তোমরা বেরাম্মণ। তোমাদের কি কারো বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারি ? অর্জুন মাঝির ঘরের পেছনে একটা ভিটে আছে না ?

—নিশাঠাকুরের ভিটা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তুমি তো সব চেনো। সেইখানে আমাদের বাবাঠাকুরকে নিয়ে বসালাম। আমাদের কাছে দেবতাও যা, বামুনও তাই !—বলে এমন ভাবে মাথা নাড়ল লক্ষ্মণ রাজবংশী, যেন মস্তবড় একটা দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত করে ফেলেছে।

হরিশ তাত্ত্বিক মর্ম না বুঝলেও মনে মনে আশ্বস্ত হল। যা হোক একটা আশ্রয় তো জুটেছে। তারপরেই আবার চিন্তা হল—সেখানে কেমন করে আছে চার-চারটে মানুষ ? জেলেপাড়ার এক কোণে ছোট্ট একটা পোড়ো ভিটে, প্রায় সবখানিই ভীষণ কাঁটাওয়ালা ঘন বেতঝোপে ঢাকা। একাধারে একটি শ্যাওড়া গাছ, গুঁড়ির চারদিকে হাত-দুয়েক জায়গা মাটি বাঁধানো। তিনিই নিশাঠাকুর। বছরে একবার পুজো দেয় জেলেরা, অসুখবিসুখে মানত করে, বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করায় সেই বেদির তলায়, একটু মাটি তুলে নিয়ে

কপালে দেয়।

ভিটের চারদিকটাই ঢাল্‌। সেখানে আশশ্যাওড়া আর শিয়ালকাঁটার জঙ্গল। হরিশ যখন ছোট ছিল, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে পাকা বেতুল (বেতফল) পাড়তে যেত, বোলতারচাক ভাঙতেও যেত মাঝে মাঝে। ছোট বঁড়শিতে ট্যাংরা, পুঁটি, কই মাছ ধরতে বোলতার বাচ্চার মত টোপ আর নেই, আর ওদের চাক বাঁধবার প্রিয় স্থান হল বেতঝোপ।

গোটা ভিটেটা চোখের উপর ভেসে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—সেখানে জায়গা হল? সবটাই তো প্রায় বেতবন।

—বেত-ফেত সব একদিনে উড়ে গেছে। মা-ষষ্ঠীর কিরপায় মাঝিপাড়ায় মানুষ তো আমরা কম নই গো! সবাই মিলে হাত দিলে কতক্ষণ? দেখবে চল না! জঙ্গল-টঙ্গল সাফ করে দু-তিনদিনের মধ্যে দুখানা নতুন ঘরও তোলা হয়ে গেছে।

হরিশের বুকের ভিতরটা আবার মুচড়ে উঠল। তাদের কতকালের ঘরগুলো! ঠাকুরঘর আর রান্নাঘরটা তার বাবা করেছেন, বাকী কখানা ঠাকুরদার আমলের। মায়ের কাছে শুনেছে, তিনি নিজে হাতে চাল বাঁধতেন, ঘরামীর পাশে বসে তাকে শিখিয়ে দিতেন, কী করে নানারকম নক্‌সা তুলে ছাটনে বেত জড়াতে হয়। উত্তরের পোতার চালে ঠাকুরদার হাতের সেই নক্‌শি-কাটা বেতের কাজ তিন-পুরুষেও এতটুকু টসকায় নি।

বাঁশঝাড়টা যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার ঠিক সামনেই ছিল সেই ঘরখানা। মা থাকত তাদের নিয়ে। সেইদিকেই আরেকবার চেয়ে দেখল হরিশ, তারপর লক্ষ্মণের দিকে ফিরে বলল, আমাদের একটা ঘরও কি বাঁচানো যায় নি?

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লক্ষ্মণও ক্ষণকাল দিনশেষের ক্ষীণ আলোয় ঢাকা শূন্য নদীর পানে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে বলল, ঘরগুলো কোনোরকমে খাড়া ছিল, এই পর্যন্ত, চালে কিছুই ছিল না, দাদাঠাকুর। দু-একটা ধরে নামাতেই ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপরে আবার এতখানি পথ মাথায় করে বয়ে নেওয়া? সে-ধকল সইত না। তার চেয়ে ঐ রাক্ষুসীটাকে দিয়ে গেলাম। ওর তো পেট কিছুতেই ভরে না। খাক। দ্যাখ না কি রকম চেটেপুটে গিলে নিয়েছে। একগাছা কুটোও পড়ে নেই।

পথে যেতে যেতে এ কদিনের সব খবর জানতে পারল হরিশ। লক্ষ্মণের মুখ থেকে যা শুনল, তার থেকে বাকীটুকু সে নিজেই অনুমান করে নিল। ও যেদিন এসেছিল, তার আগেই সে বাসুদেবপুরে রওনা হয়ে গেছে। দেখা হয় নি। লক্ষ্মণ তখনো হেঁটে চলে বেড়াতে পারে না। সবে জ্বর ছেড়েছে। পাড়ার দুটো ছেলেকে ধরে তাদের কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে এসে দেখা করেছিল 'বাবাঠাকুরে'র সঙ্গে। তার অনেক আগে থেকেই আসবার ইচ্ছা, কিন্তু একবার ওঠে তো আবার পড়ে। তিন মাস ধরে এই অবস্থা।

'বাবাঠাকুরে'র সঙ্গে কথা বলে যা বুঝল, তখনও তিনি দেখতে চাইছিলেন,

যদি না উঠে পারা যায়। একটা জায়গা মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন, কিন্তু আসলে এখান থেকে নড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, যদিও সেটা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি, লক্ষ্মণ তাঁর কথার ভাব থেকে বুঝে নিয়েছিল। ওটা ঐ আড়িয়াল খাঁর মায়া। তা না হলে আর তাকে রাক্ষুসী বলে কেন? এদিকে নদী যে রকম কাছে এসে পড়েছে, আর দেরি করা চলে না। শ্যামাচরণ অবশ্য বলেছিলেন, কদিন থেকে ভাঙনের বেগ কিছুটা মন্দা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার উপরে নির্ভর করা চলে না। যে কোন মুহূর্তে সে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। সেইটাই তার রীতি—কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর। নদীরও ক্লান্তি আছে, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। সেটা সাময়িক। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ক্ষীয়মান শক্তির পুনরুদ্ধার।

শ্যামাচরণ কি তা জানেন না? জেনেও বোধ হয় তার উপরে বিশ্বাস হারান নি। লক্ষ্মণকে শুধু বলেছিলেন—হরিশ নেই, দুটো দিন দেখি। সে আসুক। জামাইকেও আসতে লিখেছি। সেও দু-চার দিনের মধ্যে এসে পড়বে।

তিনি যে হরিশের উপর নির্ভর করে বসেছিলেন, তা নয়। তবু তার জন্যে মনে মনে উদ্বেগ ছিল বৈকি। তার চেয়েও বড় উদ্বেগ বোধ করছিলেন উমার জন্যে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছায়া দিন দিন গভীর হয়ে উঠেছিল। অন্য সকলের যে ভয় তার চেয়ে সেটা আলাদা। আসন্ন মাতৃত্ব একটা ইতর প্রাণীকেও অনিশ্চয়ের আশঙ্কায় চিন্তাকুল করে তোলে। পাখী খড়কুটো কুড়িয়ে এনে নীড় বাঁধে, বনের পশু ঘর বাঁধতে জানে না, কিন্তু একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ফেরে। সেই ব্যাকুলতার স্পষ্ট চিহ্ন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মেয়ের মুখে। বাবার উপর যতই আস্থা থাক্, ওর নারীপ্রকৃতি ওকে অজ্ঞাতসারে শঙ্কিত করে তুলছে। একটি নিশ্চিত আশ্রয় চাই।

সেটা লক্ষ্য করেই তিনি জামাতাকে অবিলম্বে আসবার জন্যে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। নিজের উপর সব ভার রাখতে সাহস করেন নি। এ সময়ে তার পক্ষে আসা সহজ নয়। জমিদারের কাছারিতে কাজ করে অমূল্য। নিজেদেরও কিছু জমিজমা আছে। এখন চাষবাসের মরসুম, সে-সব দেখাশুনোর জন্যে থাকা দরকার। কাছারির নায়েবও হয়তো ছাড়তে চাইবে না। তাছাড়া পথঘাট দুর্গম। বর্ষার জল মাঠ থেকে নেমে গেলেও, খাল বিল নাবাল জমি থেকে সরে যায় নি। হালটগুলো* দাম, কচুরি এবং নানারকম জংলো জঙ্গলে ঢাকা, তার নীচে কাদা। পথ পড়ে নি। খাল পারাপারের বাঁশের সাঁকোগুলো তৈরি হতে এখনো কিছুটা দেরি। শরতের শেষ এবং হেমন্তের প্রথম—প্রায় একটা মাস ঐ অঞ্চলে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। আসতে খুবই কষ্ট হবে অমূল্যর। তবু শ্যামাচরণ না লিখে পারেন নি।

একদিকে ছেলে এবং জামাতার জন্যে অপেক্ষা করছেন, আরেকদিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন ভাঙনের গতি। মনে মনে একটু ক্ষীণ আশার রেখা

* হালট—মেঠো রাস্তা

দেখা· দিয়েছে, যদিও নদী এবং তাঁর বাইরের আঙিনার মাঝখানে ব্যবধান মাত্র একখানা জমি—তাঁরই জমি,—এক বিঘার চেয়েও কিছু বেশী, তিন-ফসলা সোনার ক্ষেত। তার ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে আড়িয়াল খাঁ। দু-দিনে আর এগোয় নি। দম নিচ্ছে, না ফিরে যাবার অভিপ্রায়? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবুও তারই মধ্যে একটু যেন ভরসার লক্ষণ দেখতে পেলেন শ্যামাচরণ এবং সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে স্ত্রী-কন্যার কাছে ব্যক্ত করলেন। তাদের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনোরমা দু-হাত তুলে প্রণাম জানালেন মা-গঙ্গার উদ্দেশ্যে, মনে মনে মানত করলেন, তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব মা। অনেক তো নিয়েছ, আর নিও না, এই ক্ষেতখানা আর তার কোলে এই আশ্রয়টুকু রেখে দিয়ে যেও।

এই প্রার্থনা যখন জানাচ্ছিলেন মনোরমা, এবং তাঁর অদূরে বসে শ্যামাচরণ ঘোর বিপদের অবসান-প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল পরে একটু প্রসন্নমনে তামাক টানছিলেন, ঠিক তখনই পশ্চিমাকাশের কোণে গাছপালার মাথার উপর গাঢ় কালো অকাল মেঘ দ্রুতসঞ্চারে জমাট বেঁধে উঠেছিল। তাঁরা জানতে পারেন নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই চমকে উঠলেন তার ডাক শুনে। এ তো শূন্যগর্ভ শারদ মেঘের নিষ্ফল হাঁকডাক নয়, গম্ভীর মৃদু গর্জন, কিন্তু তার ভিতর থেকে ফেটে পড়ছে চাপা রোষ। এ শব্দ তাঁদের চেনা। শ্যামাচরণ ছুটে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালেন, মনোরমাও এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে, তাঁর পিছনে উমা। এই মেঘকে সেও চেনে। একবার তাকিয়েই দৃষ্টি ফেরাল মায়ের মুখের পানে। দু-চোখ ভরা ত্রাস। মনোরমা তার বাহু ধরে বললেন—চল, ঘরে চল।

রান্নাঘরে ভাত বসিয়ে এসেছিল উমা। মনোরমা তাড়াতাড়ি গিয়ে জ্বলন্ত উনুনে জল ঢেলে দিলেন। দরজার ঝাঁপ টেনে দিয়ে ছুটে গেলেন বড়ঘরে। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে দক্ষিণের ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ঝড় এসে পড়ল।

এ ঝড় যে কী ঝড় জানে শুধু তারাই, এই পদ্মা মেঘনা আড়িয়াল খাঁর দুই তীরে যাদের বাস, এর উন্মত্ত তাণ্ডব যারা দু-চোখ ভরে দেখেছে, দু-কান ভরে শুনেছে এর প্রলয় হুঙ্কার। সে সুযোগ যাদের ঘটে নি, এর এই মহিমময় করাল মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণ-প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গণনা করতে হয় নি, কল্পনা তাদের যত বড়ই হোক, সেই বিভীষিকা তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে।

চৈত্র-বৈশাখের তাপদগ্ধ দিনশেষে প্রায় প্রতিদিন কালবৈশাখী-বেশে যখন সে আসে, তার রূপ এমন প্রচণ্ড নয়। হলেও তার সঙ্গে গৃহস্থের একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে, ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে, গোরু-বাছুর মানুষ-জন ঘায়েল করে, কখনো দু-চারটি প্রাণ কেড়ে নিয়ে যে ধ্বংসলীলা সে দিনের পর দিন চালিয়ে যায়, ওখানকার মানুষ সেগুলো সয়ে নিতে শেখে। কিন্তু এমনি অকালে যখন তার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে, সে মূর্তি আরো ভয়াবহ। তার জন্যে কারো মনে কোনো প্রস্তুতি নেই। শ্যামাচরণও এই অভাবিত সঙ্কটের জন্যে তৈরী ছিলেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তা জুড়ে ছিল নদী এবং তার সংহারমূর্তি। ঝড়ের কথা তিনি ভাবেন নি।

এক-একটা বিপুল ঝাপটায় সমস্ত ঘরখানা যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ছাটগুলো তীরের ফলার মত মেঝেতে এসে পড়ছিল। মনোরমা ছেলেমেয়ের গায়ে মোটা কাঁথা জড়িয়ে দিয়ে উঁচু তক্তপোশের নীচে তাদের শুইয়ে দিয়েছিলেন। ঘরের চাল যে-কোনো মুহূর্তে যেমন উড়ে যেতে পারে, তেমনি ভেঙেও পড়তে পারে। তাঁকেও ছেলেমেয়ের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলেছিলেন শ্যামাচরণ। তিনি যান নি, দোরগোড়ায় চৌকাঠ ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলেন। তার এক ধাপ নীচেই বারান্দায় জলচৌকির উপর বসেছিলেন শ্যামারচণ। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামনে। ঘোর অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও স্পষ্ট অনুভব করছিলেন, দু'দিনের তরে ঝিমিয়ে পড়া আড়িয়াল খাঁ আবার তার রুদ্ররূপ ফিরে পেয়েছে। এই অকাল ঝঞ্ঝার তাড়না, এই অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার প্রেরণা, তার বিনাশশক্তিকে বিপুল বেগে উজ্জীবিত করে তুলেছে। সে ছুটে আসছে আরো দুর্বার বেগে, এই আশ্রয়টুকু গ্রাস করবার দুর্দম লালসায়। কে জানে বাকী রাতটুকুও অপেক্ষা করবে কিনা!

শেষরাত্রে ঝড় পড়ে গেল। তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার কাটে নি। তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন শ্যামাচরণ। যে-পথ ধরে সারাজীবন প্রতিদিন উষাস্নান করতে গেছেন, এবং সিক্তবস্ত্রে গঙ্গাস্তব পাঠ করতে করতে ফিরে এসেছেন—তারই উপর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। বিশ-পঁচিশ হাত গিয়েই থেমে পড়তে হল। আর যাওয়া নিরাপদ নয়। যে ক্ষেত তাঁর সংসারের ছ মাসের অন্ন যোগায়, 'গাঙ' তার অর্ধেক গ্রাস করে ফেলেছে। তার ঠিক সামনেই একটা বিশাল চাপ ভেঙে পড়ল। বৃষ্টিস্নাত স্বর্ণাভ মাটি। শুধু স্বর্ণাভ নয়, স্বর্ণপ্রসু। কী মধুর গন্ধ! শ্যামাচরণের সারা বুকখানা টন টন করে উঠল। মাটি নয়, বুকের পাশ থেকে তাঁর কতগুলো পাঁজর যেন একটানে ভেঙে উপড়ে নিয়ে গেল আড়িয়াল খাঁ।

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ মেঘমুক্ত, বাতাস স্নিগ্ধ-মধুর। ওপরে গাছপালার মাথার উপর ধীরে ধীরে উষার আভাস ফুটে উঠছে। চারদিকে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি। কে বলবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই শান্ত প্রকৃতি হঠাৎ ক্ষেপে উঠে নিষ্ঠুর তাণ্ডব-নৃত্যে সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করে দিয়ে গেছে! কে বিশ্বাস করবে এই স্নিগ্ধা সুস্মিতা ধরণীর পায়ের তলায় এখনো ক্রুদ্ধ লুব্ধ ক্রুর নদীর অবিশ্রান্ত ধ্বংসলীলা!

শ্যামাচরণ বাড়ি ফিরে এলেন। বাইরে থেকেই প্রতি প্রত্যূষের সেই পরিচিত শব্দটি কানে এল। গোবরছড়া দিচ্ছেন মনোরমা। গৃহস্থবধূর চিরাচরিত আচারনিষ্ঠা। কোনো অবস্থাতেই তাকে পরিত্যাগ করা চলে না।

স্বামীর ফিরে আসার শব্দ পেয়ে হাঁড়িটা রেখেই দ্রুতপায়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। শ্যামাচরণ বললেন, জিনিসপত্তর, যা না নিলে নয়, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও।

মনোরমার দৃষ্টি আপনা হতেই চলে গেল নদীর দিকে। আর কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হল না। কোথায় যেতে হবে, তাও জানতে চাইলেন না। সে

ভাবনাও তাঁর নয়, স্বামীর। ভিতরের উঠোনে গিয়ে দেখলেন, উমা উঠেছে। তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ফিরে গেলেন স্বামীর কাছে। বললেন— কোথায় যাবে ঠিক করেছ? বেশী দূর হবে কি?

—তা একটু হবে। তেঁতুলডাঙ্গায় দত্তদের ওখানে গিয়ে ওঠা যাক আপাতত।

—উমির যা অবস্থা, অতদূর হাঁটতে পারবে কি?

শ্যামাচরণের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। বললেন—ক মাস হল?

—ন মাস চলছে। তাছাড়া বড় নরম হয়ে পড়েছে।

—তাহলে ওখানে যাওয়া চলে না।

—হ'রেও যদি এসে পড়ত? ফেলে ছড়িয়ে জিনিসপত্তর নেহাৎ কম হবে না। কে নিয়ে যাবে?

—নেবার লোক মোষখালি গেলেই পাওয়া যাবে। এখনি যাচ্ছি।

—সন্ধ্যা-পূজো সেরে একটু জল মুখে দিয়ে যাও। ফিরতে অনেক বেলা হবে। আমি কাপড়টা ছেড়েই সব যোগাড় করে দিচ্ছি।

নারায়ণ-পূজা শেষ হবার আগেই লক্ষ্মণ তার দলবল নিয়ে এসে পড়ল, এবং মনোরমার কাছে এদিকে খবর মোটামুটি জেনে নিয়ে তেঁতুলডাঙ্গার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল। বলল,—আমরা যতক্ষণ আছি, আর কোথাও যেতে হবে না। যেতে দিলে তো!

সেদিনটা গেল ভাঙা-চোরা বাঁধা-ছাঁদায়। পরদিন সকালেই তিনপুরুষের ভিটা, তার সঙ্গে জড়ানো কত সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের স্মৃতি, এখানে ওখানে ছড়ানো পিতৃ-পিতামহের কত পবিত্র হস্তচিহ্ন সব ফেলে রেখে পরাশ্রয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন শ্যামাচরণ শিরোমণি। মাটির বন্ধন বড় কঠিন। ছিঁড়তে গেলে কত জায়গায় টান পড়ে। বেদনায় বুকের ভিতরটা অসাড় হয়ে আসে। তবু বাইরে অণুমাত্র দৌর্বল্য প্রকাশ পেল না। অবিচল দৃঢ় পদক্ষেপে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। ডান হাতে তাম্রাধারে নারায়ণশিলা, বহুপুরুষের নিত্যপূজিত গৃহদেবতা। গৃহ নেই, কিন্তু দেবতা রইলেন। তাঁকে ত্যাগ করা যায় না।

স্বামীর ঠিক পিছনেই চললেন মনোরমা। তিনিও কঠোর হাতে বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোখের জল রোধ করতে পারেন নি। এক হাতে চোখ মুছতে মুছতে, আরেক হাতে অশক্ত দুর্বল আসন্নপ্রসবা কন্যাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে স্বামীর অনুসরণ করলেন।

॥ ৬ ॥

অনেক দিন পরে, শ্যামাচরণ তখন নেই, তাঁর শেষ সন্তান নীতীশ, আট-ন বছরের ছেলে, বর্ষাদিনের দুপুরবেলা অন্ধকার-অন্ধকার ঘরের মেঝের মাদুর বিছিয়ে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে আড়িয়াল খাঁর তীরে যে জীবন তারা ফেলে

এসেছেন তার গল্প শুনত। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত। টানা-টানা দুটি স্বপ্নময় চোখ মেলে দেখতে পেত সেই ফসল-ভরা মাঠ, তার ওপারে বিশাল নদী যার কূল দেখা যায় না, এপারে মাঠের শেষে বেশ খানিকটা উঁচুতে তাদের বাড়ি, গোবর-নিকানো আঙিনার কোলে ঠাকুরঘর, পিছনে আমগাছ, এপাশে বাবার ঘর, তারপর ভিতরের উঠোন, মায়ের ঘর আর সেই শালিক-ভরা বাঁশঝাড়।

আরো দেখতে পেত সেই নদী একদিন ক্ষেপে উঠল, মাঠ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে এল, ঘরদোর গাছপালা সব তার বুকে মিলিয়ে গেল, তাদের আর কিছুই রইল না।

নিশাঠাকুরের ভিটেয় আবার কেমন করে নতুন সংসার পাতলেন মনোরমা সে কথাও ছেলেকে বলতেন! মাঝিপাড়ার লোকেরা রাতারাতি তিনখানা ছোট ছোট চালাঘর তুলে দিয়ে গেল, তার কোণের দিকে একটা ছাপরা, উমার আঁতুড়-ঘর। লতাপাতার বেড়া, উপরে ছাউনি নেই, তার বদলে ওদের একটা নৌকোর পাল কোনো রকমে ঝুলিয়ে দিল। নীচে কাঁচা মাটি।

তার মধ্যেই উনি এলেন। দু'দিন যে একটু গুছিয়ে বসবো সে তর সইল না—উমার মেয়ে হিমি (দাদামশায় নাম দিয়েছিলেন হৈমন্তী, সকলে সেটাকে সংক্ষেপ করে নিয়েছিল) ঘরে এসেছিল কি কাজে কিংবা কাজের অছিলায়, আসলে দিদিমার মুখে গল্প শোনার লোভে, তার দিকে দেখিয়ে দিলেন মনোরমা। ছিপছিপে গড়নের তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী। মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর ঝুপ করে বসে পড়ল মাদুরের এক কোণে।

মনোরমা বললেন—এখন তো হাসবেই! সেদিন একবাড়ি লোককে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলে। কেউ ভাবে নি তোর মা আবার বেঁচে উঠবে!

—এমনিতে বুঝি বাঁচত? আমি মন্তর দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। মাথা নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলল হিমি।

গল্পের মাঝখানে ছেদ পড়াটা নীতীশের পছন্দ হল না। রাগটা গিয়ে পড়ল ভাগনীর উপর। বলল—বেশ করেছিলে; এবার সরে পড় দিকিন।

—কেন, সরে পড়বো কেন শুনি? তুমি যাও, পড়াশুনো করো গে। ডেঁপো ছেলের মত গল্প শুনতে হবে না। বলে, আরো কাছে সরে এসে দিদিমার কাঁধে মাথা রাখল।

—শুনলে মা? সব সময়ে খালি অমনি 'ডেঁপো ছেলে—ডেঁপো ছেলে' করে। আমি ওর সম্পর্কে বড় না? প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে নালিশ জানাল নীতীশ।

মনোরমা হাসি চেপে জোর গলায় ছেলেকে সমর্থন জানালেন,—নিশ্চয়ই। না, এ তোমার ভারী অন্যায় হিমি! ও তোমার মামা।

—ঈস্, ভা-রী তো পুঁচকে মামা! বলে দিদিমার অলক্ষ্যে জিভটা বের করে দেখাল।

মনোরমা তাকে ঠেলে দিয়ে বললেন,—নে, ওঠ্। চল্ আমিও উঠি। কত

কাজ পড়ে আছে। পোড়া বিষ্টিরও আজ ধরবার নাম নেই। ওরে, তোর মামী উঠেছে ?

—এখনি উঠবে কী! দিব্যি কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে দেখে এলাম।

—ডেকে দে। আর কত ঘুমোবে ? নীতু, তুমি এবার গিয়ে একটু পড়তে বস।

নীতু আড়চোখে ভাগনীর মুখখানা একবার দেখে নিল। চাপা হাসিতে ঠোঁট দুটো যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অর্থাৎ, কেমন জব্দ! আর কোনো কথা না বলে বিরস মুখে উঠে পড়ল। মনের কোণে সেই পুরনো দুঃখটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—ভগবান যদি তাকে ছেলে না করে মেয়ে করে পাঠাতেন, কত ভালো হত! উঠতে বসতে সবাই 'পড়' 'পড়' বলে তাড়না করত না।

ভগবানের কাছে নীতীশের আরো একটা নালিশ ছিল। সে শুনেছিল, তিনিই সব নবজাত শিশুদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন, কে কখন কোথায় কার ঘরে জন্ম নেবে, সব ঠিক করে দেন। তাই যদি হয়, তাকে আর কয়েকটা বছর আগে মায়ের কোলে পাঠালে কী ক্ষতি হত ? আড়িয়াল খাঁর পারে ফেলে আসা সেই বিচিত্র দেশ, সেই মাঠ ঘাট গাছপালা বাঁশঝাড়, বেতের ঝোপে ঘেরা নিশাঠাকুরের ভিটে, তার পাশে জেলেদের ছোট ছোট চালাঘর, নদীর চরে উপুড় করে রাখা সারি সারি ডিঙ্গি নৌকো, গাবের রসে ভিজিয়ে 'আড়ে'র* উপর টাঙ্গিয়ে দেওয়া বড় বড় জাল—সব দু-চোখ ভরে দেখে নিতে পারত।

মায়ের কাছে শুনে শুনে সেখানকার প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের জন্য তার প্রাণ কাঁদত। মনোরমা ছেলের চোখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারতেন। মনে মনে বলতেন, একেবারে তাঁর স্বভাব পেয়েছে। তিনিও যেমন কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না। একরকম জোর করে ধরে বেঁধে রাজী করাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মত দিয়েছিলেন, কিন্তু মন থেকে দেন নি। যেসব ওজর-আপত্তি তুলেছিলেন, তার মধ্যে যুক্তি ছিল। কিন্তু যেটা তাঁর একান্ত অন্তরের কথা, অথচ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, সেটা কারো কাছে ব্যক্ত করেন নি। মনোরমাকে একটু আভাস দিয়েছিলেন।

সে দিনটা মনোরমা কোনো দিন ভুলবেন না।

ঘোষখালির বাস তুলে দিয়ে অনেক দূরে এই নতুন আশ্রয়ে উঠে আসবার বন্দোবস্ত তখন পাকাপাকি হয়ে গেছে। গোছগাছ চলছে। হরিশ আর অমূল্য তাই নিয়ে ব্যস্ত। শ্যামাচরণ যেন কোনো কিছুর মধ্যে নেই। ভিটের এক কোণে একটা জামগাছ ছিল। তার তলায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন। কোনো কোনো দিন সকাল সকাল ঠাকুরপুজো সেরে সাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া ছাতাটা মাথায় দিয়ে কোথায় চলে যান ? মনোরমা সব সময়ে আগের মত খোঁজখবর রাখতে বা দেখাশুনো করতে পারেন না। উমা তখনো পুরোপুরি সেরে ওঠে নি। বাচ্চা মেয়েটার সব ভার তাঁর উপর।

একদিন এমনি বেরিয়েছিলেন, ফিরতে দেরি হচ্ছিল। ছেলে এবং জামাই

* দুদিকে দুটো খুঁটির উপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা বাঁশ।

খেয়ে নিয়ে কী কাজে বেরিয়েছে। নাতনীকে কোলে নিয়ে অধীর উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করছিলেন মনোরমা। এমন সময় খানিকটা দূরে মাঠের কোলে সাদা কাপড়ের ছাতাটা দেখা গেল। হিমিকে মেয়ের কোলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন মাঠের ধারে। স্ত্রীকে দেখে শ্যামাচরণের মুখে একটি অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল। আর একটু কাছে এসে বললেন—বড্ড দেরি করে ফেলেছি, না ?

—কোথায় গিয়েছিলে এত বেলায় ? উদ্বেগের সঙ্গে বোধ হয় একটু বিরক্তির সুরও চেপে রাখতে পারেন নি মনোরমা। শ্যামাচরণ সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সামনে খোলা মাঠ, তার পরেই দীর্ঘপ্রসারিত চর—ভাঙনের পর নদী যেটা ফেলে যায়, চর পেরিয়ে দূরে রৌদ্রালোকে চিকচিক করছে জল। গ্রীষ্মের শীর্ণ ক্লান্ত আড়িয়াল খাঁ অনেকখানি সরে গেছে। ওপারে উঁচু তীরভূমি ছাড়িয়ে ধু-ধু করছে গ্রাম। মাঝখানে উদার উন্মুক্ত বিস্তৃতি। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে নদী নেই। চোখ দুটো সেখানে পদে পদে বাধা পাবে। এমনি প্রাণ ভরে যতদূর ইচ্ছা দেখতে পাবে না।…কদিন ধরে শুধু সেই কথাই ভাবছি।

মনোরমা স্বামীর অন্তরের এই অব্যক্ত বেদনাটুকু অনুভব করলেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন না। নির্বাক হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্যামাচরণ আরো কিছুক্ষণ যেন সেই অবাধ, অখণ্ড মুক্তি উপভোগ করে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—চল।

সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলে এতকাল পরেও মনোরমার বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে থাকে। সেখানকার প্রতি নিজে যে খুব একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন তা নয়, যা রেখে এলেন তার জন্যে তেমন কোনো গভীর মমত্ববোধও তাঁকে পীড়া দেয় না। জ্বালা করে শুধু একটা কথা মনে করে—হয়তো এই চলে আসার ফলেই তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। নদী এবং তাকে আশ্রয় করে যে জীবন তার উপরে তাঁর টান ছিল অচ্ছেদ্য নাড়ীর টান। সেটা যখন ছিঁড়ে যায় তারপর আর কেমন করে বেঁচে থাকে মানুষ ?

কিন্তু না এসেই বা কী করতে পারতেন মনোরমা ? স্বামীও সেটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেন নি। বিবেচক, বিচক্ষণ মানুষ ; যুক্তিকে অস্বীকার করেন নি। ছেলে এবং জামাতার প্রবল ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার না করে পারেন নি। বিশেষ করে যখন বুঝলেন স্ত্রীর ইচ্ছাও সেই দিকে। মনোরমার যে তা ছাড়া আর উপায় ছিল না। তাই সংসারের মুখ চেয়ে সারাজীবন যা করেন নি, তাই করলেন। এমন পথে পা বাড়ালেন, যেখানে স্বামীর অন্তরের সায় নেই।

ঘোষখালির দিনগুলো ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আড়িয়াল খাঁ তাদের শুধু নিরাশ্রয় করে নি, প্রায় নিঃসম্বল করে দিয়েছিল। যে কখানা জমি সংবৎসরের ধান যোগাত, শুধ ধান নয়—কলাই, সর্ষে, ধনে ইত্যাদি রবিশস্যেরও

চাহিদা মেটাত, তার সবগুলোই ছিল বাড়ির সামনেকার মাঠে। বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবার আগেই নদী সেটা নিয়ে নিয়েছিল। পিছনের মাঠেও সামান্য কিছু জমি ছিল। সেখানে হত আউশ আর পাট। পাটের দাম তখন পড়ে গেছে। আউশ আর কত! তিন মাসের খোরাকও চলে না। এই সংস্থানের উপর নির্ভর করে শ্যামাচরণ সপরিবারে মোষখালির জেলেপাড়ায় গিয়ে উঠলেন। জেলে হলেও তারা 'রাজবংশী'। রাজবংশের উদার দৃষ্টি এবং দরাজ অন্তর দিয়ে তারা এই ব্রাহ্মণ পরিবারটির সেবার ভার হাতে তুলে নিল।

কিন্তু তাদের সাধ যতখানি, সাধ্য তার চেয়ে অনেক কম। নিজেদের সারা বছরের অন্ন যোগাতেই গলদঘর্ম। একচাপে অনেকগুলো লোক; সম্পূর্ণভাবে নদীনির্ভর। জমিজমা নেই, একমাত্র সম্বল জাল। তাতে যা আসে। সেখানেও খেয়ালী আড়িয়াল খাঁর খেলা। কখনো এমন ভরে দেয় যে টেনে তোলা যায় না, কখনো আবার কিছুই দেয় না। খালি জাল, শূন্য নৌকো নিয়ে ঘাটে ফিরতে হয়। যখন পায় দু-হাত দিয়ে উড়িয়ে দেয়, দল বেঁধে উৎসবের ধুম পড়ে যায়, তার সঙ্গে যথেচ্ছ দীয়তাং ভুজ্যতাং। যখন পায় না, ঘরে ঘরে অরন্ধনের পালা। শুধু 'আজ' নিয়ে তাদের কারবার, 'কাল'-এর ভাবনা ভাবে না।

এরাই এনে তুলল তাদের ঠাকুরমশাইকে, আশ্রয় দিল নিশাঠাকুরের ভিটায়। ভরসা দিল, আমরা যতক্ষণ আছি আপনার কোনো চিন্তা নেই, কত্তাঠাকুর। আপনার একটু 'চরণধূলি' পেলে আমরা সব করতে পারি।

লক্ষ্মণের উপর ভার পড়ল, বাড়ি বাড়ি থেকে পালা করে 'সিধে' সংগ্রহ করে মাঠাকরুণের কাছে পৌঁছে দেবে। তার তো কোনো কাজ নেই। কঠিন অসুখ থেকে উঠেছে, 'জালে যেতে' পারে না। এই হল তার কাজ। পাড়ার কোনো একটা ছেলের মাথায় ধামা চাপিয়ে বয়ে নিয়ে আসে চারটি চাল, মুঠোখানেক ডাল, দুটো বেগুন কিংবা একটা কাঁচ লাউ, আর নিজের হাতে ঝুলিয়ে, কখনো জালের থলেতে বেঁধে কিংবা খালুইতে করে আনে মাছ। এসেই হাঁক দেয়, দিদিঠাকরুণ কই গো? দ্যাখ, কি এনেছি তোমার জন্যে।

উমা বেরিয়ে আসে। মাছের উপর তার ভীষণ লোভ। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। বলে—বাঃ, কী সুন্দর পাবদাগুলো, লক্ষ্মণদা; ঈস্, কাতলাটা কি রকম নাদুসনুদুস!

—হ্যাঁ, ঠিক এইরকম একটা নাদুসনুদুস ছেলে হবে তোমার।

—ধেৎ!

মধুর লজ্জায় পাণ্ডুর মুখখানায় একটা লালচে আভা ফুটে ওঠে। মাছগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়।

মনোরমা আপত্তি করেন—রোজ রোজ এত আমাদের দরকার নেই লক্ষ্মণ।

—এ্যা-তো কী বলছেন, মাঠাকরুণ? এই কটা চাল! এ তো আমরা এক-একজনে একবেলায় খেয়ে ফেলি।

—কিন্তু কদ্দিন আর এমন করে খাওয়াবে তোমরা?

লক্ষ্মণ দাঁতে জিভ কেটে বলে—ও কথা বলবেন না মা। আপনাদের

খাওয়াবো আমরা! সে সাধ্য কী? এটুকু আমাদের দেবসেবা।···কর্তাঠাকুর কই?

—যজমান-বাড়ি গেছেন।

—আর দাদাঠাকুর?

—সেও বেরিয়েছে। কাছারিতে গেছে।

—কাছারিতে! চমকে উঠল লক্ষ্মণ। সে জানে, নিতান্ত বাধ্য না হলে সে জায়গায় কেউ যায় না। জিজ্ঞাসা করল—কেন?

—একটা কাজ-টাজ যদি পাওয়া যায়, সেই চেষ্টায় গেছে।

—ও! আশ্বস্ত হল লক্ষ্মণ।

জমিদারের কাছারির সেই নায়েব, একসময়ে যিনি শ্যামাচরণকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নেন নি, গ্রামের আর সকলকে বাদ দিয়ে একা যেতে চান নি, তারই কাছে একটা চিঠি দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন, যাহোক একটা কাজের সংস্থান যদি তাঁরা করে দিতে পারেন। নিজেও খোঁজ করছিলেন, পুরনো যজমানেরা কে কোথায় গিয়ে উঠেছে, কেমন আছে তারা, ক্রিয়া-কর্ম পুজোপাটের আয়োজন কতদূর কী করে উঠতে পারল। বেশির ভাগই দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি গিয়ে যারা কোনোরকমে মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা দাঁড় করাতে পেরেছে, তারাও প্রায় তাঁরই মত দুঃস্থ। খাওয়া-পরার ব্যবস্থাই করে উঠতে পারে নি, পুজোপাটের ব্যবস্থা তো দূরের কথা। আপাততঃ 'পুরুতঠাকুরকে' তাদের প্রয়োজন নেই।

দূরে-দূরেও দু-একদিন ঘুরে এলেন, খানিকটা অবস্থাপন্ন যজমানেরা যেখানে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে। তারাও ঠিক গুছিয়ে বসতে পারে নি। তবু কেউ কেউ কিছু কাজ করাল—কারো বাড়িতে শনি-সত্যনারায়ণের পুজো, কারো নতুন ঘরে চণ্ডীপাঠ, কারো প্রথম পোয়াতী পুত্রবধূর পঞ্চামৃত। কিছু প্রাপ্তি হল—চাল ডাল কাপড় গামছা, তার সঙ্গে সামান্য দক্ষিণা। জিনিসগুলো বোঁচকা বেঁধে নিজেই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলেন। লোক দিয়ে আনালে যে কটা পয়সা বেরিয়ে যাবে, এ দুঃসময়ে তার মূল্য অনেক।

কয়েকটা কাজের আশা পেলেন, সবই তেমনি দূরে। শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অতটা পথ হাঁটা বড় কষ্টসাধ্য! তার উপরে দীর্ঘ উপবাস—পৌরোহিত্যের যেটা অপরিহার্য অঙ্গ। ব্রাহ্মণেতর বাড়িতে অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ চলবে না। সুতরাং দিনান্তে দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেওয়া। রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়া—হাতে কিংবা কাঁধে গামছায় বাঁধা পোঁটলা। দূরের পথে সেও দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

সারাদিন হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যখন বাড়ি এসে পৌঁছতেন শ্যামাচরণ, মনোরমা স্বামীর দিকে তাকাতে পারতেন না। তাঁর বুক ফেটে কান্না আসত। তবু মুখ ফুটে কখনো বলতে পারতেন না, তুমি বিশ্রাম নাও, অত কষ্ট তোমার সইছে না। দুদিন না যেতেই আবার রাত থাকতে থাকতে নিজে হাতে স্বামীর যাত্রার আয়োজন করে দিতেন। বাড়ির সামনে বেড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন,

যতক্ষণ সেই দুর্বল, ভঙ্গুর, ক্ষীণ-দীর্ঘ দেহখানা মাঠের কোলে অদৃশ্য হয়ে না যায়।

হরিশের জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নায়েব। জমানবিসের মুহুরি। ছ মাস শিক্ষানবিস থাকতে হবে। ততদিন মাইনে নেই, শুধু দুবেলা দুটো খেতে দেবে কাছারি।

ওখানে অনেকেই অমনি খেতে পেত—পাইক, বরকন্দাজ, ঝাড়ুদার, চাকর-বাকর নিয়ে বেশ একটা বড় দল। রান্না করত পশ্চিমা 'ঠাকুর'। তার জাত সম্বন্ধে হরিশ নিঃসন্দেহ নয়। উপাধি যদিও তেওয়ারী (ওদের মুলুকে তারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, শুনেছিল হরিশ) কিন্তু 'সন্ধ্যা' করে না, ব্রাহ্মণের অন্যান্য আচারও মেনে চলে না। তার হাতে খেতে প্রবৃত্তি হল না। নায়েব পীড়াপীড়ি করলেন না। হরিশের জন্য 'সিধের' বন্দোবস্ত হল। নিজে রান্না করে খেত। আস্তে আস্তে আরো দু-একটি উপরওয়ালার রান্নার ভার পড়ল তার উপর। ক্রমশঃ দেখা গেল, নামে মুহুরী হলেও আসলে সে বিনা মাইনের রাঁধুনে বামুনের দলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। নায়েবের বাসাতেও মাঝে মাঝে ডাক পড়ে। 'বামুনের ছেলে', দুটো রান্না করে দেবে, তাতে তার অপযশ নেই—এই হল সাধারণ মনোভাব।

প্রথমটা তার অভিমানে আঘাত লাগলেও হরিশ নিজের মনকে ঐ যুক্তি দিয়েই বোঝাল। রান্না তার মোটামুটি জানা ছিল। ও বাড়িতে থাকতে দূরে কোনো যজমান-বাড়িতে দু-চার দিনের জন্যে যখন যেতেন শ্যামাচরণ, মনোরমা ছেলেকে সঙ্গে দিতেন। ক্রিয়া-কর্ম সেরে উঠতে অবেলা হবে। তার আগেই সে রান্নাটা করে রাখবে। কাছারিতে দু-চারজনের রান্না করতে তার তেমন কষ্ট বা অসুবিধা হত না।

অসুবিধা হল শোবার ব্যাপারে। হরিশের থাকবার কোনো আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। কাছারির কাজকর্ম মিটে গেলে প্রকাণ্ড ফরাসের এক কোণে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ত। বহু লোকের, বিশেষ করে নানা জাতের পায়ের ধুলোর অশুচি স্পর্শে তার গা ঘিন ঘিন করত। তাছাড়া শুধু তক্তপোশের উপর শোওয়া তার অভ্যাসও ছিল না। তাদের বড় ঘরের পিছনে একটা শিমুল-গাছ ছিল। অনেক তুলো হত। যজমান-বাড়িতে পাওয়া গামছা সেলাই করে করে খোল বানিয়ে তার মধ্যে তুলো ভরে মা তাকে একটা তোশক করে দিয়েছিলেন। সেই বিলাসটুকুর অভাব তাকে বড় পীড়া দিত। খাওয়া-পরার সব রকম কঠোরতা সে সইতে পারত, কোনোরকম খাটাখাটুনিতে কষ্ট হত না, আপত্তিও ছিল না, কিন্তু ঐ তোশকের মায়া ত্যাগ করাই ছিল সব চেয়ে কঠিন। সেই জন্যে পারতপক্ষে বাইরে কোথাও রাত্রিবাস করত না, যত দূরের পথই হোক, পাড়ি দিয়ে চলে আসত। উমা এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে ছাড়ত না। দাদাকে কোথাও বেরোতে দেখলেই বলত—এ কি! তোমার তোশক নিয়ে গেলে না?

হরিশ হয়তো তখন মাঠে চলেছে, কাঁধে ধামা, তার মধ্যে ধান কিংবা অন্য

কোনো শস্যের বীজ, জমিতে ছড়াতে হবে। রেগে উঠল—দেখলে মা ? একটা শুভ কাজে যাচ্ছি, পেছন থেকে ডেকে বসল !

মনোরমা মেয়েকে বকে দিতেন, কিন্তু মনে মনে হাসতেন। ছেলের রাগটা যে আসলে শুভযাত্রায় বাধা দেবার জন্যে নয়, তার তোশকগত দুর্বলতাটুকু ঢাকবার জন্যে, এটা তাঁর জানা ছিল। শুধু তোশক নয়, মোটামুটিভাবে বিছানা সম্পর্কে সে যে ছেলেবেলা থেকেই একটু খুঁতখুঁতে, তাও তিনি জানতেন। সেই জন্যে সব কাজ ফেলে তার বিছানাটা রোজ নিজে হাতে, কখনো বা মেয়েকে দিয়ে, ঝেড়েঝুড়ে পরিপাটি করে পেতে দিতেন। মেয়েকে বোঝাতেন, সকলের স্বভাব তো একরকম হয় না মা। ওকে যা খেতে দিস সোনামুখ করে খেয়ে নেবে, কিন্তু বিছানাটা ভালো না হলে বিগড়ে যাবে। ব্যাটাছেলেদের ফ্যাসাদ কি কম ?

কাছারির কেঠো ফরাসের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে প্রতিরাত্রে হরিশের মায়ের কথা, বোনের কথা মনে পড়ত। পিঠের ব্যথাকেও ছাড়িয়ে যেত একটি গোপন মনের নীরব ব্যথা।

একদিন অকালবৃষ্টির পর রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। নায়েব গিয়েছিলেন মফস্বলে। সেরেস্তার কাজ সকাল সকাল মিটে গেল। হরিশের শরীরটা ভাল ছিল না। তার উপরে সারাদিন খুব খাটিয়েছে জমানবিস, রান্নাও করতে হয়েছে কয়েকজনের মত, পরিবেশন করে খাওয়াতে হয়েছে। হাতে-পায়ে ব্যথা নিয়ে শুতে এল। শক্ত ফরাসে এপাশ ওপাশ করে কিছুতেই ঘুম এল না। মাত্র তিন-চার হাত দূরে পাতা রয়েছে নায়েবের পুরু গদি, ফরাশের পিছনদিকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, দিব্যি ধবধবে ফর্সা ওয়াড় পরানো। ঐখানে এসে তিনি রোজ বসেন, ওটা তাঁরই জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত। আর কারো ওখানে ওঠবার বসবার অধিকার নেই।

ঘাড় উঁচু করে বার বার সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল হরিশচন্দ্র। নিজে বোঝাল, না, ওটা মনিবের আসন, ওতে লোভ করতে নেই। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে এসেছে এবং শুনে এসেছে, গুরুজনের ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করা অন্যায়। বাবার খড়মে পা লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে শিখিয়েছেন মা, তাঁর জলচৌকিতে কেউ বসে না। মনিবও তো গুরুজন, হলেনই বা তিনি অব্রাহ্মণ। তাছাড়া তিনি অন্নদাতা।…

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো ঠাণ্ডা পড়ল, এবং হরিশের মনে হল, তার গায়ের ব্যথাটাও বেড়েছে, বোধ হয় জ্বর এসেছে। পাতলা চাদরটা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে গুটিশুটি হয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাথার ভিতরে সেই দ্বন্দ্বটা কিছুতেই থামল না। মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রামত ঘোর আসছিল। তার মধ্যে চারহাতের দূরের ঐ পুরু গদিটা তাকে দুহাত বাড়িয়ে টানতে লাগল, যেন চুপি চুপি বলল—দোষ কি ? কেউ তো দেখছে না !

সকালবেলা কাদের হাঁকডাকে ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপরেই চমকে উঠল, এ কোথায় শুয়ে আছে ! ঝাড়ুদারটা হাসছে। পাইকদের

সর্দার তর্জন করছে, তহসিলদারবাবু গাল চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—আহা, চটছ কেন সোনাউল্লা? বাবুর আমাদের নায়েব হবার শখ হয়েছে! বসো, বসো, বেশ গুছিয়ে বসো দিকিন। ওরে কে আছিস? গড়গড়াটা নিয়ে আয়!

একটা হাসির রোল উঠল। তার মধ্যে ঢুকলেন জমানবিস। তখনো হরিশ গদির আসন থেকে উঠতে পারে নি। লজ্জায় মাথা তুলতে পারলে তো উঠবে। তিনি এসে একটা ধমক দিলেন, উঠে এসো। আসুন নায়েব মশাই, তোমার লাটগিরির মজা দেখাচ্ছি।

সেদিন আর কাছারির কাজে তার ডাক পড়ল না। সকাল থেকেই লাগতে হল রান্নায়। দিন বুঝে রাঁধুনে বামুনটি 'তবিয়তে'র দোহাই দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

নায়েব ফিরলেন দুপুরের দিকে। বিকেলবেলা হরিশকে তাঁর সামনে হাজির করা হল। তিনি নরম সুরেই বললেন—গরীব বামুনের ছেলে। পেটের দায়ে কাজ শিখতে এসেছ। তা এসব ঘোড়া রোগ কেন বাপু? গদি না হলে ঘুম হয় না! কটা গদি আছে তোমার বাড়িতে?···যাও, কাজ কর গে।

সেদিন থেকে তার শোবার ব্যবস্থা হল পাইকদের ঘরে একটা খালি বেঞ্চির উপর। ফরাসে আর বিশ্বাস নেই। আবার যদি গদি চড়ে বসে।

সেই কাষ্ঠশয্যা হয়তো দুদিনেই সয়ে যেত। কিন্তু সহ্য হল না পাইক, বরকন্দাজ, চাকরবাকরদের অহরহ শ্লেষ-বিদ্রুপ। প্রজারা—কাছারিতে যাদের দুঃসহ লাঞ্ছনা দেখে হরিশের মায়া হত, তারাও ওকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না।

একদিন কাউকে কিছু না বলে গামছায় বাঁধা ধুতিখানা বগলে করে মোষখালির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

জমিদারী কাছারির এই কটা মাস সে কোনো দিন ভুলতে পারে নি।

মাটির মায়া বড় মায়া। যে মাটি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারও স্মৃতিটুকু থেকে যায়। তার টানও কম নয়। সেই টানই আবার একটি দুটি করে নদীপারের যে লোকগুলো ঘরদুয়ার ভেঙে নিয়ে একদিন নিরুদ্দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনতে লাগল। কোথায় ছিল তাদের গ্রাম? তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় গেল সেই বড় বড় গাছপালা, ঝোপঝাড়, ক্ষেতখামার, সেই বুড়োশিবতলার ভাঙা মন্দির? সে খবর জানে শুধু আড়িয়াল খাঁ। কিংবা হয়তো সেও জানে না। সে কেবল উন্মত্ত নেশার ঘোরে ভেঙে নিয়ে গেছে, তারপর আর তার কিছু মনে নেই। আজ সে শ্রান্ত, অবসন্ন, নিজের অধিকার থেকে অপসারিত। যেখানে সে কুটিল আবর্ত রচনা করে সগর্জনে বিজয় ঘোষণা করেছে, কটা দিন না যেতেই সেখান থেকে তাকে হটে যেতে হয়েছে। যে মাটি সে কেড়ে নিয়েছিল, সেই মাটিই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে মাটির নাম বদলে গেছে, রূপ বদলে গেছে। আজ আর সে গাছপালা ঘেরা জনপদ নয়, কৈজুড়ি, চাঁদহাট, তেঁতুলডাঙ্গা বলে

কউ তাকে ডাকবে না, তার নতুন নাম চর। তৃণগুল্মহীন বিস্তীর্ণ ভূমি রৌদ্রালোকে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে।

জল আর মাটির এই চিরন্তন সংগ্রাম অনাদিকাল থেকে দেখে আসছে এদেশের মানুষ।

এই চরে এসে আবার ঘর বাঁধতে চাইছে সেদিনের সব গৃহহারার দল, আড়িয়াল খাঁ একদিন যাদের ভিটেমাটি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বলছে, এ তো আমাদেরই মাটি। নদী নিয়ে গিয়েছিল, রাখতে পারে নি, আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু মাঝখানে যে একটি তৃতীয় পক্ষ এসে দাঁড়াতে পারে, তাদের সরল মনের সহজ যুক্তি তা ধরতে পারে না। এই পক্ষটি হল রাজশক্তি, যার প্রতিনিধিত্ব করছে জমিদার। তাদের যুক্তি হল লাঠি। শুরু হয় সংঘর্ষ। কিছু মাথা ফাটে, কিছু প্রাণ যায়, কিছু পুরনো মানুষ সরে গিয়ে নতুন মানুষ আসে। কে গেল আর কে এল সে হিসাব আর কেউ করে না। গড়ে ওঠে নতুন বসতি, সারি সারি চালাঘর, তার পাশে কঞ্চির বেড়া, মাদার, জিউলি কচার লাইন, কলাগাছের ঝাড়।

আড়িয়াল খাঁর উগরে ফেলা নতুন মাটি। আগের মত এঁটেল নয়, বেশ কিছুটা বালির ভাগ। তবু মানুষের মেহনত তাকেও একদিন স্বর্ণপ্রসূ করে তোলে। দেখতে দেখতে বিশাল চরভূমি নতুন ফসলে ভরে যায়।

এই ভাঙাগড়া ওঠাপড়া নিয়েই নদীপারের জীবন। অন্যত্রও জীবনের রূপ এই। মানুষ হেরে গিয়েও হার মানে না। সে অপরাজেয়।

শ্যামাচরণ শিরোমণির পুরনো প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তাঁকে খুঁজে বের করল। সাধারণ চাষাভুষো শ্রেণীর লোক, মাটিই যাদের সম্বল, দরকার মত যারা লাঠি ধরতে পারে এবং লাঠির ঘা সয়েও টিকে থাকতে পারে। চরের জমিতে নতুন ডেরা বাঁধার ব্যবস্থা করে তারা গিয়ে বলল—আপনিও চলুন কত্তাঠাকুর। আমাদের যদি দুমুঠো জোটে, আপনারও জুটবে।

শ্যামাচরণ তাদের নতুন বসতি পত্তনে সস্নেহে উৎসাহ দিলেন, কিন্তু নিজে গিয়ে তাদের ভার বৃদ্ধি করতে চাইলেন না। তাছাড়া একটু যারা অবস্থাপন্ন এবং উঁচু শ্রেণীর গৃহস্থ—তাদের মধ্যে তাঁর কিছু যজমানও ছিল—তারা কেউ ফেরে নি। তারা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাটির সঙ্গে তাদের বন্ধন অত দুশ্ছেদ্য নয়। অন্যত্র অন্যভাবে জীবিকার পথ করে নিয়েছিল। শুধু নিম্নবর্ণ কৃষকের সাহায্যে তাঁর পেট ভরবে না। জোরজুলুম করে জমি দখল কিংবা জমিদারের কাছে দয়া প্রার্থনা করে স্থান সংগ্রহ—তাও তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তাই গেলেন না।

এদিকে দূরের যজমানির উপর নির্ভর করে পাঁচ-ছটি প্রাণীর ভরণপোষণ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরত্বটাই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছিল। শরীর যেন আর বইছিল না। এমন সময় হরিশও কাছারির কাজ ছেড়ে বাড়ি এসে বসল। শ্যামাচরণ তাকে কোনো প্রশ্ন করেন নি। মনোরমা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ

কিছু জানতে পারেন নি। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন ছেলের উপর। স্বামীর কাছেও সেটা প্রকাশ না করে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন,—ও নিয়ে আর তোলপাড় করো না। টিকে থাকতে পারলে কি আর থাকত না! দেখছে তো সব!

—ছাই দেখছে। দেখলে আর সব ছেড়েছুড়ে চলে আসত না। আর কটা মাস গেলেই তো মাইনে দিত। তুমি একবার খোঁজ নেবে না?

—নিয়ে কোনো লাভ নেই।

জেলেপাড়া থেকে 'সিধে' নেওয়া অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওদের পাল-পার্বণে নারায়ণ পুজোর নাম করে যা দিত, দুটো ফলমূল, কিছু আতপ চাল, একটু দুধ—তাই শুধু নিতেন। মাঝে মাঝে দু-চারটা মাছও না নিয়ে পারতেন না মনোরমা। জিনিস না দিলেও গতর খেটে যতটা দেওয়া যায়, মেয়েপুরুষ কারো তাতে বিরাম ছিল না। বিশেষ করে লক্ষ্মণ, তার বৌ-ছেলে-মেয়েরা সর্বদাই আসত। তার পীড়াপীড়িতেই একটা গাই পুষেছিলেন। দুধ তো চাই। উমার জন্যে, তার কোলে যে বাচ্ছাটি এল তার জন্যে। গোরু পোষার হাঙ্গামা তো কম নয়। সব পোহাত ওরা—ঘাস কেটে আনা, চরাতে নিয়ে যাওয়া, গোয়াল সাফ করা, দুধ দোয়া, সব।

শ্যামাচরণের যতই আপত্তি হোক, রাজবংশীরা তাঁর সংসারের আরো খানিকটা ভার হয়তো না বয়ে ছাড়ত না। কিন্তু তাদের অবস্থা হঠাৎ পড়ে গেল। সমস্ত পাড়াটাই সম্পূর্ণভাবে নদীর আশ্রিত। সেই নদীই তাদের ফেলে দূরে সরে গেল। কৈজুড়ির সামনে যে বিরাট চর, তার খানিকটা মোষখালির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তার পাশে রইল একটা অগভীর জলা। আড়িয়াল খাঁর সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হল না, বটে কিন্তু মাছের ঝাঁক চলে গেল গভীর জলে, নদীর যেটা প্রধান প্রবাহ। জল ঘাড়ে করে লম্বা চর পার হয়ে সেখানে গিয়ে নামতে হয়। চরে যখন বসতি শুরু হল, তখন তাতেও বাধা এসে জুটল। নতুন বাসিন্দাদের বেশির ভাগ দূরের মুসলমান চাষী। তাদের সঙ্গে নিরীহ মৎস্যজীবীরা পেরে উঠবে কেন? দু-চারটা ছোটখাটো মারামারিও হয়ে গেল। তারপর দু'পক্ষের মধ্যে একটা রফা গোছের হল বটে, কিন্তু তাতে হারল জেলেরাই।

নদী সরে যাওয়ায় মাছ ধরার যেসব প্রক্রিয়া—বেড়াজাল, ঝাঁকিজাল, ভেশাল ইত্যাদি কোনোটাতেই সুবিধা রইল না। 'কাঠা ফেলা'র* পাট তো প্রায় বন্ধ

---

* নদী বা বিলের খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘন করে পাতা-সমেত হিজল গাছের ডাল এনে ফেলা হয়। তাকে বলে 'কাটা ফেলা' বা 'কাঠা দেওয়া'। সেগুলো সেখানে পচতে থাকে এবং মাছ এসে বাসা বাঁধে তার মধ্যে। তারপর সময় হলে জেলেরা সব জায়গাটা জাল দিয়ে ঘিরে ভিতরে নৌকো নিয়ে ডালগুলো তুলে ফেলতে থাকে। আরেক দল বাইরে থেকে জালটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনে। খুব সাবধানে আনতে হয়, যাতে করে তলা দিয়ে মাছ না বেরিয়ে যায়। ক্রমাগত ডুব দিয়ে দিয়ে জালের তলাটা টেনে টেনে সরায়। তারপর ঘের যখন ছোট হয়ে আসে, জাল আর থাকে না, তখন মাছগুলোকে ধরে ফেলে। তার নাম কাঠা ওঠানো।

অনেক মাছ পড়ে এই সব 'কাঠায়'।

হয়ে গেল। অথচ সেইটাই প্রধান রোজগার। বাধ্য হয়ে ঘোষখালির রাজবংশীরা কোনো পুরুষে যা করে নি, একজন দুজন করে পরের জমিতে জন খাটতে গিয়ে লাগল।

শ্যামাচরণ এই সব দেখতেন, শুনতেন আর ভাবতেন, মানুষের অহমিকা তাকে দিয়ে যা-ই বলাক, সে একান্তভাবে প্রকৃতির দাস। প্রাকৃতিক পরিবর্তনে তার জীবিকার ধারাও বদলে যায়। সেই পরিবর্তন যখন বিপর্যয়ের আকার নিয়ে আসে, তাঁদের জীবনে যেমন এল, তখন তো কথাই নেই। সমাজজীবনের গোটা বিন্যাসটাই ওলটপালট হয়ে যায়। বৃত্তির কোনো স্থিরতা থাকে না। কে কোন্ কাজের যোগ্য, সে প্রশ্ন তখন অবান্তর; যে যা পায় দুহাতে আঁকড়ে ধরে। একমাত্র লক্ষ্য শুধু টিকে থাকা, কোনোরকমে বেঁচে থাকা।

ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত তিনিও ভেসে চলেছেন, কেউ জানে না কোথায়। আকৈশোর যে পথ ধরে চলে এসেছেন, যে বৃত্তি আশ্রয় করে এই কটি আশ্রিত প্রাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাকে বোধ হয় এবার বর্জন করতে হবে। তারপর কোন্ বৃত্তি ধরবেন? কোন্ নতুন অচেনা পথে পা বাড়াবেন? কে তার সন্ধান দেবে?

উমার মেয়েটি যেদিন ভূমিষ্ঠ হল, অমূল্য এখানে ছিল না। এদিকে একটা মোটামুটি গোছগাছ করে দিয়েই তাকে চলে যেতে হয়েছিল। তখনো পথঘাট শুকোয় নি। তবু না গিয়ে উপায় ছিল না। থেকেই বা কী করতে পারত? প্রসূতি যায়-যায়, কিন্তু সারা তল্লাটে ডাক্তার কবিরাজ বলতে কিছুই পাওয়া গেল না। সতীশ ডাক্তার অনেক আগেই তার ডিস্‌পেন্সারি ভেঙে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বাজারে তখন ভাঙন শুরু হয়ে গেছে, লোকজন পালাচ্ছে, কোন্ ভরসায় কাদের নিয়ে থাকবেন?

উমাকে খালাস করেছিল একটি বুড়ী ধাই। লক্ষ্মণই জুটিয়ে এনে দিয়েছিল। তারই হাতে মেয়ে এবং নবজাত শিশুটিকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া শ্যামাচরণের আর কোনো পথ ছিল না। মনোরমা মেয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কি করে যে টিকে গেল, সে এক পরম বিস্ময়।

অমূল্যকে শুভ সংবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা হল। কিন্তু মাস দুয়েকের আগে সে আসতে পারল না। এসে এখানকার অবস্থা সব দেখল। এবারে ইচ্ছা করেই বেশী দিন থাকল না। বুঝল থাকার চেয়ে চলে গেলেই এঁদের উপকার করা হবে, একটি লোকের ভার কমবে। সম্ভব হলে স্ত্রী-কন্যার ভার থেকেও শ্বশুর-শাশুড়ীকে মুক্তি দিত, কিন্তু উমা তখনো শয্যাগত, মেয়েটিও নিয়ে যাবার মত নয়। শ্বশুর জানতে পারলে নেবেন না, তাই গোপনে শাশুড়ীর হাতে গোটা কয়েক টাকা গছিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। সেই টাকা দিয়েই মেয়ে এবং কন্যার জন্যে একটি গোরু কিনেছিলেন মনোরমা।

কয়েক মাস পরে অমূল্য হঠাৎ এসে উপস্থিত। এসেই যখন খবর নিচ্ছে, উমা কতটা সেরে উঠেছে, হিমী কত বড় হল, মনোরমা নিজে থেকেই বললেন—

তুমি যখন এসে পড়েছ বাবা, ওদের নিয়ে যাও। আর দুটো মাস থেকে গেলে ভালো হত, কিন্তু এ কষ্টের মধ্যে—

বাকীটুকু আর শেষ করতে পারলেন না। অমূল্য বলল—হ্যাঁ মা, ওদের নিয়ে যেতেই আমি এসেছি। আর—, থাক্, সে-সব কথা পরে হবে।

অমূল্য বুঝেছিল, কথাটা শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে পাড়বার আগে শ্যালককে জানানো দরকার। যে প্রস্তাব সে নিয়ে এসেছে, তার কেন্দ্রেই রয়েছে হরিশ। সে প্রকাশ্যে কোনো মতামত দিক আর না দিক—হয়তো দিতে চাইবে না—তার মনটা অন্তত জানবার চেষ্টা করতে হবে। অমূল্যর দায়িত্ব সেখানে কম নয়।

হরিশ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মত দিয়ে দিল—আমার আপত্তি নেই। তুমি বাবা-মাকে বল।

বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বলল।

অমূল্য খানিকটা অবাক না হয়ে পারল না, কিন্তু খুশী হল তার চেয়ে বেশী। ঐ নিয়ে দু-একটা স্থূল ধরনের রসিকতা করতেও ছাড়ল না। চোখ টিপে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করে বলল—সবুর সইবে তো? একদিন দুদিন নয়, বেশ ক'বছর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে ভায়া। কোলে করে নাকের পোঁটা পুঁছিয়ে দিতে হবে, কাঁধে নিয়ে কান্না থামাতে হবে। তার বদলে দু-একটা আঁচড়-কামড় ছাড়া আর কিছু জুটবে না। সে-সব বেশ করে ভেবে দেখেছ তো?

হরিশ ভগ্নীপতির ঠাট্টা-তামাশায় সাড়া দিল না। আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল এবং সেই ভাবেই বলল—দেখেছি। তুমি ওঁদের রাজী করাও গে।

মনোরমা সব শুনে চুপ করে ভাবতে লাগলেন। লুফে নেবার মত প্রস্তাব নয়, সে আশাও তিনি করেন নি। তবে আঁকড়ে ধরবার মত কিছু তো বটেই। এই দুঃসময়ে সেইটুকু তাঁদের দরকার। তার বেশী আর জুটছে কোথায়। জুটবে বলে যে বসে থাকবেন, তাই বা কোন্ ভরসায়? স্বামীর শরীর ভেঙে পড়ছে। তাঁর এখন বিশ্রাম দরকার। এতদিন তো সংসারের সব বোঝা একাই বয়ে নিয়ে এলেন। এবার ছেলে বড় হয়েছে। সে এসে কাঁধ দিক। বুদ্ধি বা গতর খাটিয়ে রোজগার করে এনে সকলকে খাওয়াবার মত ক্ষমতা তার যদি বা থাকে, সেরকম কোনো পথ কোনো দিকেই দেখা যাচ্ছে না। তার বাবা তার সাধ্যমত যে সুযোগটুকু পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাও সে কাজে লাগাতে পারল না। কাজেই তার যা দেবার সে এইভাবেই দিক।

অমূল্য বলেছিল—ওর কী? ও তো পিঁড়িতে বসে দুটো মন্তর পড়েই খালাস। ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট সব পোহাতে হবে আপনাকে, অতটুকু একটা বাচ্চাকে মানুষ করে তোলা।

—তার জন্যে আমি ভাবি না, বাবা। মনে করবো, সে-ও আমারই পেটে জন্মেছে। তুমি ঠিক করে ফেল।

স্বামীর মত করবার ভারও নিজের হাতে তুলে নিলেন মনোরমা। সারা জীবনে এত বড় দায়িত্ব আর কখনো নেন নি। এতদিন শুধু তাঁকে নির্বিচারে

অনুসরণ করে গেছেন। লোকে কত বলেছে, উনি পণ্ডিত মানুষ, বিষয়-বুদ্ধি বড় কম। ও'র সব কথায় সায় দিও না। ঠকবে। মনোরমা শুধু শুনে গেছেন। কখনো কখনো নিজের মনেও দ্বিধা জেগেছে, এটা বোধহয় ঠিক করছেন না শ্যামাচরণ। আড়িয়াল খাঁ যখন এগিয়ে আসছে, আশেপাশের সব মানুষ চলে যাচ্ছে, তখনো তিনি পরের আশ্রয় ভিক্ষা করবো না বলে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন, এতটা তাঁর মন সায় দেয় নি। তবু মনকে বুঝিয়েছেন, বিচলিত হতে দেন নি। বাবার কত কাজে ছেলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মনোরমা তাকেও বুঝিয়েছেন, ঐ একই যুক্তি দিয়ে—যা করছেন, আমাদের জন্যেই তো। চুপ করে থাকো। যা বলছেন করো।

এবার যে নিজে এগিয়ে এলেন, তার কারণ এ নয় যে স্বামীর উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না ; তার কারণ, এ মানুষটি আজ অশক্ত, দুর্বল, এই বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়বার, আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে তুলবার শক্তি তাঁর কাছে আশা করা যায় না। এ সংসারের কঠিন বোঝা থেকে তাঁকে যতখানি সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

শ্যামাচরণও নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে নীরব হয়ে রইলেন। বুঝলেন তাঁর করবার বা বলবার কিছু নেই, মনটা ভিতরে ভিতরে একদিকে পীড়িত, আরেকদিকে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। একদিকে এই আজন্ম-পরিচিত নদী মাটি আকাশ বাতাস যার সঙ্গে তাঁর নাড়ির বন্ধন, তাকে চিরদিনের তরে ছেড়ে যাবার দুঃসহ ক্লেশ ; আরেকদিকে এতদিন যা প্রাণপণে এড়িয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন, হয়তো পুরোপুরি পেরে ওঠেন নি, সেই পরাশ্রয় গ্রহণের গ্লানি।

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চেয়েই বোধহয় তাঁর মনের কথাটা জানতে পারলেন। বললেন—অমূল্য সব খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ঐ এক মাসি ছাড়া মেয়েটার তিনকুলে কেউ নেই। মাসিও ওকে কোনোরকমে 'উচ্ছুগ্যু' করে দিয়েই চলে যাবে। তখন হ'রেই সব। বাড়ি ঘরদোর জমিজমা দেখাশুনো, আদায় তশিল যা কিছু ওকেই করতে হবে। ছেলে শ্বশুরের সম্পত্তি পাচ্ছে। তাতে আর দোষ কী? ঘরজামাই হয়ে তো থাকতে হচ্ছে না।

শ্যামাচরণ জবাব দিলেন না। মনোরমাকে একথা বোঝাতে যাওয়া কঠিন যে সে পাচ্ছে না কিছুই। সে তাঁর স্ত্রীর বর্তমানের অভিভাবক আর ভবিষ্যতের আশ্রিত। তার বেশী আর কিছু নয়। আর তাঁরা—স্বামী-স্ত্রী একটি শিশু-সন্তান নিয়ে সেই আশ্রিতের আশ্রয়ে গিয়ে উঠছেন। কথাটা রূঢ় সত্য। বলতে গেলে আরো রূঢ় শোনায়। যে শুনবে সেই বলবে এটা সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়। সকলেই একান্ত আপনজন। এখানে আশ্রয়ের প্রশ্ন উঠছে কেন? তাই শ্যামাচরণ শুধু শুনে গেলেন, কিছুই বললেন না।

নতুন আশ্রয়ে এসে এই ভাজনকাঁদি এবং তার আশপাশের গ্রামগুলো কদিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর তাঁর হাতবাক্সের ভিতর থেকে বের করলেন সেই বহুদিন তুলে রাখা খেরোয় বাঁধা চরক-সংহিতা। একদিন সে ছিল তাঁর অবসর-যাপনের প্রিয় সঙ্গী। মাঝে মাঝে কাজেও লাগাতেন। কিন্তু তার কাছ থেকে

অর্জিত বিদ্যাকে উপার্জনের উপায় হিসাবে কখনো গ্রহণ করেন নি। আয়ুর্বেদ এবং তাকে আশ্রয় করে যে-সব বটিকা, পাঁচন, চূর্ণাদি নিজ হাতে তৈরি করতেন তার ব্যবহার ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। এবং সবটাই দান। এখানে এসে তাকে বৃত্তির রূপ দিলেন শ্যামাচরণ।

আয় অতি সামান্য। দাবি বলে কিছু ছিল না। যে যা দিত হাত পেতে নিতেন, যে না দিত সেও ব্যবস্থা বা ওষুধ থেকে বঞ্চিত হত না, তবে প্রায় সকলের কাছ থেকেই কিছু আসত। সব সময়েই যে অর্থের আকারে আসত, তা নয়। টাকা জিনিসটার এখানেও প্রচুর অনটন, যদিও এই 'বনজঙ্গলের দেশে' সাধারণ মানুষের অবস্থা অসচ্ছল ছিল না। জঙ্গলটাই তাদের একটা বড় সম্পদ। প্রায় সব গৃহস্থেরই বাড়ির চারদিক ঘিরে কয়েক বিঘে করে বাগান। সাজানো বাগান নয়, অজ্ঞাতজন্ম, পুরুষানুক্রমে অযত্নবর্ধিত গাছপালার জটলা। আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারির সঙ্গে শিমুল, শেওড়া, হিজল, বন্যগাব, জিউলির সমাবেশ। কলাবন, বাঁশের ঝাড়। তারই খানিকটা সাফ করে তরি-তরকারিও করত অনেকে। কপি-আলু-টম্যাটো নয়, বেগুন মুলো লাউ কুমড়ো লঙ্কা ডাঁটার মত অকুলীন শাকসবজি।

যারা পয়সা দিতে পারত না, গাছ থেকে দুটো ফল পেড়ে দিয়ে যেত, কিংবা ক্ষেত থেকে কিছু তরকারি। ঘরের খুঁটি বদলাতে হবে, কেউ হয়তো চারটা বাঁশ পৌঁছে দিয়ে গেল। সিধেও আসত কোনো কোনো রুগীর বাড়ি থেকে—চাল, ডাল, আনাজপাতি, পুকুরের মাছ, ঘানিতে পেষা তেল, তার সঙ্গে এক ঘটি দুধ। কিছু কিছু নিম্নবর্ণের গরীব হিন্দু কিংবা মুসলমান, যাদের বাগান পুকুর ক্ষেতখামার নেই, থাকলেও নামমাত্র, তারা দিত গতর। তার নাম ছিল 'বেগার দেওয়া', আসলে বেগার নয়, চিকিৎসকের পারিশ্রমিক। আগাছা সাফ করে, বাগান কুপিয়ে, কখনো বা মাঠান জমির ঘাস নিড়িয়ে দিয়ে যেত। হিন্দুরা একবেলা দুটো 'পেসাদ' পেত। ডাল, ভাত, মটর শাকের ঘণ্ট আর পাঁচমিশেলি তরকারীর একটা লাবড়া রেঁধে দিতেন মনোরমা। মুসলমানেরা ব্রাহ্মণ-বাড়িতেও অন্নগ্রহণ করত না। তারা নিত 'জলপানি'—মুড়ি, চিঁড়ে, তার ভিতরে কটা নারকেল নাড়ু, কিংবা দুখানা বাতাসা।

শ্যামাচরণকে তাঁর রুগীরাও ডাকত পণ্ডিত মশায় কিংবা ঠাকুর মশায় বলে, কবিরাজ মশায় বলত না। কবিরাজটা আসলে ছিল বৈদ্যদের পেশা। আশপাশের গ্রামে কজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য কবিরাজ ছিলেন। তাঁদের ডাক আসত প্রায়ই ধনী কিংবা মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে। গরীবেরা তাঁদের মাসুল যোগাতে পারত না। তারা 'ঠাকুর মশায়'কে পেয়ে বর্তে গেল।

শ্যামাচরণ নতুন বৃত্তি পেলেন। ছেলের কল্যাণে, অর্থাৎ তার বিবাহের কল্যাণে সাংসারিক অনটন থেকে মুক্তি পেলেন, কিন্তু যে মন তিনি ফেলে এসেছেন রাক্ষুসী আড়িয়াল খাঁর ভাঙনের ধারে তার আদিগন্ত মাঠের কোলে, তাকে আর ফিরে পেলেন না। ওষুধের পোঁটলাটা হাতে করে জঙ্গলে-ঘেরা সরু পথ ধরে চলতে চলতে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতেন। শূন্য, অসহায় দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতেন

এই নদীহীন দেশটার দিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত একটুকরো মাঠ, কিন্তু তার পরেই আবার বাধা, ঘন গাছপালার রাজত্ব। কোথায় সেই অবাধ মুক্তি, সেই সীমাহীন প্রান্তর, সেই মাটির বুকে নুইয়ে পড়া আকাশ, সেই অখন্ড দিকচক্রবাল! কেমন যেন একটা তীব্র অভাব অনুভব করতেন নিজের মধ্যে। সারা মন বিষাদে ভরে যেত।

মোষখালি থেকে ভাজনকাঁদি প্রায় দেড়দিনের পথ। নৌকাপথে ঘুরে ঘুরে আসতে হয়েছিল। সেদিনের প্রতিটি খুঁটিনাটি মনোরমার স্পষ্ট মনে আছে। কতদিন হয়ে গেল, আজও সব যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন।

মস্ত বড় বাড়ি। তাঁদের কৈজুড়ির বাড়ি থেকে দুগুণের কম নয়। তেমনি খড়ের ঘর। সব খালি পড়ে রয়েছে। ঝাড়পোঁছ পড়ে নি কতকাল! উঠোন ভরতি ঘাস আর আগাছার জঙ্গল। তার একধারে একটি পাঁচ-ছ বছরের মা-বাপ-মরা মেয়ে নিয়ে দিন গুনছিলেন তার এক ষাট বছরের মাসি, কে এসে তার ভার নেবে আর তিনি তার নিজের সংসারে ফিরে যাবেন। বাধ্য হয়েই থাকতে হয়েছিল। চলে গেলেই জমিজিরেত সব বেহাত হয়ে যাবে।

সারা গাঁয়ে ঐ একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ। মেয়েটির বাবা-মা কিছুদিন আগুপাছু মারা যাবার পর গ্রামের মুরুব্বিস্থানীয় লোকেরা চেষ্টা করছিল আরেকটি ব্রাহ্মণ পরিবার যদি পাওয়া যায়, যারা এই অনাথ শিশুটির সঙ্গে তাদের কোনো ছেলের বিয়ে দিয়ে এখানে বসবাস করতে পারেন। খবরটা অমূল্যর কানে যেতেই সে এসে ঐ মাসি আর গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে দেখাশুনো করে শাশুড়ীকে গিয়ে জানিয়েছিল।

ভিতরে ঢুকে ভাবী পুত্রবধূকে একনজর দেখেই মনোরমা চমকে উঠেছিলেন। ঢ্যাঙা, কালো, হাত-পাগুলো কাঠির মত, পেটটি জয়ঢাক। কোমরে একগাছা ঘুনসি ছাড়া আগাগোড়া দিগম্বর। মাসি বকতে বকতে বেরিয়ে এসে একখানা তাঁতের লাল ডুরে ওর কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে ধমকে উঠলেন—আ মর! এক ফোঁটা লজ্জা নেই এত বড় ধাড়ী মেয়ের! নে, এটা জড়া।

মেয়েটি নতুন লোক দেখে শাড়িখানা মুখের কাছে তুলে ফিক করে হেসে ফেলল। কে বললে লজ্জা নেই!

মনোরমা এগিয়ে এসে শাড়িখানা পরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কী?

—ফুলি। তুমি কে?

—আমি? আমি তোমার মা।

—আমার মা তো মরে গেছে।

—কে বললে? এই তো আমি তোমার মা।

বলে কাছে টেনে নিলেন। ফুলি বড় বড় দুটি চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

মনোরমা এবার ভাল করে দেখলেন মেয়েটিকে। মুখখানা একটু লম্বাটে

ধরনের, অত রোগা বলে বেশী লম্বা দেখাচ্ছে, ভাসা ভাসা ডাগর দুটো চোখ, চিবুকের ডোলটি বেশ, ছোট্ট একখানা কপাল, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল। হাসিটাও মিষ্টি লেগেছিল।

মনে মনে খুশী হলেন। যত্ন-আত্তি পেলে বয়সকালে একেবারে মন্দ দাঁড়াবে না। সব চেয়ে যেটা তাঁর মন টেনে নিল, সেটি ওর ঐ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা। আহা বেচারা! শুনেছে ওর মা নেই। ওর ছোট্ট মন তাই এতদিন মেনে নিয়েছিল, এবার বুঝে উঠতে পারছে না, এ আবার কে এসে বলছে 'আমি তোমার মা'!

তাঁর যতেও প্রায় ঐ বয়সী। এই দুটি শিশুসন্তানকে মানুষ করবার ভার তুলে নিলেন মনোরমা। তার উপরে আবার নতুন করে সংসার পাতা, বাড়ি ঘরদোর গুছিয়ে-সাজিয়ে দাঁড় করানো, বলতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলা।

জমিজমা যা আছে, তাঁদের মত একটি সংসারের সচ্ছলভাবে চলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দেখাশুনোর অভাবে আগের বছর ভালোমত চাষআবাদ হয় নি, জমি সব বরগা দেওয়া। লাঙ্গল-গোরু অন্যের, মালিককে অর্ধেক ফসল বুঝিয়ে দেবে; কে বুঝে নেয়? সামান্য কিছু প্রজা আছে, কয়েক সন খাজনা বাকী। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আনলে তবে তো তেল নুন কাপড় গামছার যোগাড় হবে! এখানে তো আর যজমান নেই যে দু-চার আনা দক্ষিণা আসবে, দুখানা কাপড় গামছা পাওয়া যাবে।

স্বামীকে আর এসব নিয়ে বিব্রত হতে দিলেন না মনোরমা। ছেলেকে ডেকে বললেন—এসব তোমার কাজ। বুঝেসুঝে নাও। যেখানে ঠেকবে, সেইটুকুই শুধু ওঁর কাছ থেকে জেনে নেবে। দরকার মত বিশ্বাস মশায়কে জিজ্ঞেস করবে। বাড়ির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এদিকের যা-কিছু সব আমি দেখবো।

প্রতিবেশী সব চাষী নমঃশূদ্র। একটু দূরে দু-একঘর কায়স্থের বাস। তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শশিভূষণ বিশ্বাস। উকিলের মুহুরী। কিছু বিষয়-সম্পত্তিও ছিল। তিনিই বলতে গেলে গ্রামের মাথা। এঁদের এনে বসাবার মূলেও তাঁর আগ্রহ এবং চেষ্টাই ছিল বেশী। পাকা লোক। শুরু থেকেই সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মনোরমা লাগলেন বাড়িঘরের পিছনে। নিজে হাতে দা ধরলেন, কোদাল চালিয়ে উঠোনের ঘাস-জঙ্গল সাফ করলেন। এ অভ্যাস তাঁর আগেও ছিল। কৈজুড়ির বাড়িতে, ছেলে যখন ছোট, তখনো এই ধরনের কাজ স্বামীকে করতে দেন নি। তিনি মাঠের চাষবাস দেখতেন, বাকী সময়টা পুজোপাট পড়াশুনো যজমান নিয়ে থাকতেন। ঘরদোর. উঠোন আঙিনার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, সবই ছিল গৃহিণীর নিজস্ব বিভাগ।

একটা দিনের কথা মনে পড়ল।

হরিশ তখন পনের-ষোল বছরের ছেলে। খুব বর্ষা হয়েছিল সেবার। পুবের পোতার ঘরের একদিকের দাওয়া ধসে পড়েছিল। মাটিটাও প্রায় বৃষ্টিতে ধুয়ে

নিয়ে গিয়েছিল। বর্ষার জল সরে যাবার পর একদিন শ্যামাচরণ কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরে দেখলেন, পুকুরধারে একহাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে মনোরমা মাটি কেটে ঝুড়ি বোঝাই করে দিচ্ছেন, আর হরিশ মাথায় করে বয়ে এনে সেগুলো বারান্দায় ঢালছে। স্বামীকে দেখে একটু লজ্জা পেয়েছিলেন বোধ হয়। কোমরে জড়ানো আঁচলাটা খুলে মাথায় তুলে দিতে দিতে বলেছিলেন—এত শীগগির শীগগির এসে পড়লে কেমন করে?

শ্যামাচরণ সে কথার জবাব না দিয়ে সহাস্যে স্ত্রীকে দেখছিলেন—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মাটির তলায় ঢাকা, দুহাত ভরা মাটি, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গাল দুটিতে রক্তিমাভা, হাসিভরা শ্রান্ত দুটি চোখ।

—কি দেখছ অমন করে! ছেলে রয়েছে না? চাপা গলায় তাড়া দিয়ে উঠেছিলেন মনোরমা। শ্যামাচরণের বোধ হয় ওসব দিকে খেয়াল ছিল না। বলেছিলেন—কালিদাসের রঘুবংশে একটি বিখ্যাত শ্লোক আছে। রাজা অজ রাণী ইন্দুমতী সম্পর্কে বলছেন, গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। স্ত্রী বা সহধর্মিণীর ওরকম সুন্দর বর্ণনা আর নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা একটু অসম্পূর্ণ।

—কেন? কৌতুক বোধ করলেন মনোরমা। শ্লোকটি এবং তার ব্যাখ্যা তিনি স্বামীর মুখে একাধিকবার শুনেছেন।

—ওর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়, কভি কভি কোদালহস্তা মৃত্তিকালিপ্তা মজুরনী।

—ঈস! বললেই হল! মজুরনী হতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমার নিজের ঘরে বসে মাটিই কাটি আর যাই করি, আমি—

—মহারাণী!

স্ত্রী কি বলতে চাইছেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে শেষ শব্দটি শ্যামাচরণই বসিয়ে দিয়েছিলেন।

অনেক দিনের কথা। এ বাড়িতে এসে আবার কোদাল ধরতে গিয়ে মনোরমার মনে পড়ে গেল। সেইদিনকার সেই গর্বোজ্জ্বল আনন্দটুকু নতুন করে উপভোগ করলেন।

পরের বছরগুলো যেন বড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে। ফুলি বড় হয়ে উঠেছে, হাতে-পায়ে মাংস লেগেছে, গাল দুটো ভরে উঠেছে, রক্তহীন ফ্যাকাসে চোখের কোণে স্বাস্থ্য শ্রী এবং লজ্জার আভা ফুটে উঠেছে। হরিশকে দেখলে মাথায় আঁচল তুলে ছুটে পালায়। অথচ কদিন আগেও সে মাঠ থেকে ফিরলে তার হাত ধরে টানত—এই দাদা, আমার জন্যে মটরসীম আনো নি?

হরিশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়া দিত—যা, পালা!

মনোরমা মাঝে মাঝে বলতেন—দূর বোকা মেয়ে, ওকে বুঝি দাদা বলতে হয়!

—য'তে বলে কেন?

—শ্বশুরের যে ও দাদা হয়।

—তাহলে আমার কী হয়?

কী জবাব দেবেন মনোরমা! শ্যামাচরণের কানে যেতে তিনি একদিন বলেছিলেন—বলুক ওর যা খুশি। বড় হলে নিজেই সব বুঝতে পারবে।

ঘর-সংসারের কোনো কাজে ভিড়তে চাইত না। শাশুড়ী ডাকাডাকি করলে একবার দুবার আসত, একটুখানিক থেকেই পালিয়ে যেত। যতীশের সঙ্গে বাগান ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার কাজ। আরেকটা আকর্ষণ ছিল, শ্বশুরের ওষুধতৈরির ঘর। চারিদিকে ছড়ানো কত রকমের গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়, খলনুড়ি, একটা মস্ত বড় হামানদিস্তা, কৌটোয় শিশিতে নানা আকারের বড়ি এবং সব কিছু থেকে কেমন একটা অচেনা গন্ধ—ফুলির বড় ভাল লাগত। চুপ করে দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। শ্যামাচরণ ওর আগ্রহ লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে ডেকে টুকটাক কাজ দিতেন—ঐ পাতাগুলো এগিয়ে দে তো মা! আচ্ছা এই হাঁড়িটা রোদে দিয়ে আয়। দেখিস ফেলে দিস না যেন, ভালো করে ধর্।

একদিন বললেন—এই শেকড়গুলো বাটতে পারবি?

ফুলি মাথাটা হেলিয়ে জানাল—পারবে, এবং খুশী মুখে মহা-উৎসাহে কাজে লেগে গেল।

মনোরমা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন কী কাজে। নজরে পড়তে কাছে এসে বললেন—ওমা, এ যে দেখছি দিব্যি ওষুধ বাটছে! আর সেদিন আমি একমুঠো সর্ষে, বেটে দিতে বললাম, কী বললে জানো—আমার হাতে ব্যথা!

শ্যামাচরণ হেসে উঠলেন—ঠিকই বলেছে। সর্ষে বাটতে গেলে ব্যথা হয়, আর ওষুধ বাটলে ব্যথা সারে। অত বড় পিলেটা পালাল কেমন করে? আমার এই ওষুধের গন্ধ শুঁকে শুঁকে।

—তাই দেখছি। তোমার এই গাছগাছড়ার মধ্যে জাদু আছে বাপু। তা না হলে মেয়েছেলে রান্নাবান্না ঘর-গেরস্তালির কাজে একদম ভেড়ে না, কখনো শুনেছ? আমার উর্মি এই বয়সে কেমন হাত-নুরকুট ছিল।

—সকলে তো একরকম হয় না। ও-ও ঠিক ভিড়বে। হয়তো একটু দেরি হবে।

বলে সস্নেহ দৃষ্টিতে লাল ডুরে পরা ক্ষুদ্র পুত্রবধূর দিকে তাকালেন শ্যামাচরণ। সে তখনো কোনো দিকে না চেয়ে দুলে দুলে ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে বিপুল উদ্যমে ওষুধ বেটে চলেছে। মনোরমাও কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যেন আপন মনে বললেন—তার চেয়ে ও বরং এইগুলোই করুক। নটখট তো কম নয়। তবু কিছুটা আসান দিতে পারবে। আমি তো একেবারেই আসতে পারি না।

মনোরমা হয়তো সেদিন বৌ-এর হাত দিয়ে স্বামীর কবিরাজী কাজকর্মে সামান্য যে সাহায্যটুকু করা যায়, তার বেশী আর কিছু ভাবেন নি। কিন্তু ওষুধ তৈরির ঐ টুকিটাকির ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে শ্বশুরের অনেক কাজের ভার ফুলির হাতে এসে পড়ল। তাঁর পুজোর ফুল তোলা, ঠাকুরঘর নিকানো,

পুজোর বাসনমাজা, জামা-চটি-লাঠিখানা এগিয়ে দেওয়া, হুঁকোর জল বদলানো, কল্কেয় আগুন তুলে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে এনে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দেওয়া, স্নান করে এলে কাপড়টা-গামছাটা শুকোতে দেওয়া। বিকেলের দিকে একটু করে মকরধ্বজ খেতেন শ্যামাচরণ। নিজেই মেড়ে নিতেন। হঠাৎ একদিন শ্বশুরকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তৈরি ওষুধের খলটা তাঁর হাতে তুলে দিল। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। আগাগোড়া নিপুণ এবং নির্ভুল হাতের স্পর্শ।

আর একটু যখন বড় হল, শ্বশুরের সেবা-যত্ন, ছোটখাটো শুশ্রূষার কাজ-গুলোও মনোরমা কিছু কিছু বৌ-এর উপর ছেড়ে দিলেন। সে তাঁর ঠাঁই করে জল গড়িয়ে দেয়, কখনো কখনো, শাশুড়ীর যখন হাতজোড়া, ডাল মাছ বা দুধের বাটিটা থালার পাশে এনে বসিয়ে দেয়, দুপুরবেলা বিশ্রামের জন্যে বিছানাটা পেতে রাখে, সন্ধ্যার পর মশারি খাটিয়ে রেখে যায়। কোনো কোনো দিন বলে. আপনার পা দুটো একটু টিপে দেবো বাবা ?

—কেন বল দিকিন ? হঠাৎ পা টেপার কথা তোমার মনে হল কেন ?

ফুলির চোখ দুটোয় কেমন একটা দূরাগত কোমল ছায়া ঘনিয়ে ওঠে! বলে —আমার পিসীর একটা মেয়ে আছে না! আমার চেয়ে এতখানি বড়; আমার দিদি হয়। সে রোজ তার বাবার পা টিপে দেয়। আমি তো ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম কতদিন। একটু একটু মনে আছে।

শ্যামাচরণ বুঝতে পারেন এই মেয়েটার অভাব কোথায়। বাপ নামক যে মানুষটি শিশুমনের অনেকখানি জায়গা ভরে রাখে, সেখানটা ওর শূন্য রয়ে গেছে। অন্য সকলের কথা যখন ভাবে সেটা আরো বড় হয়ে দেখা দেয়, সে ফাঁক ভরাতে চায়। এটা ওর প্রয়োজন, তার নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজন থাক বা না থাক।

তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে ঐখানে ওর তফাৎ। সে পেয়েছিল বলেই চাওয়ার তীব্রতা ছিল না। এ পায় নি, তাই অনুক্ষণ তাঁর পাশটিতে থাকতে চায়, অনেক করেও মন ভরে না। উমা কোনো দিন তাঁর এত কাছে সরে আসে নি। সে তার বাবাকে ভালবাসত যতখানি, তার চেয়ে বেশী করত সম্ভ্রম। খানিকটা ভয়ও ছিল তার মধ্যে। এর সে ভয় নেই, সম্ভ্রম-বোধও তেমন প্রবল নয়। মেয়েটি অতিমাত্রায় সরল, তার উপরে বঞ্চিত। এই বয়সেই অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, একটানা রোদের তাপে পুড়তে হয়েছে। সামান্য একটু স্নেহচ্ছায়া পেলেই যেন বর্তে যায়।

সে ছায়া সে সব চেয়ে বেশী পেয়েছিল এই শান্ত, ধীর, মৃদুভাষী, প্রায় সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত উদাসীন অথচ স্নেহকোমল প্রফুল্লানন মানুষটির মধ্যে। এ যেন একটা আলাদা জগৎ। এই পুজার ঘর, তার এক কোণে ঠাকুরের সিংহাসন, ধুপধুনোর গন্ধ, কাঁসর ঘণ্টা, শাঁখের শব্দ, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, এই গেল এক দিক। তার ঠিক পাশের ঘরেই লতাপাতা, শিকড়বাকড়, বড়ি-চূর্ণের বিচিত্র সম্ভার, তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানা বই-এর সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে

আছেন একজন অদ্ভুত মানুষ। এ বাড়ির, শুধু এ বাড়ির কেন, অন্য সকল বাড়ির সব মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদা, সব মিলিয়ে এক বিস্ময়-ভরা রহস্য লোক!

ফুলি দেখত শাশুড়ী সব সময়েই ব্যস্ত। তাঁর দুদণ্ড অবসর নেই। রান্না-বাড়া, ধন পান কলাই সর্ষে তোলাপাড়া, শুকনো, গোটানো, কিষাণ মজুর লোকজন খাটানো, খাওয়ানো, তাদের সঙ্গে চেঁচামেচি—যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে সারাদিন। স্বামীকে সে প্রায় দেখতেই পেত না। যখনই পেত, সেও এক ঝড়। ছোটাছুটি, হাঁকডাক। একটা মিষ্টি কথাও কি নেই মানুষটার মুখে! শুধু ধমক আর হুকুম—এই, ওটা নিয়ে আয়, এটা নিয়ে যা, সেটা কী করলি? ভয়ে কাঠ হয়ে যেত ফুলি। ফরমাস খাটতে খাটতে পা ব্যথা হয়ে যেত। কেবল ভাবত, কখন আবার বেরোবে লোকটা! সারা বাড়িটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে!

শ্বশুর যখন থাকতেন না, কিংবা পড়াশুনো নিয়ে নিবিষ্ট থাকতেন, তখন ফুলির সঙ্গী ছিল যতীশ। সেও একদিন চলে গেল, দূরে কোথায় লেখাপড়া করতে। ব্যবস্থাটা ওদের দুজনের কারোরই ভালো লাগে নি।

শ্যামাচরণের পরের যে বোন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল যশোর-মল্লিকপুর। এবার তাঁরা যেখানে এসে উঠলেন—ভাজনকাঁদি, সেখান থেকে খুব বেশী দূর নয়, সকালে বেরোলে সন্ধ্যার মধ্যে এসে পোঁছনো যায়। খবর পেয়ে একদিন তাঁর এক ছেলেকে সঙ্গে করে দাদা-বৌঠাকরুণকে দেখতে এলেন। যতীশকে দেখে বড় ভালো লাগল তার পিসীমার। কিছুদিন আগে তার উপনয়ন হয়েছে। ন্যাড়া মাথায় সবে কালোর আভাস দেখা দিয়েছে। গলায় আধময়লা পৈতের গোছটা বেশ পুষ্ট। কাছে ডেকে ভাইপোকে আদর করে পৈতেটা ধরে বললেন—আহা, এ কী করেছ বৌ? বেচারার গলায় একটা কাছি ঝুলিয়ে দিয়েছ!

মনোরমা হেসে স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন—ওঁর কাণ্ড। বারে বারে ছিঁড়ে ফেলে; তাই ডবল করে দিয়েছেন।

—না না; ছিঁড়ে ফেলে বলে দিই নি—স্ত্রীর উত্তরটা সংশোধন করে দিলেন শ্যামাচরণ।

—তবে? জানতে চাইলেন যোগমায়া।

ওকে এসময়ে মাটিতে দেখছিস বটে। এটা নেহাৎ পিসীর খাতিরে। আসলে সারাদিন গাছে-গাছেই থাকে। কখন পড়ে যায়, তাই কাছিটা একটু মোটা করে দিলাম। হঠাৎ কোনো ডালে-টালে আটকে গেলে বেঁচে যাবে।

যোগমায়া হেসে উঠলেন। যতীশ লজ্জা পেয়ে পিসীমার কোলে মুখ লুকোল। তিনি সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—কোথায় পড়ছে?

মনোরমা বললেন—বাড়িতে ওঁর কাছে পড়ে। এখানে তো কোনো ইস্কুল নেই।

—তা হলে ওর দোষ কী বল! গাছে গাছে ছাড়া কোথায় থাকবে? যে বয়সের যা। এখন বেশ কিছুক্ষণ খোঁয়াড়ে না আটকালে চলে? ওকে বরং আমি

নিয়ে যাই। গাঁয়ের মধ্যেই বড় ইস্কুল রয়েছে। সঙ্গী-সাথীও পাবে। এন্ট্রেন্স পর্যন্ত নিশ্চিন্দি।

মনোরমার চোখ দুটো আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কোনো মতামত না দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন না। যোগমায়া ভাইপোকেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে? মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না?

—তা কেন পারবে না? জবাব দিলেন মনোরমা—মা আর পিসী কি আলাদা নাকি?

—তা হলে এই যাত্রায়ই চলুক। আবার কবে কার সঙ্গে যাবে?

দাদার দিকে ফিরলেন যোগমায়া। তিনি বললেন—বেশ তো; তুই নিয়ে যাবি, তাতে আর আপত্তি কী?

যতীশ চলে গেল মল্লিকপুরে। ফুলি একেবারে একা পড়ে গেল। বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে রইল। অকারণে রাগল, কাঁদল, হরিণের কাছে বকুনি খেয়ে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল, শাশুড়ীর কোনো কথার জবাব করত না, এবারেও করল না, কিন্তু কী একটা বলতে গুম হয়ে বসে রইল। তারপর আবার ধীরে ধীরে শান্ত সহজ হয়ে এল।

মানুষের মন লতার মত। ঝড়ঝাপ্টায় পড়ে গেলেও বেশীদিন পড়ে থাকতে পারে না। নতুন আশ্রয় খুঁজে নেয়। অনেক সময় সামনে যা পায় তাই বেয়ে ওঠে। এখানেও কিশোর দেওরের শূন্য স্থান পূরণ করলেন বৃদ্ধ শ্বশুর। তাঁর আরো কাছটিতে সরে এল ফুলি। তিনিও এই মেয়েটির মধ্যে তাঁর প্রবাসী, চঞ্চল কিশোর পুত্রটিকে অনেকখানি ফিরে পেলেন।

মনোরমা এ বাড়িতে পা দিয়েই এখানকার বৃহত্তর সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আগের দিনের মত স্বামীকে সব দিক থেকে ঘিরে থাকা সম্ভব হয় নি। একটু দূরে পড়ে গিয়েছিলেন। মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল বৌ। প্রথম দিকে অনেকটা সেতুবন্ধনের মত। শুধু একটা সরু যোগাযোগ। ক্রমশঃ টের পাচ্ছিলেন, তিনি যেন একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হত, কী হবে এসব করে? এ তো ভূতের ব্যাগার খাটা। আসল কাজ ফেলে শুধু পরের চরকায় তেল দিয়ে চলেছেন। কবে বৌটা বড় হবে, নিজের ঘর-সংসার বুঝে নিতে শিখবে! কিন্তু সেদিকে যেন ওর মন নেই। এবার থেকে একটু একটু করে টানতে হবে। ওকে এদিকে এনে, তিনি গিয়ে বসবেন ওখানে। ওঁর কখন কী প্রয়োজন, কী চায় ওঁর মন, ঐ এক ফোঁটা মেয়ে তার কী জানে?

মনোরমার মনে মনে যখন এই রকম একটা জল্পনা চলছিল, তখন বোধ হয় তাঁর ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। কিছুদিন পরেই মুক্তির বদলে পাঠিয়ে দিলেন নতুন বন্ধন। যে হাত দুটো একটু অবসর খুঁজছিল, তারা আরো বেশী করে বাঁধা পড়ে গেল।

মনোরমার কোলে এল নীতীশ।

সেই নীতীশ আজ ন বছরে পড়ল। দিন যায় না, যেন জল যায়। ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন মনোরমা, আর সেই পুরনো দিনগুলো তাঁর চোখের উপর ভেসে ওঠে। তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্দিন। বহু ঝড়ঝঞ্ঝাই তো সইতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তার চেয়ে বড় ঝড় আসে নি। তেমন করে আর কখনো ভেঙে পড়েন নি। আর যে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবেন, একবারও মনে হয় নি। তবু উঠেছেন, উঠতে হয়েছে। সংসারের প্রয়োজন বড় কঠোর।

কোলে চার মাসের শিশু। স্বামী চলে গেলেন। প্রাণ ভরে দুটো দিন সেবা করবেন, সে সুযোগও দিলেন না। কারো উপরে কোনোদিন নির্ভর করেন নি। নিজের সমস্ত ভার একা বয়ে গেছেন। মৃত্যু যখন শিয়রে দাঁড়িয়ে, তখনো তাঁর সেই পণ অটুট রইল।

মাত্র আটটি দিন পড়ে ছিলেন বিছানায়। রাত্রে জ্বর এসেছিল। ভোরবেলা তাই নিয়েই বেরিয়েছিলেন। পাশের গ্রামে একটি কঠিন রুগী ছিল। তার স্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছিলেন, সকালেই একবার দেখে আসবেন। পাছে মনোরমা বাধা দেন, তাই নিজের রোগের খবরটা তাঁর কাছেও গোপন রেখেছিলেন। ফিরবার পথে চেপে এল বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতে এলেন। কাপড়জামা ছেড়েই শুয়ে পড়লেন। ফুলির কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলেন মনোরমা। গায় হাত দিয়ে দেখলেন, হাত রাখা যায় না। সে জ্বর আর কমলো না। তার সঙ্গে আরো উপসর্গ দেখা দিল—সর্দি-কাশি, বুকে ব্যথা। পুরনো ঘি মালিশ করে আকন্দ-পাতার সেঁক দিলেন। ওঁর কাছে জেনে নিয়ে ওষুধও দিলেন দিনে তিনবার করে। বিশেষ কোনো উপকার দেখা গেল না।

দুদিন দেখে হরিশ পাশের গ্রাম থেকে বড় কবিরাজ নিয়ে এল। তিনিও কিছুই করতে পারলেন না।

রোগের গতি দেখে রোগী নিজেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর শেষ আসন্ন। মনোরমা যখনই এসে বিছানার পাশে বসতেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত কী যেন বলতে চান, পারছেন না। মুখময় দুশ্চিন্তার ছায়া।

একদিন, ঘরে কেউ ছিল না। মনোরমা স্বামীর কপালে হাত রেখে বললেন—কী ভাবছ, আমায় বলবে না?

—বলবার আমার মুখ নেই, মেজবৌ—ক্লিষ্ট কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন শ্যামাচরণ।

—সে কী কথা! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মনোরমা।

শ্যামাচরণ দরজার দিকে চেয়ে বললেন—বাচ্চাটা কোথায়?

—বড় ঘরে ঘুমুচ্ছে। নিয়ে আসবো?

—না, থাক; বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন শ্যামাচরণ। তারপর অতি মৃদু স্বরে থেমে থেমে বললেন—শেষ সময়ে তোমার ওপর কত বড় গুরুভার চাপিয়ে গেলাম! এ শুধু আমার ভাবনা নয়, লজ্জা।

—ও কথা বলো না—, আর্তকণ্ঠে এই কটি কথা উচ্চারণ করেই মনোরমা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চেপে আবার তেমনি ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন। দু হাত দিয়ে স্বামীর সামনে শিশুটিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—ওকে তুমি আশীর্বাদ কর। কে বললে ও আমার ভার! ও তোমার বর, তোমার শেষ চিহ্ন।

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

॥ ৭ ॥

'বড় ঘরে' খোলা কপাটের আড়ালে পিতলের পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। তার নীচে শীতলপাটির আসন পেতে নীতীশ দুলে দুলে মুখস্থ করছিল—খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং···

পাঠশালার পাঠ নয়, গণেশের ধ্যান। পরের শব্দটা যেমন লম্বা তেমন কটমট। বার বার চেষ্টা করেও সবটা একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পারছিল না। অথচ বড়দা বলে দিয়েছেন, টুকরো টুকরো করে বললে চলবে না, এক-একটা পদ একটানা বলে যেতে হবে। সেই চেষ্টাই করছিল নীতীশ। কিন্তু খানিকটা গিয়েই থেমে যেতে হচ্ছিল। 'প্রস্যন্দনমদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং'—এতগুলো কথা তার ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের পরিধির মধ্যে কিছুতেই ধরা দিতে চাইছিল না।

হরিশ বারান্দায় বসে উরুতের উপর নাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাটের সুতলি পাকাচ্ছিল। কান ছিল ঘরের মধ্যে। ছোট ভাই-এর এই সংস্কৃত পাঠের ব্যবস্থা তারই।

সংস্কৃত শেখা বলতে যা বোঝায় এ তা নয়, ব্যাকরণাদির বালাই নেই। শুধু কতকগুলো মন্ত্র মুখস্থ করা, পুজোপাটে যেটুকু প্রয়োজন। তাছাড়া আর কী করবে এই ছেলে? জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে 'মূল গাছটিকে' খেয়ে বসে আছে! এখানে যদি কোনো ইস্কুল থাকত, যেমন কৈজুড়িতে ছিল, তাহলে না হয় সেখানে যতদিন চলে যাতায়াত করতে পারত। পাশের গ্রামে একটা পাঠশালা ছিল, নিম্ন প্রাইমারী পর্যন্ত তার দৌড়। পাড়ার একটি নমঃশূদ্র ছেলের সঙ্গে সেই ইস্কুলে পড়তে যেত নীতীশ। তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তারপর বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আর 'একপাল চাষার ছেলের' সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলা—এ ছাড়া আর কাজটা কী? কিন্তু এমনি করে তো দিন যাবে না। বাপের অবর্তমানে বড় ভাই-এর একটা দায়িত্ব আছে। প্রথমটা হরিশের ইচ্ছা ছিল, ও চাষবাসের কাজ দেখতে শিখুক, রোজ সকালে তার সঙ্গে মাঠে বেরোতে শুরু করুক। তারপর কি মনে করে সে দিকে না গিয়ে কৌলিক বৃত্তিতে হাতেখড়ি দেবার বন্দোবস্ত করেছে।

ছোট ভাই-এর ভবিষ্যৎটাও মোটামুটি ভেবে রেখেছিল হরিশ। এ গ্রামে জলচল লোকের সংখ্যা যদিও খুব কম, পাশের গ্রামটা বৈদ্যপ্রধান। সেখানে কিছু

যজমান জুটতে পারে। আর একটু দূরে গেলে বেশ কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু কায়স্থ রয়েছে। তাদের যদি বাগানো যায় সংসারে কিছু অর্থাগমের সম্ভাবনা রইল। বাবার মৃত্যুর পর এইখানটিতেই ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। নগদ পয়সার বড় প্রয়োজন। খাওয়াটা সচ্ছলভাবে চলে গেলেও, পরা আছে, পান-তামাক, লোক-লৌকিকতা আছে। নুন-হলুদ, দু-চারটা মশলাপাতি কিনতে হয়। সে সব আসে কোত্থেকে ?

হরিশের পরিকল্পনায় মেজো ভাই-এর স্থানটাও গৌণ ছিল না। গত বছর সে 'এন্ট্রেন্স' পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। পিসীমার এক ছেলে মহকুমা শহরে মোক্তারি করেন। তার বাসায় থাকে। তিনি চেষ্টা করে 'ফ্রী'র ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাকী খরচও পিসীমা বহন করেন। ওখানে থেকেই বি. এ. পর্যন্ত পড়তে পারবে। ছেলেটা পড়াশুনোয় ভালো। পাস করে যাবে। একটা চাকরি-বাকরিও জুটে যাবে নিশ্চয়ই। তখন কিছু কিছু দিতে পারবে সংসারে। কিন্তু তার এখনো বছর পাঁচ-ছয় দেরি। তার আগে ছোটটা দু-চার আনা যা পারে, আনুক।

খানিকটা এগিয়ে নীতীশ বার বার আটকে যাচ্ছে লক্ষ্য করে হরিশের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল—কী হল ?

সাড়া না পেয়ে আরেকটু গলা চড়াল—এদিকে নিয়ে আয়।

নীতু ভয়ে ভয়ে বইখানা হাতে করে ধীরে ধীরে দাদার কাছে এসে দাঁড়াল। দেবদেবীর ধ্যান তার মোটামুটি মুখস্থ। ঠিক এ বয়সে নয়, এর চেয়ে যখন কয়েক বছরের বড়, বাবা তাকে মুখে মুখে আবৃত্তি করতে শেখাতেন। অনেক যত্নে, বহু সময় নিয়ে একটু একটু করে এগোতেন, উচ্চারণের জড়তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতেন। আরো পরে সঙ্গে করে যজমানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ক্রিয়াকর্মে পাঠ দিতেন। তারপর একদিন সব সড়গড় হয়ে গিয়েছিল।

নীতু এসে দাঁড়াতেই ধমকের সুরে বলল—গোড়া থেকে বল।

নীতীশের বুকের ভিতরটা তখন ধড়াস ধড়াস করতে শুরু করেছে, গলায় স্বর ফুটছে না। কোনো রকমে 'সুন্দরং' পর্যন্ত এসে থেমে গেল।

—তারপর ? প্রায় গর্জে উঠল হরিশ। নীতু নিরুত্তর।

—কাল যে কতবার করে বলে দিলাম, কান ছিল কোথায় ? আচ্ছা আরেকবার শোন্......

বলে গড়গড় করে আউড়ে গেল—প্রস্যন্দনমদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং।

নীতীশ দাদাকে অনুসরণ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না।

হরিশ উঠে এসে তার গালের উপর সশব্দে চড় কষিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলল—লেখাপড়া করে কী হবে ? যাও ঐ কেষ্টার সঙ্গে মাঠেঘাটে গরু চরাও গে !

ফিরে এসে নাটাই তুলে নিয়ে নিজের মনে গজগজ করতে লাগল—জানি, কিচ্ছু হবে না। চাষার ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে চাষা হয়ে গেছে হতভাগা। তা না হলে বামুনের ছেলের মুখে মন্তর উচ্চারণ হবে না !

নীতিশ কাঁদল না, অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। গালটা পুড়ে যাচ্ছিল, সেখানেও একবার হাত দিল না।

ফুলি রান্নাঘর থেকে কি কাজে ঘরে এসেছিল। চড়ের শব্দটা তার কানে গিয়েছিল। ছুটে এসে দেখল, নীতু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে কান্না রোধ করবার চেষ্টা করছে। কোনো কথা না বলে দেওরের হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেল। যাবার আগে স্বামীর দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ছাড়ল না। হরিশ আড়চোখে সেটি দেখল। বাধা দিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিরস্ত করল। বৌকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। জানত কিছু বলতে গেলেই সে অনেক কিছু শুনিয়ে দেবে। তবু ছোট ভাইএর কাছে একেবারে হতমান হতেও পারে না। তাই ফুলি যখন বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেছে, পিছন থেকে বলল—ওকে আবার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? পড়া করবে কখন?

ফুলি বোধ হয় সে কথায় কান দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। যেন শুনতে পায় নি, এমনি ভাবে নীতুকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল রান্নাঘরে মনোরমার কাছে। একেবারে উনুনের ধারে নিয়ে গিয়ে বলল—দ্যাখ, কী রকম করে মেরেছে ছেলেটাকে!

মনোরমা কড়াতে কি একটা চাপিয়েছিলেন। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন—পড়া বলতে না পারলে একটু-আধটু মারধোর খেতে হবে বৈকি।

—তাই বলে এমন করে মারবে!

হিমি সেখানেই ছিল। দিদিমাকে টুকটাক সাহায্য করছিল। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে উনুনের আলোয় গালটা ভালো করে দেখে বলল—ঈস্, পাঁচটা আঙুল একেবারে বসে গেছে!

মনোরমা কোনো কথা না বলে ভ্রুকুঞ্চিত করে নাতনীর মুখের পানে একবার তাকালেন। সে মাথা নীচু করে সরে গেল।

নীতু এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মনোরমা বললেন—এই তো, এটা নামলেই খেতে দেবো। ততক্ষণে আর একটু পড়ে আয়।

—থাক্, আর পড়তে হবে না। যেন রায় দিচ্ছে, এমনিভাবে বলল ফুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওরকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

পুত্রবধূর এইজাতীয় মেজাজের সঙ্গে মনোরমার পরিচয় ছিল। অন্য সময় হলে মুখ টিপে হাসতেন, হিমি যেমন হাসল এবং তার সঙ্গে ছোট্ট একটা মন্তব্য করল—বড়মামার কপালে আজ দুঃখ আছে, কিন্তু মনোরমা আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন।

উনুনে বসানো তরকারিটা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবার ঘন ঘন খুনতি চালিয়ে কড়াটা নামিয়ে কাঁসিতে ঢালতে ঢালতে বললেন—তোর মামীকে ডেকে ওদের দুভাইকে আর ক্ষুদেকে খেতে দিতে বল। তোরাও খেয়ে নে। রাত করিস নে। বলে, উঠে পড়লেন।

ক্ষুদে অর্থাৎ ক্ষুদিরাম, বাড়ির চাকর। গোরুবাছুর দেখাশুনো করে, মাঠের কাজেও সাহায্য করে।

হিমি দিদিমার দিকে চেয়ে তাঁর এই ভাবান্তরটা লক্ষ্য করল। কিন্তু কারণটা ঠিক ধরতে পারল না। মামীকে ডাকতে চলে গেল।

ফুলি উপযুক্ত হবার পর থেকে আঁশ হেঁসেলের ভার সে-ই নিয়ে নিয়েছিল। মনোরমা দুপুরবেলা নিরামিষ রান্নাগুলো করতেন, রাত্রে আর এদিকটায় আসতেন না। এক মুশকিল ছিল নীতুকে নিয়ে। সে মাছ খেত না, আমিষের ছোঁয়াও খেতে চাইত না। দুপুরের খাওয়াটা 'হবিষ্যি ঘরে'* মায়ের পাশে বসেই চলত। গোল বাধত রাতের বেলা। তাঁকে এসে ছেলেকে আলাদা বসিয়ে খাওয়াতে হত। যখন আরো ছোট ছিল, কেউ যদি জানতে চাইত, মাছ খাও না কেন? নীতু বলত, আমি বিধবার ছেলে। একটু বড় হবার পর সেকথা আর বলে না বটে, কিন্তু আমিষ রান্না ছোঁয় না। হরিশ তাই নিয়ে বকাবকি করত। বলত, মাছ না খেলে মাথায় ঘিলু হবে কোত্থেকে? কখনো বলত, চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। মনোরমাও চেষ্টা করতেন, আস্তে আস্তে একটু একটু করে আমিষ ধরাবার জন্যে। তা ছাড়া খাবেই বা কী? ও অঞ্চলে মাছই প্রধান, বলতে গেলে একমাত্র খাদ্য। কিন্তু নীতু কিছুতেই ওদিকে ভিড়ত না। বলত—মাছের গন্ধে আমার বমি আসে মা।

সম্প্রতি কিছুদিন থেকে মনোরমা আবার দুবেলাই রান্নার দিকে আসতে শুরু করেছেন। বৌ-এর সন্তান হবে। আট মাসে পড়ল। আগুন-তাতে বড় একটা আসতে দেন না। সংসারের অন্যান্য কাজকর্মও কম নয়। সেদিকে কিছুটা সামলাবার জন্যে হিমিকে আনিয়ে নিয়েছেন। উমাই গরজ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার সংসারের ঝামেলা অনেক কম। কোলের ছেলেটিও বড় হয়ে গেছে। মাকে বলে পাঠিয়েছে, ও তোমার কাছেই থাক।

উত্তর পোতার 'বড় ঘর' ছেলে-বৌকে ছেড়ে দিয়েছিলেন মনোরমা। পুবের ভিটের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকেন। হিমিও সেখানে শোয়। তার পিছনের বারন্দায় গিয়ে বসলেন। নীতুর পড়াশুনো উপলক্ষ করে পুরনো দিনের অনেক কথা তাঁর বুকের মধ্যে ঠেলে উঠেছিল। কিছুক্ষণ একা থাকবার প্রয়োজনবোধ করছিলেন।

স্বামীর রোগশয্যার শেষ কটা দিন মনোরমা তাঁর ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। বাচ্চাটাকেও তাঁর বিছানার একপাশে শুইয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে বাইরে না গেলে চলত না। একদিন ফিরে এসে দেখলেন, শ্যামাচরণ ছেলের ছোট্ট মুঠিটা খুলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। আয়ুর্বেদের সঙ্গে সামান্য কিছু জ্যোতিষ-চর্চাও করতেন একসময়। মনোরমার জানা ছিল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলেন।

মুখ তুলে স্ত্রীর কৌতূহলদীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে শ্যামাচরণ বললেন—কিছুই বোঝা যায় না। কোনো রেখাই ফোটেনি। তবে কপালের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, এ সাধারণ ছেলে নয়, একদিন অনেক বড় হবে।

---

* বিধবাদের জন্ত নির্দিষ্ট নিরামিষ রান্নার ঘর।

—আশীর্বাদ করো তাই যেন হয়, অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন মনোরমা।

শ্যামাচরণের বুকের অন্তস্তল থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন—পার তো ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা ক'রো। আমরা যা শিখেছি, তা নয়। একালের যে শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা।

বলতে বলতে কথাগুলো মিলিয়ে গেল। তারপর একটু মৃদু নিঃশ্বাস, এবং তার সঙ্গে হতাশাভরা স্বগতোক্তি—কেমন করে পারবে? তার কোনো ব্যবস্থাই রেখে যেতে পারলাম না।

এসব কথা শুনলে মনোরমার দু চোখ ফেটে জল আসত। কিন্তু স্বামীকে তার আভাসটুকুও জানতে দিতেন না। সেদিনও বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সুদৃঢ় আশ্বাসের সুরে বললেন—ওগো, তুমি কিছু ভেবো না। আমি যেমন করে পারি ওকে লেখাপড়া শেখাবো।

সেই আশ্বাসের কোনো মর্যাদাই রাখতে পারেন নি মনোরমা। পাঠশালার পড়া শেষ করে ছেলে ঘরে বসে আছে। মেধাবী, বুদ্ধিমান ছেলে। বৃদ্ধ পণ্ডিত নিজে এসে জানিয়ে গেছেন। বলেছেন—সারাজীবন ধরে কত ছেলেই তো পড়ালাম মা। এরকম আর একটিও দেখি নি। হীরের টুকরো ছেলে।

মনোরমা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন, তা নয়। এখানে তাঁদের সহায় বলতে এক শশী বিশ্বাস। তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন। সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলেছিলেন—আমার এই ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দিন, বিশ্বাস মশায়।

বিশ্বাস পাকা লোক। মিথ্যা স্তোক দিয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে ভোলাবার চেষ্টা করেন নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—আচ্ছা মা, আমি চেষ্টা করে দেখি। বামুনের ছেলে, তার ওপরে বড্ড ছোট। যেখানে সেখানে তো রাখিয়ে দেওয়া যায় না।

বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল। বিশ্বাস কোনো খবর নিয়ে আসেন নি। এদিকে হরিশ যে ব্যবস্থা করেছিল, মনোরমার মনঃপূত নয়। তাছাড়া স্বামীর শেষ ইচ্ছাও তিনি জানেন। এই সন্তানটি তাঁর নিজের বৃত্তি গ্রহণ করবে—এটা তিনি একেবারেই চান নি। বেঁচে থাকলে তিনি যেমন করেই হোক একে ইংরেজি স্কুলে পাঠাতেন। কিন্তু হরিশকে একথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা। বুঝলেও তার সে ইচ্ছা, সঙ্গতি বা সামর্থ্য কোনোটাই নেই। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া মনোরমার আর কোনো উপায় ছিল না।

অমূল্য মাঝে মাঝে আসত। এইটুকু ছেলেকে, তার ভাষায় 'ধরে বেঁধে পুরুত বানাবার' যে নিষ্ঠুর আয়োজন চলছে, তার একেবারে পছন্দ হয় নি। কিন্তু সম্বন্ধীর উপর কথা বলবে সে কোন্ অধিকারে? হরিশই এখন সংসারের কর্তা। তাছাড়া ছোট শ্যালকের জন্য অন্য কোনো বন্দোবস্তও সে করতে পারছে না। তাদের অঞ্চলে একটা মাইনর স্কুল আছে বটে, কিন্তু অনেকখানি দূরে, তিন মাইলের কম নয়। অতটুকু ছেলের পক্ষে যাওয়া আসা কষ্টকর, বিশেষ করে

বর্ষার কয়েক মাস, যখন পথঘাট সব জলে ডুবে যায়। তাদের গ্রাম থেকে তিন-চারটি ছেলে ঐ স্কুলেই পড়তে যায়। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া নীতুর চেয়ে তারা বয়সেও বেশ কিছুটা বড়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীতুও এই পথের কষ্ট পুরোপুরি এড়াতে পারল না।

শশী বিশ্বাস দুটি আশ্রয়ের খবর নিয়ে এলেন। একটি, যে উকিলের সেরেস্তায় তিনি মুহুরিগিরি করেন, তাঁর বাসায়। মহকুমা শহর নয়, 'চৌকি', অর্থাৎ শুধু দেওয়ানি আদালত আছে, তিনজন মুনসেফ্ বসেন সেখানে। এস. ডি. ও. নেই। ফৌজদারী কোর্টও নেই। থানা, হাইস্কুল, বাজার—এই নিয়ে একটি গঞ্জ। স্কুলটি ভাল এবং উকিলবাবুর বাসা থেকে এত কাছে যে ডাক দিলে শোনা যায়, কিন্তু উকিলবাবুটি কায়স্থ। নীতীশকে রান্না করে খেতে হবে। তার 'যোগাড়-যন্তর' অবশ্য বাড়ির মেয়েরাই করে দেবেন, শুধু দুটি চাল ফুটিয়ে নামিয়ে নেওয়া।

এই শেষ তথ্যটি সকলের শেষে পরিবেশন করলেন বিশ্বাস মশাই। আগের বর্ণনাগুলো যখন দিচ্ছিলেন, মনোরমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, 'কায়স্থ' শুনে একেবারে দমে গেলেন। ও ছেলে যে এক ঘটি জলও গড়িয়ে খেতে জানে না ; রান্না করবে কেমন করে! প্রথম দিনই হাত-পা পুড়িয়ে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে।

বিশ্বাস বললেন—সে কথা আমিও ভেবেছি। এখনো বড্ড ছোট আর আপনি তো ওকে তেমন করে মানুষ করেন নি ।······আমি আরেকটা খোঁজও নিয়ে এসেছি। এঁরা ব্রাহ্মণ। অবস্থাও মোটামুটি ভালো। যত্ন করে রাখবে। জায়গাটা কিন্তু এই আমাদেরই মত পাড়াগাঁ, আর হাই ইস্কুল নয়, মাইনর ইস্কুল।

—তা হোক, খুশী হয়ে বললেন মনোরমা, গ্রামের মধ্যেই তো?

—না, ঠিক গ্রামের মধ্যে নয়, পাশের গ্রামে। কাছেই ; মাঝখানে একটা মাঠ। অনেক ছেলেপিলে পড়তে যায়। সঙ্গীসাথীর অভাব হবে না। তবে জায়গাটা এখান থেকে একটু দূরে পড়বে। দিনমানের পথ।

মনোরমা এ সুযোগ হারাতে পারেন না। তবু সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারলেন না, আপনি ঠিক করে ফেলুন বিশ্বাস মশায়। সহসা একটু যেন আনমনা হয়ে গেলেন। মুখের উপর একটি ম্লান ছায়া ঘনিয়ে উঠল। কোলের ছেলেটাও অত দূরে চলে যাবে! মা ছাড়া যার একটা বেলা চলে না, থাকতে পারবে তো? তিনিই বা কী নিয়ে থাকবেন? স্বর্গত স্বামীর শেষ চিহ্ন এই এক ফোঁটা নীতু, যাকে বুকে করে সব কিছু ভুলে আছেন!

শশী বিশ্বাস তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় তাঁর চিন্তাধারার একটু আভাস পেলেন। বললেন—সেজন্যে আপনি ভাববেন না মা। আমি সঙ্গে করে নিয়ে রেখে আসবো। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখেও আসতে পারবো। পুজো বা গরমের ছুটিতে আমি না পারলে আমার ছেলেরা কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে। ওদের মামাবাড়ির দেশ তো।

—তাই নাকি! আঁকড়ে ধরার মত একটা কিছু যেন পেয়ে গেলেন মনোরমা। তাঁর চোখেমুখে অনেকখানি ভরসার ঔজ্জ্বল্য ফিরে এল।

বিশ্বাস হেসে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। কটা বাড়ি পরেই। আমার শালা-ই সব ঠিকঠাক করে চিঠি দিয়েছে।

'নতুন দেশে' এল নীতীশ। একেবারে আলাদা চেহারা। জন্মাবার পর থেকে এতদিন ধরে দেখে এসেছে চারদিকে শুধু বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, তাকে ঘিরে ঘন কালো ছায়া। এদেশে এসে দেখল মাঠ আর মাঠ, এখানে-সেখানে খাল নালা বিল বাওড়। বাড়িগুলো ফাঁকা ফাঁকা, যেন এক-একটা ঢিবির উপর কতকগুলো টিন আর খড়ের ঘরের জটলা। বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। বাগ-বাগিচার বালাই নেই। এখানে-ওখানে দু-চারটা গাছপালা। আকাশ যে এত কাছে, চোখ মেললেই তার সবখানি দেখা যায়, নীতীশের জানা ছিল না। এত অঢেল আলোও সে কোনো দিন দেখে নি। চারদিকের এই অবাধ খোলামেলার মধ্যে প্রথম প্রথম তার কেমন ভয় ভয় করত। কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে মনে হত, সে বুঝি হারিয়ে গেছে।

এখানকার লোকগুলোও অদ্ভুত। বড় বেশী চেঁচিয়ে কথা বলে। কোনো কোনো কথার উপর এমন একটা ধাক্কা দেয়, মনে হয় মারতে এল বুঝি। প্রথম কিছুদিন নীতীশ নিজের অজান্তে চমকে উঠত। তারপর দেখল ওদের সব কিছুতেই জোর। গলায় জোর, গায়ের জোর এবং সকলের উপরে প্রাণের জোর।

নীতীশ একেবারে ছোট থেকেই একা। বাড়িতে তার কোনো সঙ্গীসাথী ছিল না। বাইরে এক দেবা ছাড়া কারো সঙ্গে মিশতে পেত না। সেও ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড় আর বড় বেশী ঠাণ্ডা নিরীহ, কেমন যেন গম্ভীর, যদিও তাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলত। সে যে চাষী-গৃহস্থের ছেলে—হরিশ যাদের বলত চাষাভুষো—সেটা কখনো ভুলত না। হরিশও সর্বদা সজাগ ছিল, ছোট জাতের ছেলেপিলের সংসর্গে পড়ে ছোট ভাইটা বিগড়ে না যায়। তার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান কিছুটা উগ্র এবং সেটা প্রবলভাবে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করত না। আশপাশের লোকেরাও সেটা সবিনয়ে মেনে নিয়েছিল।

একা থেকে থেকে নীতীশের স্বভাবটাও বড় কুনো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভীষণ মুখচোরা, খানিকটা ভীরু এবং বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত শান্ত। জঙ্গলে জঙ্গলে আপন মনে ঘুরে বেড়াত, মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে থাকত। মনোরমা লক্ষ্য করতেন, মনে মনে হাসতেন,—একেবারে হুবহু 'তাঁর' স্বভাব পেয়েছে। আবার ভয়ও হত, এ তো ভালো লক্ষণ নয়; যে বয়সের যা। ছেলেকে ডেকে বলতেন—ওখানে বসে কী করছিস? খেলগে যা।

কিন্তু কী খেলবে নীতু? কার সঙ্গেই বা খেলবে? কোনো খেলাই সে জানত না।

এই নটখোলার ছেলেগুলো তাকে জোর করে টেনে নিয়ে দলের মধ্যে নামিয়ে দিল। এরা 'চাষাভূষো' নয় 'বামুন কায়েত বদ্যি' ঘরের ছেলে। তাকে সমীহ

করে চলবার কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া তাদের স্বভাবের মধ্যেও এমন একটা জোয়ার ছিল, যার টানে নীতুকে তার সেই নিজস্ব নির্জন কোণটুকু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল।

নটখোলা এবং তার আশেপাশে তখন নতুন ফুটবল এসেছে। বড়রা তাই নিয়ে মেতে উঠেছেন। স্কুলেও সেটা উপরের ক্লাসের ছেলেদের দখলে। ছোটদের সম্বল তার ন্যাকড়া-সংস্করণ কিংবা চুরি করে পেড়ে আনা বাতাবি নেবু। নীতুকে তার মধ্যে ভিড়ে যেতে হল। কিন্তু সে যে একেবারেই আনাড়ি। তাছাড়া হাত-পায়ের জড়তা কি দু-এক দিনেই কাটে?

—যা, তোকে নিয়ে খেলবো না। তুই কিচ্ছু জানিস না, রায় দিয়ে দিল দলের সর্দার।

আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে আপীল দায়ের করল—বা রে, ও বুঝি খেলেছে কোনো দিন? বাঙাল দেশে কেউ ফুটবলের নামই শোনে নি।

—তাই নাকি! ওখানে তাহলে কী খেলতিস?

'বাঙাল দেশ' কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ছিল। সেটা নীতীশের অভিমানে গিয়ে লাগল। গম্ভীরভাবে বলল—ড্যাংগুলি।

ছেলের দলে হাসির রোল পড়ে গেল। নীতীশ তখনো জানে না, ও খেলাটার জাত অতি ছোট, ভদ্রসমাজে চলে না।

নীতীশের কথার মধ্যে যে 'উত্তুরে' টান ছিল, তার থেকেই ওরা তাকে 'বাঙাল' আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু ওদের কথাতেও যে 'দক্ষিণী' ধাক্কা! সেটা বুঝি খুব মিষ্টি? একটু পুরনো হবার পর সেও পালটা আঘাত করতে ছাড়ত না। বলত—তোরা তো দক্ষিণী ভূত!

আরো কিছুদিন কাটবার পর এই 'উত্তর-দক্ষিণে'র ঝগড়াটা দু-তরফ থেকেই বন্ধ হয়ে এল। কখনো ক্বচিৎ উঠলেও তার মধ্যে কোনো হুল থাকত না। ওটা তখন নিছক হাসি-তামাশার দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতীশও বুঝতে শিখেছে তাদের ভাজনকাঁদি আর এদের এই নটখোলা একই দেশ। এমন কি, জেলাটাও এক।

কিন্তু তখনো জানতে বাকী ছিল, এই 'বাঙাল' অভিধাটি তাকে আরেকবার ধারণ করতে হবে, যেদিন মায়ের মুখে শোনা আড়িয়াল খাঁর চেয়েও বড় এবং দুর্দান্ত নদী, পদ্মা পাড়ি দিয়ে, এবং যে রেলগাড়ির সে নাম শুনেছে মাত্র কিন্তু চেহারার খসড়াটাও মনে মনে গড়ে তুলতে পারে নি, সেই বিচিত্র যানে চড়ে একদিন এমন এক অচেনা বিদেশ-ভূমির বিশাল শহরে গিয়ে উঠতে হবে, যেখানে সে-ই তার বংশের প্রথম পর্যটক, তার ভাজনকাঁদির প্রথম প্রতিনিধি।

তারপর 'একদা কী করিয়া' সেই 'বিদেশে'র সবখানি 'বি' নীতীশের কাছে লুপ্ত হয়ে যাবে। যে অজানা নগরীর উপকণ্ঠে একদিন সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভীরু কম্পিত বক্ষে, দু-চোখ ভরা আসন্ন যৌবনের বিস্ময় নিয়ে, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সে তার স্বদেশ-ভূমির চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ রূপ নিয়ে দেখা দেবে। নাড়ির বন্ধন গড়ে উঠবে তার সঙ্গে। তার স্বর্গত পিতার জীবনে আড়িয়াল খাঁ

যে স্থান অধিকার করেছিল, তার জীবনে সেই স্থান নেবে ভাগীরথী।

সেদিন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে নীতীশ, তার শৈশবের ভাজনকাঁদি এবং কৈশোরের নটখোলা দূর দিগন্তের আবছায়া অন্তরালে মিশিয়ে যাচ্ছে। তাদের যেন আর চেনা যায় না।

এসব অনেক পরের কথা।

॥ ৮ ॥

পোস্টাফিসটা পাশের গ্রামে। গিরীশ কবিরাজের বৈঠকখানার হাতকয়েক জায়গা হোগলা পাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই খোপটির মধ্যেই সব। সেখানে বসে পোস্টমাস্টার (গ্রামের পাঠশালার একমাত্র মাস্টারও তিনি) ডাক খোলেন, বাঁধেন, খাম পোস্টকার্ড বেচেন এবং সুযোগমত চিঠি বিলি করেন। অর্থাৎ যার নামে চিঠি তার গ্রামের বা কাছাকাছি গ্রামের কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—ছেলে, বুড়ো বা মেয়েছেলে, যে রকম লোকই হোক—তার হাতে গছিয়ে দেন। তার পর কতদিনে কেমন করে সেটা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবে, তা নিয়ে তাঁর ভাবনা নেই। তবে যতদিনে যত হাত ঘুরেই হোক, পৌঁছায় ঠিক।

মনোরমার হাতেও পৌঁছেছিল। নীতুর চিঠি। তার নিজের হাতের লেখা। এর আগে সে কোনো দিন কাউকে চিঠি লেখে নি। মনোরমাও কোনো দিন কারো কাছ থেকে চিঠি পান নি। যতীশের চিঠি আসত কালে-ভদ্রে; তার দাদার নামে লেখা। তখনকার দিনে সেইটাই দস্তুর। শেষের দিকে থাকত—'মাকে আমার প্রণাম জানাইবেন'। অন্যান্য যা থাকত, তাও তিনি জানতে পারতেন। কিন্তু চিঠি আর তার বিষয়বস্তু তো এক জিনিস নয়। মনোরমার ইচ্ছা হত প্রবাসী ছেলের নিজের কথাগুলো একবার শোনেন, যা সে কাছে বসে নিজের মুখে বলতে পারে নি, দূর থেকে কলমের মুখে বলেছে। পোস্টকার্ডখানা হাতে করে হরিশ বসে যখন জানাত, যতের চিঠি এসেছে, পরীক্ষায় পাস করেছে, ভালো আছে; কখনো কখনো সসংকোচে হাসিমুখে বলে ফেলতেন—পড় না, কী লিখেছে!

হরিশ বিরক্ত হত—পড়বো আবার কী! শুনলে তো কী লিখেছে।

মনোরমা একটা নিঃশ্বাস চেপে চুপ করে যেতেন।

নীতু কি মায়ের সেই নীরব দুঃখটুকু বুঝতে পেরেছিল? হয়তো পেরেছিল, এবং সেই জন্যে কিংবা অন্য কোনো কারণে সেই জানে, তার জীবনের প্রথম চিঠি সে লিখেছিল তার মায়ের নামে। ঠিক নামে নয়, উদ্দেশে—পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু। নীচে ছিল তার দাদার নাম। সে শুধু ঠিকানা।

চিঠিটা এনেছিল দেবা। সে-ই একদিন নীতুকে হাত ধরে নিয়ে যেত পাশের গ্রামের পাঠশালায়। একসঙ্গেই পড়ত, যদিও বয়সে ওর চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। সেখানকার পাট শেষ করে যথানিয়মে বাবার সঙ্গে যখন ক্ষেত-

খামারের কাজে গিয়ে লাগল, নিজের জন্যে তার কোনো ক্ষোভ হয় নি। নিজের সম্পর্কে এর বেশী আর কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। ছিল আরেকজনের জন্যে। বড় রকম কিছু নয়, বড় স্কুলে পড়ে 'বিদ্বান' হবে নীতু, 'বদ্যিদের' ছেলেরা যেমন হয়। এখানকার পড়া হয়ে গেলেই বিদেশে চলে যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঁঠাল পাকলে বাড়ি আসে, পুজোর সময়েও আসে। কী চোখমুখের চেহারা! সকলে বলাবলি করে, অমুক ছেলেটা খুব 'বিদ্বান' হয়েছে! নীতুও তেমনি হবে। তার বদলে যখন তাকেও চাষার ছেলেদের মত বাড়ি বসে থাকতে হল, দেবার মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। তারপর যেদিন শুনল সে বিদেশে পড়তে যাবে সেদিন কী আনন্দ! আনন্দের চেয়ে গর্ব আরো বেশী। নীতু 'বিদ্বান' হবে!

চিঠিখানা ও-পাড়ার কে একজন তার হাতে দিয়ে বলেছিল—ঠাকুরবাড়িতে দিয়ে দিস। দেখিস, হারিয়ে ফেলিস না যেন।

হারিয়ে ফেলবে কী! এক পলক তাকিয়েই সে হাতের লেখাটা চিনতে পেরে-ছিল, এবং তখনই ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গিয়েছিল মনোরমার কাছে—মা ঠাকরুণ, আপনার চিঠি।

—আমার চিঠি! চমকে উঠেছিলেন মনোরমা।

—হ্যাঁ; নীতু লিখেছে আপনাকে। এই দেখুন না?

বলে, শিরোনামাটা পড়ে শুনিয়েছিল। মনোরমা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন, দেবা নমশূদ্রের ছেলে, তার কাছ থেকে হাতে হাতে কিছু নেওয়া যায় না। দেবা ভোলে নি। ভাঁজ করা পোস্টকার্ডখানা সন্তর্পণে দাওয়ার উপর রেখে দিয়েছিল। তিনি সেটা সস্নেহে তুলে নিয়ে, ভাঁজ খুলে নিঃশব্দে এপিঠ-ওপিঠ দেখে নিয়ে বলেছিলেন, তুই পড়তে পারবি?

কেন পারবো না? নীতুর হাতের লেখা!

প্রথমে অনেকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন মনোরমা। চিঠিটা শুনতে শুনতে সে ভাব কেটে গেল। মুখের উপর একটি চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। পড়া শেষ হল। দেবা তখনো তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। বোধ হয় লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে বললেন—আচ্ছা, তুই এখন যা।

চিঠির পিছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস ছিল।

নীতীশ নটখোলা মাইনর স্কুলে ক্লাস থ্রী, অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। হেডমাস্টার তাদের পড়াতেন না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে পড়তেন। হয় তখন অন্য কোনো মাস্টারমশাই ক্লাস নিচ্ছেন, কিংবা যাঁর আসবার কথা আসেন নি। ছেলেরা মনে মনে ইষ্টনাম জপতে থাকত। কাকে কখন কী জিজ্ঞেস করে বসবেন! না বলতে পারলে কিংবা একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। ভীষণ কড়া লোক। অন্য সকলেব মত তিনি বেত ব্যবহার করতেন না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন অস্ত্র ছিল তাঁর হাতে। একটি চড়। তাতেই বড় বড় ছেলেদের ভিরমি লেগে যেত।

সেদিন অমনি কার বদলে এসে পড়েছিলেন। মাস্টার না এলেও 'গোল করার' সুবিধা এখানে বড়ই কম। তবু একটা গুঞ্জরণ চলছিল, এক পলকে স্তব্ধ হয়ে

গেল।

হেডমাস্টার বসলেন না; সেটা তাঁর রীতি নয়, গোটা ক্লাসটায় একবার শুধু চোখ বুলিয়ে নিলেন। সেই অতি পরিচিত শ্যেন দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে থামল নীতীশের মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে কাছে আসবার নীরব ইঙ্গিত। নীতীশ ধীরে ধীরে এগিয়ে এল এবং একটা কঠোর গর্জন শুনে থমকে দাঁড়াল—পড়তে এসেছ, না গুন্ডামি করতে এসেছ?

প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক। তবু পাছে চুপ করে থাকাটা বেয়াদপি বলে মনে করেন হেডমাস্টারমশাই, তাই নীতীশ তৎক্ষণাৎ বলতে যাচ্ছিল—আজ্ঞে স্যর পড়তে, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। তিনি বোধ হয় তার জন্যে অপেক্ষাও করলেন না। গলাটা আর এক পরদা চড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, জামার হাতা কাঁধের ওপর ঠেলে তুলেছিস কেন? এটা কোন্ ফ্যাশান?

নীতীশ নিরুত্তর।

—নাবিয়ে দে…এবার রীতিমত হুঙ্কার দিলেন হেডমাস্টার।

নীতীশ তাঁর আদেশ পালনের কোনো চেষ্টা করল না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। হেডমাস্টার প্রথমটা থ হয়ে গেলেন, নিজের চোখকেই বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরক্ষণেই এগিয়ে এসে বাঁ হাতে অবাধ্য ছাত্রের কানটা ধরে ডান হাত তুলতেই একটি ছেলে বলে উঠল—স্যর, ওর জামা—

ততক্ষণে উদ্যত হাতের থাবাটা বিদ্যুৎ বেগে নেবে এসে অপরাধীর গালের উপর বসে গেছে, এবং সম্ভবতঃ তারই প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে একদিকের গোটানো হাতাটা খুলে পড়েছে।

হেডমাস্টার হঠাৎ থমকে গেলেন। হাতাটা অনেকখানি ছেঁড়া। তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাব দেখা দিল, ছেলেদের চোখে যা একেবারে নতুন।

নীতু তখন ঠোঁট কামড়ে ধরে প্রাণপণে অশ্রুরোধ করবার চেষ্টা করছে, যার পিছনে প্রহারের ব্যথার চেয়ে বেশী বোধ হয় লজ্জা। সেই দিকে একবার তাকালেন হেডমাস্টার, তারপর ধীরে ধীরে অফিসঘরের দিকে চলে গেলেন।

ছুটির পর অন্য সব ছেলেদের থেকে একটু আলাদা হয়ে ফিরছিল নীতীশ। সেই ছেলেটি, যে তার শার্টের হাত গোটাবার ইতিহাস জানত এবং হেডমাস্টার মশাইকে বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিল, পিছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেলে পাশাপাশি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর সে বলল—তোর কাছে পোস্টকার্ড আছে?

—না।

—আমাদের বাড়িতে আছে। সন্ধ্যাবেলা তোকে দিয়ে আসবো।

পোস্টকার্ড দিয়ে কী হবে বুঝতে না পেরে নীতু তার মুখের দিকে তাকাতে নিমাই বলল—বাড়িতে চিঠি লিখে একটা জামা আনিয়ে নে। তা যদি না হয়, একটা টাকা পাঠাতে লিখিস। মথুর সা'র দোকান থেকে কিনে নেওয়া যাবে।

নীতীশ চুপ করে রইল। সে জানে বাড়িতে তার কোনো জামা নেই। এই শার্টটা তার মেজদার। ছোট হয়ে গেছে বলে যতীশ বাড়িতে ফেলে গিয়েছিল, মা

তাকে আসবার সময় পরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনি আর একটাও সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন, এর চেয়ে একটু ভালো। প'রে প'রে যখন পিঠের কাছটা ছিঁড়ে গেল, ফেলে দিতে হয়েছে। টাকাই বা আসবে কোত্থেকে? মার হাতে যা ছিল, এ কমাসের মাইনে দিতে, বই কাগজ কিনতে এতদিনে নিশ্চয়ই ফুরিয়ে গেছে। এখন মাইনে লাগে না। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় সে খুব ভালভাবে পাশ করেছে বলে বিশ্বাস মশায়ের শালার চেষ্টায় 'ফ্রী' হয়ে গেছে। এ মাসে কাগজ পেন্সিলের কয়েক আনা পয়সাও মা দিতে পারেন নি। থার্ডমাস্টার মশাই কোনো একটা ছল করে ওগুলো এনে দিয়েছেন। কিন্তু জামার অবস্থাটা তিনিও জানতে পারেন নি। হয়তো হাত গোটানোটা খেয়াল করেন নি। নিমাইকেও সে কিছু বলে নি। কোনো সময়ে হয়তো দেখে ফেলেছিল।

সন্ধ্যাবেলা নিমাই এল। হাতে একখানা পোস্টকার্ড আর পুরনো খবরের কাগজে মোড়া একটা পুঁটলি। বলল—যদ্দিন জামা বা টাকা না আসে এই শার্টটা পরিস। ঘাড়ের কাছটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। দিদি সেলাই করে দিয়েছে।

নীতু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—না ভাই, ওটা তুই—

—না কেন?

—তুই কী পরবি?

—আমার তো আরেকটা রয়েছে।

—তোর দাদা যদি রাগ করেন?

—দূর বোকা, রাগ করবে কেন? দাদা জানবেই বা কেমন করে? এ শুধু আমি জানি আর দিদি জানে। শোন্, আমার দিদি না তোকে যেতে বলেছে।

নীতুর মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। সে অত্যন্ত মুখচোরা, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। তার চেয়ে সামান্য বড় কোনো অচেনা বা অনাত্মীয়া মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলতেই পারে না। যাদের চেনে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে। বর্ষীয়সী মেয়েরা কাছে ডাকলে ঘেমে নেয়ে ওঠে, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে, তা সে যতই সাধারণ কথা হোক, জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে যায়।

নিমাই বলেছিল—জানিস? আমার দিদির মত সুন্দরী পাড়ায় আর একটি মেয়েও নেই। কিন্তু—

মুখখানা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠেছিল। তার পর একে একে অনেক কথা বলেছিল তার দিদির সম্বন্ধে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে তাকে মারধোর করত, খেতে দিত না, ঘরে বন্ধ করে রেখে দিত। পাড়ার লোকের কাছে খবর পেয়ে দাদা গিয়ে নিয়ে এসেছিল। অনেক দিনের কথা। তখন ওদের মা বেঁচে ছিলেন।

তার পর ওর ভগ্নীপতি কয়েকবার এসেছে, চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করেছে দিদিকে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু দাদা কিছুতেই যেতে দেয় নি। তখন নিমাই খুব ছোট, কিন্তু ওর সব মনে আছে। দিদি যেদিন এল, তার পিঠময় বেতের দাগ; কেটে কেটে বসে গেছে।

তার পর ওদের মা মারা গেছেন। বাবা অনেক আগেই গিয়েছিলেন। ভগ্নীপতি আর আসে নি। সে নাকি আরেকটা বিয়ে করেছে।

নিমাই-এর মুখে এসব কথা কিছুদিন আগেই শুনেছিল নীতীশ। খেলার মাঠের পাশে বাঁশের সাঁকো, সেটা পার হয়ে কিছুদূর গেলে একটা ঝাঁকড়া আম গাছ। তার তলায় বসে বলেছিল নিমাই। সন্ধ্যা হয় হয়, কাছে ধারে কেউ কোথাও নেই, শুধু একপাল গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল পাশের গ্রামের একটা রাখাল ছেলে। একটা কঞ্চি দিয়ে সপাং সপাং করে মারছিল গরুগুলোর পিঠে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল নীতীশ। গরুর পিঠের উপর কেটে বসা দাগগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি।

তার পর একদিন নিমাই-এর দিদিকে দেখল নীতু। সেদিনটা কখনো ভুলবার নয়।

নিমাইদের পাশের বাড়িতে স্কুলের একজন মাস্টারমশাই থাকতেন। থার্ড-মাস্টার যদুবাবু। ওখানকার লোক নন, কুমিল্লা না কোথায় তাঁর বাড়ি। তাঁর অদ্ভুত উচ্চারণ এবং কতগুলো কথা শুনে ছেলেরা আড়ালে হাসাহাসি করত। একদিন খুব মজা হয়েছিল। যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে চোর ঢুকেছিল। উনি কী করে যেন জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে 'চুর' 'চুর' বলে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দেন। পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে প্রথমটা ধরতেই পারে নি কী হয়েছে, কী বলছেন মাস্টারমশাই। পরে বুঝতে পেরে হেসেই কুটপাট, চোর তাড়াবে কী!

থার্ডমাস্টার নীচের দিকে ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর একটা মজার নিয়ম ছিল। কথার মানে শুধু মুখে বললে হত না, বোর্ডে এঁকে দেখাতে হত। কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করলেন—দি হেন্ মানে কী? সে বলল—মুরগীটা। তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন—কোন্ মুরগীটা? দেখছি না তো! বলে চক্ এগিয়ে দিতেন। বেশির ভাগ ছেলেই আঁকতে পারত না। তখন নিজে গিয়ে এঁকে দিতেন। ছেলেরা ভীষণ খুশী।

সেকেন্ডমাস্টার যেদিন আসতেন না, ওঁকে উপরের ক্লাসেও যেতে হত। নীচের ক্লাসে যাঁরা পড়ান, বড় ছেলেরা সাধারণত তাদের একটু তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। কিন্তু ওঁকে সবাই সমীহ করে চলত। কারো গায়ে কোনো দিন হাত তুলতেন না। দরকারও হত না। গলার স্বরটা ছিল মেঘের মত গম্ভীর। বেশী গোলমাল করলে একবার শুধু 'এই' বলে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। চেহারাটাও ছিল দশাসই। তার উপরে মাজা কালো রং। মাস্টারমশাইরা এবং কিছু কিছু পাড়ার লোকে বলত 'কালাপাহাড়'। আড়ালে বললেও নামকরণটা তাঁর অগোচরে ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেও ব্যবহার করতেন। কোনো ব্রাহ্মণ ছেলেকে ধমকাতে গিয়ে বলতেন—বামুনই হও আর দেবতাই হও, কালাপাহাড়ের কাছে কারো খাতির নেই।

স্কুলের গেট পেরিয়ে এলেই থার্ডমাস্টার অন্য মানুষ। বাইরের দিকে যে

খড়ো ঘরটাতে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, ছুটির দিনে সেখানে ছোটদের একটি ছোটখাটো জটলা লেগে থাকত। তিনি তাদের মজার মজার গল্প শোনাতেন, কখনো ম্যাজিক দেখাতেন, আবার কোনো কোনো দিন গম্ভীরভাবে প্রত্যেকের হাত দেখে বলে দিতেন বড় হয়ে কে কী হবে। কাউকে বলতেন তুই রাজা হবি, কাউকে বলতেন তুই হবি গাঁটকাটা।

ভবিষ্যৎবাণীগুলো কারো বেলাতেই দু'দিন একরকম হত না। 'হাতের রেখা' হয়তো বদলাত না। কিন্তু তাঁর রিডিং অর্থাৎ ব্যাখ্যা বা ফলশ্রুতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটত।

যাকে গাঁটকাটার দলে ফেলা হল, সে তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল—বা রে, সেদিন যে বললেন আমি হবো বিদ্যাসাগর?

—বলেছিলাম নাকি? আচ্ছা দে তো, দেখি হাতটা।···নাঃ, ভুল দেখেছিলাম। স্পষ্ট গাঁটকাটার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

সে ছেলে মানবে কেন? রীতিমত চেঁচামেচি বাধিয়ে দিল। তখন একটা রফা করলেন থার্ডমাস্টার। হাতটা আরো একবার দেখে রায় দিলেন, গাঁট কাটতে কাটতে হঠাৎ একদিন বিদ্যাসাগর হয়ে যাবি।

—তা কেমন করে হবে?

—কেন দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হলেন কেমন করে?

থার্ডমাস্টারের ঘর থেকে খালি হাতে কেউ ফিরত না। কোনো দিন দুটো করে কদমা, কোনো দিন একখানা করে চিনির সাজ—হাতি ঘোড়া রথ মাছ টিকটিকি···। কার ভাগে কী পড়ল তা নিয়ে খানিকটা রগড় চলত।

ইংরেজিতে যারা কাঁচা, তাদের বাসায় ডেকে এনে আলাদা করে পড়িয়ে দিতেন থার্ডমাস্টার। সেই সূত্রেই নীতীশকে আসতে বলেছিলেন। সে পাঠশালায় ইংরেজি পড়ে নি, অন্যান্য বিষয় ভালো জানত বলে ক্লাস থ্রীতে ভর্তি করেছিলেন হেডমাস্টার। খুবই অসুবিধায় পড়েছিল গোড়ার দিকে। থার্ডমাস্টার কয়েক মাস ধরে নিয়মিত পড়িয়ে তাকে সকলের সঙ্গে সমান স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বনেদটা এমন পাকা করে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে এর চেয়ে অনেক বড় স্কুলে এবং সেখান থেকে কলেজে গিয়েও সে ইংরেজিতে কোনো দিন কারো চেয়ে পিছিয়ে পড়ে নি।

রবিবার নয়, অন্য কোনো কারণে স্কুলে সেদিন ছুটি ছিল। থার্ডমাস্টার মশাই নীতুকে তিনটা নাগাদ তাঁর ঘরে আসতে বলেছিলেন। হোগলা পাতার বেড়া। তার গা ঘেঁষে একখানা তক্তপোশ। শুধু সতরঞ্চি পাতা, বিছানাটা এক দিকে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তার উপর মুখোমুখি বসে গ্রামার পড়াচ্ছিলেন। মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেতেই সে মুখ তুলে তাকাল। ঠিক পাশেই ছোট্ট একটা জাফরিকাটা সরু বাখারির জানালা। ঝাঁপটা তোলা ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাস্টারমশাই। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে নীতীশ সেই দিকে চেয়ে দেখল। কিছু নয়; মাঝখানে খানিকটা পোড়ো জমি, তার ওপারে ওবাড়ির মুমকোলতার বেড়ার গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একটি

মেয়ে। এমন তো অনেকেই থাকে। কিন্তু অন্য দশজন মেয়েছেলের সঙ্গে ওঁর যেন একটা তফাত আছে। তফাতটা কোথায়, নীতীশ ঠিক বলতে পারবে না। কিন্তু তার শিশুমন এটুকু বুঝতে পারছিল, হাত রাখার ঐ ধরনটি, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দাঁড়াবার ঐ বিশেষ ভঙ্গি, ঐ শান্ত ম্লান দুটি চোখ—ওর মধ্যে যেন একটা গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে।

একবার তাকিয়েই তার চোখ দুটো বইয়ের পাতায় ফিরে এসেছিল কিন্তু মাস্টারমশাই তখনো তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মুখটাও বড় ম্লান দেখাচ্ছিল। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিলেন।

তার কিছুদিন আগে নিমাই-এর কাছে তার দিদির কথা শুনেছিল নীতীশ। কিন্তু তাদের বাড়ি যাওয়া হয় নি। বাড়িটা কোথায় তাও জানত না। তবু কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল, উনিই নিমাই-এর দিদি।

দেবা চলে গেলে মনোরমা চিঠিখানা তুলে রেখে দিলেন। হরিশ তখন বাড়ি ছিল না। একটু পরেই মাঠ থেকে ফিরল। তেতেপুড়ে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তখন এসব কথা কিছু পাড়লেন না। খেয়েদেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে যখন বসেছে, চিঠিখানা নিয়ে তার হাতে দিলেন। লক্ষ্য করলেন পড়তে পড়তে ছেলের মুখখানা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তবু বললেন—কাল সিঙ্গীপাড়ার হাট আছে। আনা বারো পয়সা হলেই বোধ হয় যেমন তেমন একটা জামা হয়ে যায়। আমার হাতে তো আর কিছুই নেই······

—আমার হাতেই বা আসবে কোত্থেকে ? খাজনাপত্তর এক পয়সা আদায় নেই। পাটগুলো ঘরে পড়ে আছে।···বলতে বলতে পোস্টকার্ডখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরল হরিশ।

মনোরমা আর কিছু বললেন না। চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চললেন। পিছন থেকে কানে গেল—বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখানো কি চাট্টিখানি কথা ? এসব জেনেই আমি বলেছিলাম—

মনোরমা কোনো উত্তর করলেন না। হরিশ যে স্পষ্টভাবে অমত করেছিল তা তাঁর মনে আছে। তবু যে কেন ছেলেটাকে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে অত দূরে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, সে কথা ও বুঝবে না। মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, যতই আপত্তি করুক দরকারমত সামান্য একটু-আধটু সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে সঙ্গতি যে একেবারে নেই, তাও মেনে নিতে বাধছে। মনটা বড় দমে গেল। একবার ভাবলেন বোধ হয় হল না, স্বর্গত স্বামীর শেষ ইচ্ছাটুকু অপূর্ণই থেকে যাবে। কী দিয়ে কী করবেন তিনি ? পরক্ষণেই মনে বল আনবার চেষ্টা করলেন।

গোড়াতেও একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না মনোরমা। থাওয়া থাকার সুবিধা পেলেও এমনিধারা ছোটখাটো খরচ যে যুগিয়ে যেতে হবে সেটা জানতেন এবং তার জন্যে তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব তৈরীও হচ্ছিলেন। পুকুরের পুব দিকে কাঠা দশেক পড়ো জমি বুনো ঘাস আর ছোট ছোট আগাছায় ঢাকা পড়েছিল।

গোরু ছাগল চরত। ক্ষুদিরামকে দিয়ে তার অবসরমত এবং সেই সঙ্গে দেবার বাবাকে একদিন 'বেগার খাটিয়ে' জমিটুকু সাফ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বড় কোদাল চালিয়ে প্রথম মাটি ভাঙার শক্ত কাজটাও ওরা করে দিয়েছিল। বাকী যেটুকু, অর্থাৎ ছোট কোদাল দিয়ে ঢেলা গুঁড়িয়ে জমি পাট করা, চারদিকে বেড়া দেওয়া—সে-সব মনোরমা পর পর কয়েকদিন খেটে নিজের হাতে করে নিয়েছিলেন। এই জাতীয় কাজে তিনি একেবারে অনভ্যস্ত নন। এ বাড়িতে এসেও তাঁকে নিজে কুড়ুল দিয়ে শুকনো বাঁশ চিরে জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হয়েছে, মাটি কেটে ঘরের দাওয়া মেরামত করতে হয়েছে। শেষের দিকে শ্যামাচরণ বেঁচে থাকতেই ওগুলো ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে আর ধরেন নি। বয়স বেড়েছে, দেহের শক্তিও অনেক কমে গিয়েছিল।

শেষ বয়সে শরীর যখন আরো অশক্ত হয়ে পড়েছে, তখন আবার সেই পুরনো পাট নতুন করে শুরু করতে হল। পুরনোর সঙ্গে নতুনের একটা মৌলিক তফাৎ ছিল। সেদিন যা করতেন তার ফলভোগ করত গোটা সংসার। আজ করছেন শুধু একজনের মুখ চেয়ে। তাঁর শেষ সন্তান নীতু। তার লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ জমিটায় কিছু বেগুন আর লঙ্কার চারা লাগিয়েছিলেন মনোরমা। ধারে ধারে ডাল পুঁতে পুঁতে কতকগুলো সিমের লতাও তুলে দিয়েছিলেন। সবটাই বিক্রীর জন্যে। হরিশের সেটা পছন্দ হয় নি। কিন্তু মাকে তো চেনে। আড়ালে গজগজ করলেও সামনের উপর কিছু বলতে সাহস করে নি। পাড়ার লোকেরাও এ ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখে নি। বামুনের মেয়ে নিজে হাতে চাষআবাদ করছেন। এসব তো চাষাভুষোর কাজ! তাও খাবার জন্যে নয়। নিজে হাতে দাঁড়িপাল্লা ধরে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তরকারি বিক্রী করছেন। এর পরে বামুনের ঘরের মানসম্ভ্রম রইল কোথায়?

সব কথাই কানে আসত মনোরমার। কিন্তু কানে তুলতেন না। যাদের মধ্যে এবং যাদের নিয়ে বাস, তাদের নিন্দা অখ্যাতি এমন করে উড়িয়ে দেওয়া একেবারেই সহজ ছিল না, বিশেষ করে তাঁর মত একজন বিধবার পক্ষে। তাছাড়া এই বিক্রী জিনিসটাকে তিনি নিজেই কি সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন? না। তবু নিজের মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করে শেষ পর্যন্ত এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। নীতুর লেখাপড়ার চেয়ে তার মান বড় নয়।

এই দুরূহ চেষ্টায় একজন মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মানুষটি ক্ষুদ্র, তার শক্তিও সামান্য, কিন্তু যে বিশেষ সাহায্য তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, মনোরমার কাছে সেটা অনেকখানি। ঐ অঞ্চলে তরিতরকারি জন্মানো বড় বেশী কঠিন ছিল না, তার খদ্দের পাওয়াই ছিল দুষ্কর। প্রায় সব গেরস্তের বসতবাড়ির সঙ্গে কিছু বাড়তি জমিজায়গা ছিল, দুটো কুমড়ো, দু-চারটে মুলো-বেগুন, শাকপাতা সেখান থেকেই তুলে নিত। কেনাকাটার পাট ছিল না বললেই হয়। মনোরমা সেটা জানতেন। তাঁর নজর ছিল বিশেষ করে একটা পাড়ার উপর! দূরে বিলের ধারে একচাপে বেশ কয়েক ঘর কুমোর আর কামার ছিল গ্রামে

তাদের জমিজমা বড় কম, এদিকে প্রায় রোজই হাতে দু-চারটি নগদ পয়সার আমদানি হত। মাঠের ওপারটা ভর্তি মুসলমান। তাদের বাসন-কোসন সব মাটির,—হাঁড়ি কলসি ঘড়া কোলা* তো বটেই (সে সব হিন্দুদেরও লাগত), তার সঙ্গে ভাত খাবার সানকি। সুতরাং কুমোরের চাক চলত সারাদিন। তেমনি কামারশালের হাতুড়িও অনেক রাত পর্যন্ত সরব থাকত। চারদিক ব্যাপী চাষ-বাসের যাবতীয় উপকরণ—দা কুড়ুল কাস্তে কোদাল ঈষ খুরপি—কোনটাই বিদেশ থেকে আসত না।

ভাজনকান্দির এই কুমোর আর কামারপাড়াই ছিল মাঠ ও বাগানজাত ফসলের প্রধান ক্রেতা। কিন্তু কেনাকাটার কেন্দ্র ছিল সিঙ্গীপাড়ার হাট। বেশ খানিকটা দূর। সেখানে মনোরমার এই সামান্য বেসাতি কে পৌঁছে দেবে? বিক্রীই বা করবে কে? সে সমস্যার সমাধান করে দিল দেবা। এ সবই যে নীতুর কাজে লাগবে, এইটুকুই তার সব প্রেরণার মূল। নীতু বিদেশে লেখাপড়া শিখতে গেছে, সে 'বিদ্বান' হয়ে ফিরে আসবে—তার চেয়ে বড় কামনা আর কী আছে? তার জন্যে সে সব কিছু করতে পারে।

মনোরমা যখন ভাবছেন, বেগুনগুলো তৈরী হয়ে গেছে, এবার না ছাড়তে পারলে ভিতরে বিচি হয়ে যাবে, কেউ আর নিতে চাইবে না, তখন দেবা তাঁকে ভরসা দিল—আপনি কাউকে বলবেন না মাঠাকরুণ, আমি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কামারপাড়ায় বেচে আসবো।

এইভাবেই বউনি। ছ সের বেগুন বেচে ছটি পয়সা এনে দিল দেবা। তারপর কুমোর আর কামারদের মেয়েরা নিজেরাই আসত। 'মাঠাকরুণে'র জিনিস অত কষ্ট করে লোক দিয়ে পাঠাতে হবে কেন? খবর পেলে তারাই এসে নিয়ে যাবে। তখন দেবার কাজ ছিল শুধু গিয়ে খবরটা দিয়ে আসা।

এমনি করে একটি টাকা পূর্ণ হতে কদিন লাগে নি। যেদিন হল, সেইদিনই শশী বিশ্বাসের ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মনোরমা।

নীতীশ সহজে যেতে চায় নি, নিমাই একরকম জোর করেই একটা ছুটির দিনে ওকে দিদির কাছে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। নীরদা তখন রান্না করছিল। ভাইয়ের সাড়া পেয়ে দোরগোড়ায় আসতেই নিমাই বলেছিল—বল তো কে?

—কে আবার? নীতু।

নিমাই রীতিমত অবাক—কেমন করে জানলে!

সে কথার জবাব না দিয়ে নীরদা বলল—ওকে বড়ঘরের বারান্দায় নিয়ে বসা। আমি এখ্খুনি আসছি।

দুই বন্ধুকে পাশাপাশি বসিয়ে পিতলের রেকাবিতে করে অনেকটা করে দুধের সর আর বাতাসা খেতে দিয়েছিল। নীতীশ কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না দেখে হেসে বলেছিল—দিদির কাছে লজ্জা কী! খাও।

খাবার সময় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিল—আবার এসো, কেমন?

---

* শস্যাদি মজুত করে রাখবার বড় বড় জালা।

ক্রমশঃ জড়তা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠেছিল নীতীশ। তার পর প্রায়ই যেত 'দিদির' কাছে। প্রথমটা কিছুদিন নিমাইয়ের সঙ্গে, পরে মাঝে মাঝে একাও যেত। নীরদা খুব খুশী হত, কাছে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির সকলের খবর নিত, অনেক যত্ন করে খাওয়াত—কোনো দিন নারকেল-কোরা দিয়ে চিঁড়ে ভাজা, কোনো দিন তেলনুন-মুড়ি কিংবা কিসমিস দিয়ে গরম গরম মোহনভোগ। দুঃখ করে বলত—দুটো রান্না করে যে সামনে দেবো, তার তো উপায় নেই।

নিমাই একদিন বলল—দাও না? কে আর দেখছে! কী বলিস নীতু? আমরা তো আর ছোটজাত নই, কায়েত। দুটো ভাত খেতে দোষ কী? দিদি যা রাঁধে না!

নীতীশ কিছু বলবার আগেই দাঁতে জিভ কাটল নীরদা—তাই কখনো হয়? বামুনের ছেলে, বাপ রে!

মায়ের কাছ থেকে টাকাটা যেদিন এল, দিদির হাতে এনে দিল নীতীশ। নীরদা সেটা আঁচলের কোণে বাঁধতে বাঁধতে বলল—কাল—না পরশু এসে জামাটা নিয়ে যেও। আমি দাদাকে দিয়ে আনিয়ে রাখবো মথুর সা'র দোকান থেকে। দেখি—বলে, ওর একটা কাঁধ ধরে গায়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—নিমুর মাপেই হবে!

—নিমু তো আমার চেয়ে রোগা।

—রোগা নয়, সামান্য একটু ঢ্যাঙা। দুজনেই তালপাতার সেপাই।

খানিক পরে নীতীশ যখন চলে যাচ্ছে, নীরদা বলল—পরশু যখন আসবে পুরনো জামাটা নিয়ে এসো।

নীতু মনে করল, জামাটা বোধ হয় ফেরত চাইছে দিদি। সেটা কিছু দোষের নয়, তবু একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না।

নীরদা বলল—আমি ভালো করে কেচে দেবো। ওটাতেই এখন চলবে। নতুনটা তুলে রেখে দেবো।

ভিতরে ভিতরে নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে গেল নীতীশ। ছি ছি, দিদির সম্বন্ধে কী ভাবছিল এইমাত্র!

তারপর একদিন কৈশোরের এই উজ্জ্বল, মধুর অধ্যায়টা নীতীশের চোখের উপর অতি নিষ্ঠুরভাবে বন্ধ হয়ে গেল। শেষ দৃশ্যটা যেমন বেদনাময় তেমনি এক দুর্ভেদ্য রহস্যের ঘন আবরণে ঢাকা। তার চেয়েও বড় কথা, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোপন লজ্জা ছিল, যা কাউকে বলবার নয়, অথচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যতদিন নটখোলায় ছিল এবং তার পরেও দীর্ঘ দিন সমস্ত ব্যাপারটা তাকে অনুসরণ করে ফিরেছে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সারা সকালটা নীতীশের এক মিনিট বিশ্রাম থাকত না। যে বাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছিল তাদের অনেক কাজ করে দিতে হত এবং তার বেশির ভাগ জমা হয়ে থাকত ঐ দিনের জন্যে, যেহেতু অন্য দিন-

গ‍ুলোতে তাকে অনেকক্ষণ স্কুলে কাটাতে হয়। সে ত্রুটি পুষিয়ে দিতে হবে তো! কিন্তু ছদিনের বকেয়া একদিনে মেটানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নীতীশও পারত না। তার ফলে একটি কথা তাকে প্রায়ই শুনতে হত গৃহিণীর মুখ থেকে—গতরে না পোষায় পথ দেখলেই হয়। ভাত এত সস্তা নয়!

শেষ উক্তিটা নীতুকে বড় বেশী বিঁধত। জন্মাবধি তার চোখে অন্যান্য অনেক জিনিস দুর্লভ হলেও, ভাত জিনিসটাকে সে সস্তাই দেখে এসেছে। সেখানে কোনো অভাব টের পায় নি। 'বিদেশে' এসে প্রথম শুনল, না, সেটাও সুলভ নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখেছে সংসারে ভাতই সব চেয়ে দুর্লভ বস্তু। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। সেদিনকার সেই প্রথম পাঠ 'বড় কঠিন বলে মনে হয়েছিল।

তার আশ্রয়দাত্রীর প্রস্তাবমত 'পথ দেখার' ইচ্ছাটা মাঝে মাঝে বড় প্রবল হয়ে উঠত। কিন্তু তখনই পথ রোধ করে দাঁড়াত একখানা মুখ, থেমে থেমে বলা কয়েকটি কথা ঃ

—তিনি আমাকে বার বার করে বলে গেছেন, দেখো আমার নীতু যেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। সেকথা কোনো দিন ভুলিস না, বাবা। স্বর্গ থেকে সবই তো দেখছেন।

তার আগে সেই মুখ থেকেই রামায়ণের কাহিনী শুনেছিল—রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে বনে গিয়েছিলেন। একদিন নয়, দুদিন নয়, চৌদ্দ বছর! কত কণ্ট, কত দুঃখ সয়েছিলেন···

নীতীশ মনে মনে বলত—এও তার পিতৃসত্য, রামচন্দ্রের মত সব কণ্ট, সব দুঃখ তাকেও সয়ে নিতে হবে।

সেই রবিবার সামান্য কী একটা ত্রুটির জন্যে বাড়ির কর্তার কাছেও কড়া কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। মনটা বড় মুষড়ে পড়েছিল। বার বার মনে পড়ছিল দিদির কথা। তারপর পা দুটো কখন সেই অতি পরিচিত ঝুমকো ফুলের বেড়ার ধারে টেনে নিয়ে গেছে টের পায় নি। হঠাৎ চমকে উঠল। রান্নাঘরের ভিতরে কে যেন কাকে মারছে! ছুটে গিয়ে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে যা দেখল, সে কি স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবতে পেরেছে? বাঁ হাতে দিদির চুলের মুঠি জাপটে ধরে ডান হাত দিয়ে একধার থেকে মুখের উপর চড় কিল মেরে চলেছে নিমাইয়ের দাদা। চাপা গলায় বলছে—তোকে আজ একেবারে শেষ করে দোবো। শেষকালে বংশের মুখে কালি দিলি!

দিদি একটুও কাঁদছে না, একটা কথাও বলছে না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে যাচ্ছে। নিমাই-এর দাদা যেন পাগল হয়ে গেছে। অথচ ছোট বোনটিকে সে যে কত ভালবাসে, নীতীশ তো জানে, কতদিন ধরে দেখে এসেছে। আজ কী হল তার? কী করেছে দিদি?

দিদিকে একটা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল নিমাই-এর দাদা। নীতীশের হঠাৎ ভয় হল, তাকে যদি দেখে ফেলে! এমন করে এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হয় নি। সকলের অলক্ষ্যে পা টিপে টিপে

তাড়াতাড়ি রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

পাশের বাড়িতে ঠিক সামনের ঘরটাতেই যদুবাবু থাকেন। সেদিকে চোখ পড়তেই দেখল, তিনি বারান্দার একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন গম্ভীর তাঁকে কখনো দেখা যায় না। তাকে দেখতে পেলেন, কিন্তু ডাকলেন না তেমন ঘটনাও কোনো দিন ঘটে নি। নীতু অবাক হয়ে গেল। একটু অভিমানও হল। সেও না দাঁড়িয়ে জোর পায়ে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হল, মাস্টার মশাই তাকে ডাকছেন। যেমন হৈ-হল্লা করে ডাকেন, তেমন মোটেই নয়। রাস্তায় নেমে এসে নীচু গম্ভীর গলায় ডাকছেন—নীতু। মুখ ফেরাতেই হাতের ইশারায় ভিতরে যেতে বললেন। নীতীশ বুঝতে পারল না কী হয়েছে মাস্টার মশায়ের। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কোন এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করতে লাগল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই যদুবাবু বললেন—নীতু, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

নীতু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। মাস্টার মশাই বললেন—একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবে?

—কাকে?

—নিমাই-এর দিদিকে। তুমিও তো তাকে দিদি বল, তাই না?

নীতিশ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, সেও তাকে দিদি বলে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে এসে গেল—দিদিকে ভীষণ মারছিল তার দাদা! কী মনে করে বলল না। হয়তো মনে হল, দিদির এই লজ্জা আর অপমানের কথা কাউকে বলা যায় না। ওটা শুধু তার কাছেই থাক।

যদুবাবু বোধ হয় তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—পারবে না?

সেই মুহূর্তে ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিতের কোনো প্রশ্ন তার মনে এল না। কীসের চিঠি, দিদিকে কী জানাতে চান মাস্টার মশাই, এসব কথাও সে ভাবল না। শুধু মনে হল, মাস্টার মশাই সকলের ভালো চান। এ চিঠিটা নিশ্চয়ই দিদির ভালোর জন্যেই দিচ্ছেন।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—পারবে।

যদুবাবু একখানা কাগজ টেনে কটা মাত্র কথা লিখে ভাঁজ করে তার হাতে দিলেন। বললেন—তার নিজের হাতে দেবে, কেউ যেন দেখতে না পায়।

নীতীশ যাবার জন্যে পা বাড়ালে বললেন—শোন; এ চিঠির কথা কাউকে বলো না, কেমন?

নীতীশ বলল—আচ্ছা।

তখনো রান্নাঘরের মেঝের উপর বসেছিল নীরদা। হাঁটু দুটো জড়ো করে তার উপর চিবুক রেখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিল উনুনের দিকটায়। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল দুটি জলধারা। একরাশ এলোমেলো চুলের বোঝা পিঠময় ছড়ানো! আঁচলের কোণটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক পলক দেখেই নীতুর বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার

করে উঠল। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে চাপা গলায় ডাকল—দিদি! প্রথমবার বোধ হয় শুনতে পেল না। আরেকবার ডাকতেই চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আঁচলটা তুলে নিয়ে বেড়ার কাছে সরে এসে বলল—কে, নীতু! তুমি এখন যাও ভাই। ওবেলা এসো।

—তোমার একটা চিঠি আছে দিদি।

—চিঠি! কে দিলে?

—মাস্টার মশাই।

নীরদা বোধ হয় এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল—কই দেখি?

কাগজখানা আরো খানিকটা মুড়ে বেড়ার ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল নীতীশ।

পরদিন স্কুলে ঢুকতেই একটা উপরের ক্লাসের বড় ছেলে এগিয়ে এসে বলল—তোর বন্ধুটি কই? নিমাই, নিমাই! সে এল না যে?

ছেলেটাকে মোটেই পছন্দ করত না নীতীশ! কেমন যেন বখাটে ধরনের। বলল—আমি জানি না।

—কোন্ মুখেই বা আসবে?

কে যেন জিজ্ঞেস করল—কেন, কী হয়েছে?

—সে কি! এখনো শুনিস নি? তার দিদিটি কাল রাত থেকে উধাও! সেই সঙ্গে যদু মাস্টারকেও পাওয়া যাচ্ছে না!

যেতে যেতে নীতীশের পা দুটো যেন হঠাৎ অচল হয়ে গেল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল।

নটখোলায় এসে যে-দুটি মানুষকে নীতীশ সারা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, তাকেও যারা একান্ত আপনজনের স্নেহ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকেই এল সব চেয়ে বড় আঘাত। দিদির উপরেই রাগ হত বেশী। চলে যাবার আগে একবারটি তাকে বলে গেলে কী ক্ষতি হত? মাস্টার মশাই বা এ কী করলেন? চিরদিনের তরে তাকে অপরাধী করে রেখে গেলেন?

॥ ৯ ॥

এবারে এল আরো দূরে যাবার পাল, নটখোলার চেয়ে অনেক বেশী 'বিদেশ'। সে ছিল দিনমানের হাঁটাপথ। এ পথ পাড়ি দিতে একদিন একরাত এবং তার পরেও পুরো একবেলা। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে গিয়ে নৌকো, দুপুরবেলা তালমার ঘাটে নেমে ঘোড়ার গাড়ি, সন্ধ্যার কাছাকাছি টেপাখোলা স্টীমার স্টেশন। রাত আটটায় গোয়ালন্দ, সেখান থেকে আবার স্টীমার, রাতভোর এবং পরদিন ঘণ্টাচারেক এক নাগাড়ে ছুটে দশটার কাছাকাছি সে গিয়ে পৌঁছে দেবে এক অজানা দেশে—যমুনা নদীর চর। গঙ্গাভগিনী যমুনা নয়, ব্রহ্মপুত্রের কন্যা যমুনা।

স্টেশনে নেমে দেখবে ডাইনে বাঁয়ে সামনে ধু-ধু করছে বালি, মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ। তার উপর দিয়ে পথ, অর্থাৎ পথ বলে কিছু নেই। যানবাহন? একমাত্র শ্রীচরণ ভরসা। ভাগ্যের জোর থাকলে কোনো কোনো দিন টাট্টু ঘোড়া জুটে যেতে পারে। দুজন করে সহিস এক-একটা ঘোড়ার। একজন পিছন থেকে চাবুক মারবে, আরেকজন সামনে থেকে লাগাম ধরে টানবে।

মেজদা যখন বেশ ফলাও করে এই বিচিত্র পথের ছবিটা তার সামনে তুলে ধরেছিল, নীতীশের মন তার উপর রঙ ফলিয়ে তাকে আরো লোভনীয় আরো রোমাঞ্চকর করে তুলছিল। এই পথ এবং তাকে ধরে যে নতুন দেশে গিয়ে পৌঁছবে তার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল ভয় বিস্ময় এবং যে জীবন ফেলে যেতে হবে, তার উপর একটা বেদনাময় মমত্ববোধ।

মনোরমার কাছে ছেলের এই 'প্রবাস-যাত্রা' অকল্পিত নয়। ও যখন নিতান্ত শিশু তখন থেকেই এর সম্ভাবনা তার মনের মধ্যে লালিত হচ্ছিল। নিজেকে তার জন্যে তৈরি করেও রেখেছিলেন। কিন্তু সে দিনটি যে এত কাছে এসে গেছে বুঝতে পারেন নি, কিংবা বুঝলেও এদিকে বোধ হয় ততটা সচেতন ছিলেন না।

যতীশ সবে বি. এ. পাস করে বেরিয়েছে। অনার্স পায় নি। পাবার কথাও নয়। ছেলে পড়িয়ে, যে বাড়িতে থাকত তাদের নানারকম ফাই-ফরমাস এবং অন্যান্য দায় মিটিয়ে অনার্সের দাবি মেটানো সম্ভব হয় নি। সাধারণ পাস-কোর্সের বি. এ.। এম. এ. পড়ার স্বপ্ন আকাশ-কুসুম বলে আগেই ত্যাগ করেছিল। 'পাস'-এর খবর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তার একমাত্র কাজ হল যেখানেই হোক, যেমন তেমন একটা চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা।

তার জন্যে চাপ আসছিল প্রধানতঃ হরিশের তরফ থেকে। পরোক্ষ চাপ বরাবরই ছিল, এবার সেটা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আকারে দেখা দিল।

আমি একা আর কদিন চালাবো? আমাকে দিয়ে আর চলছে না—এই জাতীয় কথা হরদম লেগে থাকত তার মুখে। সবাই বসে বসে খাবে, আর আমি শালা খেটে খেটে মরবো—রাগের মাথায় মাঝে মাঝে এরকম উক্তিও করতে ছাড়ত না। মনোরমা চুপ করে শুনে যেতেন। কিন্তু ফুলি কখনো কখনো জবাব দিয়ে বসত—কথার ছিরি দ্যাখ না? বসে বসে আবার কে খাচ্ছে?

হরিশ ঝাঁঝিয়ে উঠত—তুই চুপ করে থাক্। যা বুঝিস না, তার মধ্যে কথা বলতে আসিস না।

'সবাই' বলতে স্বামী যে বিশেষ করে মেজো ভাইকে উদ্দেশ করছে, এটা সত্যিই সে ধরতে পারে নি। কিন্তু মনোরমা বুঝতেন এবং তার মুখের উপর না বললেও, যতীশও সব বুঝতে পারছিল। সংসার বাড়ছে। ফুলির দুটি বাচ্চা, তার এক বহুদূর সম্পর্কের কাকা—বুড়ো মানুষ, কেউ কোথাও নেই—খুঁজে খুঁজে মেয়ে-জামাইয়ের উপর এসে ভর করেছেন। অতিথি অভ্যাগত, অর্থাৎ ফালতু লোক লেগেই আছে। গ্রামে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ। তার উপরে এরই ধার দিয়ে দূরে জিলা শহরে যাবার রাস্তা, মামলা-মোকদ্দমার যাত্রীরা দল বেঁধে এসে পড়ে।

অনেক সময় গভীর রাত্রে এসে ডেকে তোলে। শুধু আশ্রয় নয়, তার সঙ্গে 'দুটি পেসাদ'। ফুলির কোলে কচি, মনোরমাকেই উঠতে হয়। হরিশ বিরক্ত হয়, গজগজ করতে থাকে, কখনো কখনো বলতে চায়—এখানে সুবিধে হবে না, অন্য কোথাও দ্যাখ। মনোরমা বাধা দেন—অতিথি নারায়ণ! যে বেশেই আসুন, তাকে বিমুখ করতে নেই। কখনো বলেন—আমাদের ঘরে দুটো ভাত আছে বলেই না ওরা আসে!

কিন্তু 'আছের' যে একটা সীমা আছে, হরিশ সেটা দিন দিন বুঝতে পারছিল এবং সংসারকেও প্রতি কথায় বুঝিয়ে ছাড়ছিল। কিছু একটা আনতে বললেই খেঁকিয়ে উঠত—কী দিয়ে আনবো? পয়সা কই? কখনো কখনো ঠান্ডা ভাবেই বলত—দেখছ তো, সম্বল বলতে ঐ কখানা জমি। তারা আর কত দেবে? দুবেলা দুটো খেতে দিচ্ছে এই যথেষ্ট। তাও বেশীদিন পারবে না।

কথাটা মিথ্যে নয়। দিন দিন মানুষের প্রয়োজন বাড়ছে। সেগুলো মেটাতে চাই পয়সা। তার চাহিদাও বাড়ছে। কাল যেখানে চার পয়সা লাগত, আজ লাগছে ছ পয়সা, আসছে কাল লাগবে আট পয়সা। কোত্থেকে আসবে সেই পয়সা, যদি বাইরে থেকে কেউ না আনে?

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হত। কিন্তু হরিশ আরো খানিকটা এগিয়ে যেত। মাকে কিংবা বৌকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত—'মেজোকত্তার' মতলবটা কী?

বি. এ. পরীক্ষার পর থেকে যতীশ বাড়িতেই বসে ছিল। ঠিক বাড়িতে নয়, একটু বেলা হতে ছাতাটি মাথায় দিয়ে পাশের গ্রামে পোস্টাফিসে গিয়ে বসাই ছিল তার দৈনন্দিন রুটিন। সেখানে গৌরীনাথ কবিরাজ মশায়ের নামে একখানি বাংলা খবরের কাগজ আসত। নামটা তাঁর হলেও, কাগজের মালিক গ্রামের সর্বসাধারণ। আসা মাত্র হাতে হাতে ঘুরত। তার মধ্যে দুটো হাত যতীশের। 'খবরের' জন্যে তার ততটা আগ্রহ ছিল না, প্রধান লক্ষ্য ছিল কর্মখালি। বেশির ভাগই স্কুলের চাকরি। ঐখানে বসেই দরখাস্ত লেখা, সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পরদিন থেকে অনুকূল উত্তরের আশায় দিন গোনা—এই ছিল তার কাজ।

বেশ কয়েক মাস পরে উত্তর এল। আশাপ্রদ উত্তর। উত্তর বাংলার কোনো এক গণ্ডগ্রামে হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—জমিদারের স্কুল, মাইনে ভাল—পঁয়তাল্লিশ টাকা। স্কুলের কাছেই বাসা, সপরিবারে থাকবার মত নয়, অন্য একজন সহকর্মীর সঙ্গে একযোগে।

যতীশের ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় কিংবা তার আশেপাশে হলে, ল' ক্লাসে ভর্তি হতে পারত, প্রাইভেটে এম. এ. দেবার চেষ্টাও করা যেত। কিন্তু অনিশ্চিত অনাগতের আশায় হাতের লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাছাড়া বাড়ির সকলের কাছে এ তো হাতে স্বর্গ পাওয়া! একসঙ্গে পঁয়তাল্লিশ, অর্থাৎ পাঁচ কম পঞ্চাশটা টাকার মুখদর্শন হয়তো কারো ভাগ্যেই ঘটে নি!

সুখবরটা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম কৃতী ছেলের জন্য একটি মনোমত সুপাত্রীর কথাই সকলের প্রথম চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বড় বৌ তো একটা

প্রস্তাবই এনে হাজির করল। তার পিসীমার ছোট মেয়ে। মনোরমা সংক্ষেপে বললেন—দেখা যাক, ওখানে তো মানুষের কোনো হাত নেই, নির্বন্ধ যেখানে আছে—

ফুলি দেওরকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়ল না। চোখ টিপে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে অন্তরঙ্গ চাপা গলায় বলল—পিসী বারো-বারো করলে কি হয়, আসলে তেরোয় পড়েছে। বাড়ন্ত গড়ন, এরই মধ্যে বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে।

—তাই নাকি! বড় বড় চোখ করে বলল যতীশ—তাহলে তো দাদার চেয়ে ভাইয়ের ভাগ্য অনেক ভালো বলতে হবে। ঘাড়ে করে টানতে হবে না, আঁচড়-কামড়ও সইতে হবে না।

ফুলি প্রথমটা একটু লজ্জা পেল, পরক্ষণেই দু চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে আবাল্য-সখা দেওরকে পাখা নিয়ে তাড়া করল। যতীশ তখনকার মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেও অত সহজে রক্ষা পেল না। কথা দিতে হল, আগামী ছুটিতে যখন বাড়ি আসবে, তখন বৌঠাকরুণকে নিয়ে তার পিসীর বাড়িতে যাবে এবং সেই সুযোগে তার ভগিনীটিকেও স্বচক্ষে দেখে আসবে।

ফুলি জানত, দিনকাল বদলে গেছে, তার দেওরের মত তিনটা পাস করা ছেলেরা নিজেরা কনে দেখে বিয়ে করে, তাতে কোনো দোষ নেই। পিসীমাকে বলে সে ব্যবস্থা সে করবে। উপরন্তু আশ্বাস দিল, ভাবছ কেন? আড়ালে দেখা করার সুবিধেও করে দেবো। কেউ থাকবে না।

—ওঃ, তাহলে তো কথাই নেই! তদ্দিনে আরো ডাগর-ডোগর হবে, কি বলো?

শুকচর ব্রজসুন্দরী ইনস্‌টিটিউশনে যোগ দেবার কয়েক মাস পরেই পুজোর ছুটিতে বাড়ি এল যতীশ। দু-চার দিন যেতে একদিন কথায় কথায় মাকে জানিয়ে দিল, ফিরবার সময় নীতুকে নিয়ে যাবে। মনোরমার মনে যেন একটা ধাক্কা লাগল। নীতুকে নিয়ে যাবে! তারপরেই নিজেকে বোঝালেন, পুরুষ ছেলেকে তো ঘরে ধরে রাখা চলে না। যতেও এই বয়সে দূরে চলে গিয়েছিল, নীতুকেও যেতে হবে। এতদিন তবু কাছে ছিল। দুদিন-তিনদিনের ছুটিতেও বাড়ি চলে আসত। সেটা আর হবে না। আসতে আসতে সেই 'জ্যৈষ্ঠি' মাস। তারপর আবার সেই আশ্বিন। কখনো-সখনো পোষ মাসে বড়দিনের ছুটিতে। তাও ফি-বারে নয়। সেকথা যতীশ আগেই বলে রেখেছে—বড় দূরের পথ, যাতায়াতের কষ্টও কম নয়। গায়ের ব্যথা মরতে মরতেই ছুটি ফুরিয়ে যায়। তার উপরে খরচ।

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—এখনি নিয়ে যেতে চাস? কিন্তু তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, ঠাকুর-চাকরের উপর নির্ভর, তার ওপরে আবার ওকে সামলাবি কেমন করে?

—সে একরকম করে হয়ে যাবে। কিন্তু ওকে আর ঐ বাজে ইস্কুলে ফেলে

রাখা যায় না। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো; ওখানে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে।

মনোরমা আর কোন আপত্তি তুললেন না। তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীরু আকাঙ্ক্ষা মাথা তুলে উঠছিল (আগেও ছিল সেটা)। ছেলে যদি একটা বাসা করে, তিনিও গিয়ে ওদের দুজনকে নিয়ে থাকতে পারেন! কথাগুলো চেপে গেলেও বোধ হয় তাঁর চোখের তারায় ফুটে উঠে থাকবে। কিংবা যতীশের নিজের মনেই হয়তো ঐরকম একটা পরিকল্পনা ছিল। নিজে থেকেই বলল—বাসা করার কথাও ভেবেছিলাম। তাহলে তুমি সুদ্ধ যেতে পারতে। চেষ্টা করলে ওখানে ছোটখাটো একটা বাড়ি যে পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু তার মানে কিছু খরচ তো বাড়বেই। তার মানে বাড়িতে যা পাঠাচ্ছি কমাতে হবে। এদিকে দাদা আবার—

—না বাব, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন মনোরমা—এখন থাক, বাসা করার দিন তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ভগবান করলে দুদিন পরে যখন বৌ ঘরে আনবো, তখন তো করতেই হবে।

বলে, বোধ হয় সেই অনাগত উজ্জ্বল দিনটির দিকে চেয়ে চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল।

টেপাখোলায় পেঁছিতে সন্ধ্যা হল। স্টেশনের নামটাই শুধু আছে, সে জায়গার আর কোনো হদিস খুঁজে পেল না যতীশ। পদ্মার ভাঙন চলছে, ঘরদোর যা ছিল সব পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দুধারে খাড়া ন্যাড়া পাহাড়ের মত উঁচু পাড়; সারা অঙ্গে অজস্র ভাঙাচোরার চিহ্ন।

নীতীশের মাথার ভিতরটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। এ কোন্ দেশ! অনেকক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। আরো ভালো করে দেখবার জন্যে সব চেয়ে উঁচু জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মেজদার চন্ড কণ্ঠ কানে এল, কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে সরে আয়।

দু-একজন অচেনা যাত্রীও বলল—অত ধারে যেও না খোকা।

স্টীমার আসতে তখনো কিছুটা দেরি। সামনে শূন্য নদী। যেটুকু চোখে পড়ে, ঘোলা জলের ঢেউ গড়িয়ে চলেছে, বাকীটা আবছায়ায় ঢাকা। মনে হয় ঐখানেই পৃথিবীর শেষ, তারপর আর কিছু নেই। অজানা অদৃশ্যলোক থেকে শুধু একটা চাপা গর্জন হাওয়ায় ভেসে কানে এসে লাগছে। সেই যখন জ্ঞান হয় নি তখন থেকে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে আড়িয়াল খাঁর কথা শুনে শুনে নীতীশ তার একটা বিশাল ভয়াল রূপ মনে মনে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যা দেখছে তার কাছে সে কিছু নয়। এই পদ্মা তার আবাল্যরচিত সব কল্পনা বহু পিছনে ফেলে এমন একটা রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যার কোনো বর্ণনা নেই, যাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার কথা মনে আসে না, দেখামাত্র একটা কথাই শুধু সমস্ত চেতনা জুড়ে জেগে ওঠে—এ আশ্চর্য, এ এক পরম বিস্ময়!

হঠাৎ একঝলক তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো দূর নদীগর্ভ থেকে বিদ্যুৎ চমকের মত পাড়ের উপর এসে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। আশেপাশে যে লোকগুলো

বসে বা দাঁড়িয়েছিল, চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল, জাহাজ আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপাশের দুটো বিশাল ঘূর্ণ্যমান চাকায় ঝপ ঝপ শব্দে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে এল এমন এক বিপুলকায় প্রাণী, যাকে দেখে নীতুর সেই কতদিন আগে রূপকথায় পড়া দৈত্য-দানবগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। এর এই আকাশ-ফাটানো হুঙ্কারটাও কি একেবারে তাদের মতন! কত কাণ্ড, কত কসরৎ করে এগিয়ে পিছিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দৈত্যরাজ ঘাটের কাছে এসে ভিড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক (নীতু পরে শুনেছিল, ওদের নাম খালাসী) গোটাকয়েক মোটা লম্বা লম্বা তক্তা ধরাধরি করে বয়ে এনে স্টীমার আর পাড়ের মধ্যে একটা সাঁকো তৈরী করে ফেলল। তার উপরে বিছিয়ে দিল নারকেলের দড়ি দিয়ে বোনা শতরঞ্জি। দোতলা জাহাজের ছাতের উপর দাঁড়িয়ে একজন জাঁদরেল গোছের দাড়িওয়ালা লোক দুর্বোধ্য ভাষায় ক্রমাগত চিৎকার করে কি সব বলে যাচ্ছিল। তার পরিচয়টা মেজদার কাছে তখনি পেয়ে গেল নীতু—সারেং, ওরই হুকুমে স্টীমার চলে।

সাঁকোটা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টীমার থেকে কিছু লোক নামবার চেষ্টা করছিল। উপর থেকে সারেং-এর চিৎকার শোনা গেল—বাম্বু, বাম্বু! জনকয়েক খালাসী ছুটে গিয়ে দুটো লম্বা বাঁশ এনে সাঁকোর দুধারে আড়াআড়ি ভাবে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এতক্ষণে সারেং-এর একটি কথা বুঝতে পারল নীতু—বাম্বু, অর্থাৎ বেম্বু, যার মানে বাঁশ।

গোয়ালন্দে পৌঁছে নীতুর মনে হল তারা সত্যিই এক রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছে। এখানে ওখানে কত স্টীমার! চারদিকটা আলোয় আলোময়; শুভ্র, উজ্জ্বল প্রখর তার দীপ্তি, কেমন যেন এক স্বপ্নের মায়া মাখানো তার গায়। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘাট, মোটা তক্তা দিয়ে তৈরী সাঁকো (ওখানকার ভাষায় সিঁড়ি) জলের উপর অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। তার ধারে এসে স্টীমার লাগে।

অনেকখানি বালি ভেঙে মস্ত বড় একটা খড়ের চালার মধ্যে গিয়ে ওরা একটা বেঞ্চিতে বসল। 'মেজদা' বললেন—এটা হল ওয়েটিং রুম। তুই বোস, আমি টিকেট কিনে নিয়ে আসি। একা একা কোথাও যাস নে যেন, হারিয়ে যাবি।

হারিয়ে 'যাবে' কী! চারদিকে চেয়ে নীতুর মনে হল সে হারিয়ে গেছে!

জানালা দিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে একেবারে চক্ষুস্থির! গায়ে গায়ে লাগানো অসংখ্য চালাঘর, ছাউনি—কতক টিনের কতক উলুখড়ের। স্রেফ্ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যতীশ এসে জিজ্ঞাসা করল—এ ঘরগুলো কিসের মেজদা?

—ওগুলো সব হোটেল। ওখানে আমরা খেতে যাবো।

—ঐ জলের মধ্যে?

—জলের মধ্যে কি রে? বাঁশের পাটাতন রয়েছে, দেখছিস না?

—ওরা জলের মধ্যে ঘর তুলেছে কেন?

—কি করবে ? ডাঙ্গা কোথায় ? পদ্মা সব ডুবিয়ে দিয়েছে।

নীতুর মনে পড়ল, আড়িয়াল খাঁও এমনি সব ডুবিয়ে দিত—বাড়িঘর জমিজিরেত সব। তাদেরও সব কিছু একদিন ডুবিয়ে দিয়েছিল, কেড়ে নিয়েছিল, আর ফিরিয়ে দেয় নি। তারা একরাতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। তার জন্মের অনেক আগে। তবু যেন সেই রিক্ততার ছবিটা, মায়ের কাছে শুনে শুনে যার একটা স্পষ্ট অবয়ব তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে—চোখের উপর ভেসে উঠল।

ঠিক একহাত নীচে পদ্মার বেনো জল, তার উপরে বাঁশের মাচা, হোটেল ঘরের মেঝে। সারি সারি কুশাসন পাতা। সেখানে বসে এনামেলের থালায় ভাত খেতে খেতে নীতুর মনে কেমন একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল। যা দেখছে সবই নতুন, শুধু নতুন নয়, পরমাশ্চর্য ! ভাতগুলো কি ধবধবে সাদা ! বাড়িতে কিংবা নটখোলায় যে ভাত খেয়েছে এতদিন, এর চেয়ে মোটা এবং লালচে ; আর এত ঝরঝরে নয় ; গায়ে গায়ে জড়ানো। এর স্বাদটা কিন্তু তেমন মিষ্টি নয়।

ভাতগুলো যখন নাড়াচাড়া করছিল, যতীশের নজরে পড়তে সে বলল—এ হল বালাম চালের ভাত। বরিশালের নাম শুনেছিস তো ? সেখানকার চাল। আর দুটো ভাত নিবি ?

—না।

—না কেন ? পেট ভরে খা। কাল বাসায় পেঁছিতে অনেক বেলা হবে। ঠাকুরকে ডেকে ভাইকে ভাত দিতে বলল যতীশ। নিজেও নিল।

ভাতের সঙ্গে মশুর ডাল, একেবারে জলের মত পাতলা, তার সঙ্গে কুমড়ো আর কি সব আনাজ দিয়ে একটা ঘ্যাঁটমতন তরকারি। কোনটাই ভাল লাগল না। কিন্তু তারপর যা এল, জীবনে কখনো খায়নি নীতু। বড় বড় ইলিশ মাছের টুকরো। দুখানা করে মাছ দিচ্ছে প্রত্যেককে—একটা পেটি, একটা পিঠ। বোধ হয় ছেলেমানুষ বলে তাকে দুটোই পেটি দিয়ে গেল। সঙ্গে একগঙ্গা ঝোল। কি সুস্বাদু খেতে ! কী তার !

তাদের অঞ্চলে ইলিশ নেই। বড় নদীই নেই ধারেকাছে, ইলিশ আসবে কোত্থেকে ? বছরে একবার করে গ্রামের জেলেরা যখন দল বেঁধে 'গাঙে যায়',* ফিরবার সময় কিছু কাটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে, অনেক দিনের বাসী, নুনে পোড়া, 'ঠাকুরবাড়িতে' দিয়ে যায় খানকয়েক। সেই মাছ খেয়েছে। তার সঙ্গে এর আকাশপাতাল তফাৎ।

ভাঙন পাড় ঘেঁষে স্টীমার চলেছে। মেল স্টীমার, অনেক পরে পরে স্টেশন। উলটো দিকে দোতলার ডেকের একটা কোণ বেছে নিয়ে রেলিং-এর উপর চিবুক রেখে নীতীশ নদীর মধ্যে চোখ দুটোকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। যত দূর দেখা যায়, জল শুধু জল ! এত জল সে কখনো দেখে নি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে।

* কয়েক মাসের জন্যে পদ্মার মাছ ধরতে যাওয়ার চলতি নাম 'গাঙে যাওয়া।'

বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। এতক্ষণে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে; মা নিশ্চয়ই জেগে আছেন। অন্যদিন হয়তো শুয়ে পড়তেন, আজ শুতে যান নি। তাঁর সেই ছোট ঘরখানির অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে বসে আছেন। ঠিক পাশে কাগজিলেবুর গাছটা হাওয়ায় দুলছে। একরাশ ফুল এসেছে ডালগুলোয়। কী মিষ্টি গন্ধ! মা তার কথা ভাবছেন, ওসব দিকে তাঁর মন নেই।

মনে পড়ছিল দেবার কথা। পুকুরপাড়ে ঝাঁকড়া হিজল গাছটার তলায় বসে কত কী বলছিল কাল—এবার তুমি আরো বিদ্বান হবে, নীতু। বদ্যিদের ছেলেগুলো পেছনে পড়ে থাকবে; সক্কলকে ছাড়িয়ে যাবে তুমি।······

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কত করে উৎসাহ দিচ্ছিল, ভয় কী! হলই বা দূরে, মেজোকত্তা তো রইলেন! একেবারে বাড়ির মত থাকবে। মাঠাকরুণের জন্যে কিছু ভেবো না। আমি রোজ 'সন্দেবেলা' তেনার কাছে এসে বসবো, তোমার চিঠি এলে পড়ে শোনাবো।······

শুয়ে পড়ার জন্যে দু-দুবার তাগিদ দিয়েছেন মেজদা। এবার না উঠলে বকবেন। উঠতে যাচ্ছিল নীতু। একটি ছেলে, ওর চেয়ে কিছু বড় হবে, ওদিক থেকে উঠে এসে পাশে বসল। হাতে একখানা বই। সে-ই আগে কথা পাড়ল—কোত্থেকে এলে? কোথায় যাচ্ছ? সঙ্গে উনি কে? নিজের কথাও বলল—ছুটিতে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরছি। অন্ধকার থাকতেই পৌঁছে যাব। তোমাদের বেলা হবে······

নীতু চিরদিন মুখচোরা। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যেও সে কচিৎ মুখ খোলে, অচেনা লোকের কাছে তো কথাই নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনটা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে একটি আশ্রয় খুঁজছিল, ছেলেটি এসে যেন সেই স্থান পূরণ করল। জড়তা কাটিয়ে উঠতে দেরি হল না। জিজ্ঞাসা করল—তোমার হাতে ওটা কী বই?

—এটা? নীতিমুকুল, আমাদের বাংলা টেক্‌স্‌ট্‌ বই।

—দেখি?

বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতেই বেরিয়ে পড়ল একটি ছোট কবিতা—'ধ্যান', তলায় লেখকের নাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চোখে পড়তেই ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠল।

নামটি তার চেনা, তাদের স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে মাঝে মাঝে শুনেছে। তিনি বলেন—রবিঠাকুর। যখনই বলেন, তাঁর ঠোঁটের রেখায়, গলার স্বরে, উচ্চারণের ভঙ্গিতে এমন একটা বিদ্রূপ তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা ফুটে ওঠে, যার থেকে এই অক্ষম কবিটির উপর অন্য ছেলেদের মত তারও একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

এই কদিন আগেকার কথা। পণ্ডিতমশায় ক্লাসে ঢুকলেন, তাঁর হাতে দুখানা বই। একখানা তাদের সকলের চেনা—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ। শ্রদ্ধাভরে মলাট খুলে প্রথম সর্গ থেকে গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় আবৃত্তি করে গেলেন:—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু যবে চলি গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে……

কিছুক্ষণ পরে মেঘনাদবধ বন্ধ করে অন্য বইটা টেনে নিলেন এবং নাকিসুরে বিকৃত মেয়েলী কণ্ঠে পড়ে শোনালেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
……চরণধূলার তলে।"

পড়তে গিয়ে 'মাথা' শব্দটার উপর বেশ খানিকটা জোর দিলেন। তারপর বইখানা তুলে বললেন—এটা কি জানিস না তো? তোদের রবিঠাকুরের মাথা।

সারা ক্লাসে একটা হাসির রোল উঠল।

নীতীশ বসেছিল সামনের বেঞ্চিতে। নামটা দেখতে পেল—গীতাঞ্জলি। তার হাসি পেল না। মাইকেলের রচনার পাশে এ লেখা যে কত খেলো, সে কথা মনে করেই তার মন অশ্রদ্ধা ও তিক্ততায় ভরে উঠল। তারপর পণ্ডিতমশায় যখন উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—বাংলা ভাষার কত বড় অমর্যাদা করছে 'এই লোকটা'; 'মাথা'র মত একটা চলতি কথার পর সংস্কৃত 'নত' শব্দের প্রয়োগ, 'চরণে'র সঙ্গে 'ধূলো'র সমাস-যোগ দস্তুরমত গুরুচণ্ডাল-দোষে দুষ্ট, তখন নীতুও তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে পারল না।

আর এক দিন। 'লাইব্রেরি' ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীতীশের কানে গেল, ভিতরে তুমুল তর্ক চলেছে হেডমাস্টার আর হেডপণ্ডিতমশায়ের মধ্যে। হেড মাস্টার মৃদু স্বরে কি বললেন বোঝা গেল না, পণ্ডিতমশায়ের চড়া গলা স্পষ্ট শুনতে পেল—ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সংকলনে রবিঠাকুরের একটা কি জঘন্য পদ্য ঢোকানো হয়েছে, পড়ে দেখেছেন? দেখেন নি? তবে শুনুন—"নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।" বুঝুন একবার! ওখানে যারা পড়ে, কেউ আপনার কচি খোকা নয়। দু-একটা বাঁদর যদি ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করে—'নটী' কাকে বলে, পণ্ডিতমশাই? 'অভিসার' মানে কী? কী উত্তর দেবো বলুন…।

নীতীশের ক্লাস ছিল; আর দাঁড়াতে পারে নি। পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলো তার খুব সমীচীন মনে হয়েছিল। 'অভিসার' শব্দের ঠিক অর্থ তার জানা ছিল না। তবু কেমন করে যেন বুঝেছিল কথাটা ভালো নয়। আর 'নটী' মানে যে খারাপ স্ত্রীলোক সেটা সে আগেই জানত। তাদের গ্রামে নীচু জাতের মেয়েরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত, তাদের মুখে এই কথাটা সে অনেকবার শুনেছে। শোনা মাত্র অপর পক্ষ যেভাবে রুখে উঠত এবং কোমরে আঁচল বেঁধে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত, তাতেই বুঝতে পেরেছিল, ওটা বিশ্রী ধরনের গালাগালি।

রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে তার ধারণা সেদিন আরো নেমে গিয়েছিল। ভাগ্যিস তাদের পাঠ্য বইতে তার কোনো পদ্য ঢোকানো হয় নি!

ছেলেটি লক্ষ্য করল, নীতীশ একটা খোলা পাতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টি যে অপ্রসন্ন, তার ভিতরে একটি অপ্রীতিকর স্মৃতির ছায়া এসে পড়েছে, সে সব বোধ হয় খেয়াল করল না। ঝুঁকে পড়ে পৃষ্ঠাটা এক পলক দেখে নিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বলল—কবিতাটা কী সুন্দর! তাই না? রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি! এই তো সেদিন নোবেল প্রাইজ পেলেন তাঁর গীতাঞ্জলির জন্যে।

—গীতাঞ্জলি! বিরক্তির সুরে বলে উঠল নীতীশ।

—হ্যাঁ, পড়েছ?

—না, ওটা মোটেই ভালো বই নয়।

—কে বললে?

—আমাদের হেডপণ্ডিত মশাই বলেছেন।

—তিনি কিছু জানেন না। নোবেল প্রাইজ কারা পান জানো? পৃথিবীর মধ্যে যারা সব চেয়ে বড় লেখক। আচ্ছা, এই কবিতাটাই পড়ে দ্যাখ না। দাঁড়াও, আমি পড়ছি।

ছেলেটি অনেকখানি আবেগ দিয়ে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল—

"নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি!
তোমার পাইনে কূল।"

অনিচ্ছা এবং অশ্রদ্ধার ভাব নিয়েই শুনছিল নীতীশ। কিছদূর যেতেই তার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা চমক ছড়িয়ে পড়ল। কবিতা তো সে আগেও পড়েছে, অন্যকে পড়তে শুনেছে, কিন্তু তার থেকে এ একেবারে আলাদা। কোথায়, কেন আলাদা, কী আছে এর মধ্যে, সে বলতে পারবে না। কে এই 'তুমি', কাকে উদ্দেশ করে কী বলতে চান কবি, সে সবও তার ধারণার বাইরে। সেদিনকার সেই ছেলেবয়সের মন দিয়ে আবছা ভাবে এইটুকু শুধু বুঝেছিল, তার সামনে যেন একটা নতুন সৌন্দর্যালোক উন্মোচিত হচ্ছে, যার মধ্যে তার প্রবেশাধিকার ছিল না; কেমন একটা অচেনা মধুর সুর কানে এসে লাগছে, যার স্বাদ সে কখনো পায় নি।

হয়তো এর সবটুকু তার সেদিনের উপলব্ধি নয়, কিছু অংশ পরের, যখন সে আরো বড় হয়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেমন হয়, ছেলেবেলাকার ছোট্ট বেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখা কত গভীর মুহূর্ত পরিণত বয়সের বিস্তৃতির মধ্যে হারিয়ে যায়, দূর কৈশোরে পদ্মার বুকে ফেলে আসা নীতীশের জীবনের ঐ রাত্রিটি সে পরিণাম থেকে বেঁচে গিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরে, তখন সে কলকাতায় গিয়ে বড় কলেজে পড়ছে, কোনো কোনো দিন অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অর্ধ-বিস্মৃতির কুয়াশার আবরণ ঠেলে সেই কটি অপরূপ মুহূর্ত তার সমস্ত চেতনা জুড়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। সেগুলোকে আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখত নীতীশ। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ডুবে যেত।

সেদিন স্টীমার যখন ছাড়ল এবং তার পরেও কিছুক্ষণ চারদিকে সার্চলাইটের আলো নীতুর চোখ দুটোই শুধু ধাঁধিয়ে দেয় নি, মনটাও অধিকার করে রেখেছিল। বেশ খানিকটা যাবার পর খেয়াল হল সেটা চাঁদনী রাত। মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে, বোধ হয় পূর্ণিমা কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তিথি। উপরে সারা আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্নার প্লাবন। নীচে বিস্তীর্ণ পদ্মা। সেও যেন সেই আলোর নেশায় মেতে উঠেছে। রুপোর মুকুটপরা ঢেউগুলো একপাল চপল মেয়ের মত কলহাস্যে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছিল দূর দিগন্তের গায়। নীতু তন্ময় হয়ে দেখছিল এবং তারই প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠেছিল সেই কবিতার লাইন-গুলোর মধ্যে।

"তুমি যেন ঐ আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।"

* * *

"তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার।"

প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হবার বয়স সেটা নয়, তার সৌন্দর্যতত্ত্ব উপভোগ বা বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তখন জন্মায় নি। কিন্তু সেই অপরূপ প্রকৃতির সঙ্গে কবিতাটির কথা ও সুর যে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে, এই পরম সত্যটি সেদিন তার কাছে অস্পষ্ট ছিল না।

সেই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে এক গভীর তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল নীতীশের কাছে। মনে মনে একটা অদ্ভুত প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল—ওটা যেন কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়, তার ভিতরে একটি নিগূঢ় অর্থ রয়ে গেছে। সে অর্থটি একান্তভাবে তার অনুভবের বস্তু; অন্যের কাছে মূল্যহীন।

অন্য সকলে তাকে অন্ধ সংস্কার বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু নিজের অন্তরের কাছে সে কেমন করে অস্বীকার করে যে ঐ 'ধ্যান' তার জীবনের প্রথম ধ্যানমন্ত্র, যার বলে সেদিন সেই স্টীমারের মধ্যে বসে সে দ্বিজত্ব লাভ করল, এক নতুন মানুষ জন্ম নিল তার মধ্যে। সেই নব জন্মক্ষণ চিহ্নিত হয়ে রইল কবির কাব্যে। ঐ কবিতাটি যেন সেই উপলক্ষেই বিশেষ ভাবে রচিত।

অনেক প্রাচীন কাহিনীতে যেমন শোনা যায়, দেবতারা নানা ছদ্মবেশে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিককে ধর্মের পথে নিয়ে আসেন, তেমনি এই কবি, যাঁকে সে কোনো দিন শ্রদ্ধার আসন কিংবা কবির স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয় নি, এক স্বপ্নময় রাত্রির 'আকাশ উদার', 'অসীম পাথার' এবং 'আনন্দ পূর্ণিমা'র জ্যোতির্ময় বেশে তার কাছে সহসা আবির্ভূত হলেন। তাঁর মূঢ়তা ও অবিশ্বাস দূর করে তাকে এক নিমেষে জয় করে গেলেন।

শুধু জয় নয়, আরো পরে বুঝেছিল, তাকে এক নতুন জীবনধর্মে দীক্ষা

দিলেন কবি, সে ধর্মান্তরিত হল, গ্রহণ করল নতুন জীবনদর্শনের প্রথম পাঠ। ভবিষ্যৎকালে যে ভাবধারায় সে স্নাত, লালিত এবং পুষ্ট হয়েছিল, ঐদিন তারই প্রথম স্পর্শ লাগল তার দেহমনে। ওটা তার অনুষ্ঠানহীন অভিষেক।

কী রূপান্তর ঘটে গেল তার অন্তর্লোকে, নীতীশের ঐটুকু মন সেদিন কিছুই বুঝতে পারে নি। সে তখন আচ্ছন্ন, অভিভূত, আবিষ্ট। শুধু মনে পড়ে তার সেই হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া পথের বন্ধু (যার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হয় নি) যখন বার বার করে পড়ছিল ঐ ছোট্ট কবিতাটি, বিশেষ করে তার শেষ দুটি ছত্র, সেও মন্ত্রচালিতের মত অস্ফুট কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করেছিল—

যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার!

এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে কেঁপে উঠেছিল তার দেহমন। সত্যিই যেন সে এক অচেনা অদৃশ্য 'তুমি'র মধ্যে একাকার হয়ে গেল!

॥ ১০ ॥

একসময়ে গ্রামাঞ্চলের জমিদারের সম্পর্কে একটা বিশেষণ প্রায়ই প্রয়োগ করা হত— দোর্দণ্ডপ্রতাপ। শুকচরের বাবুরাও একদিন তাই ছিলেন। যতীশ যে-সময়ে তাঁদের স্থাপিত ব্রজসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের সেকেণ্ড মাস্টার হয়ে গেল, তখন সে প্রতাপ আর নেই, কিন্তু তার তাপটা রয়ে গেছে। ছোট বড় অনেক শরিক, আলাদা আলাদা বাড়িতে বাস,—কিন্তু সবগুলো একচাপে, যেন একটা ছোট-খাটো শহর। বাবুরা ব্রাহ্মণ, গ্রামটিও ব্রাহ্মণ-প্রধান। তার মধ্যে কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু পরিবারও আছে, যাদের অবস্থা জমিদারদের চেয়ে ভাল। তবু আধিপত্য ওঁদেরই এবং ওঁদের ভিতর থেকে পালা করে একজন স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে থাকেন। তিনিই সব, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন রক্ষার জন্য নামমাত্র কমিটি একটা আছে, এবং তার প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু ঐ পদে যিনিই আসুন, কেউ কোনো মিটিং-এ আসেন না। সরকারী কার্যসূত্রে কাছাকাছি কোথাও এলে 'মিনিট-বই'টা কিংবা অন্য কোনো কাগজপত্র যাতে তাঁর সই দরকার, তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ এস. ডি. ও. বিনা বাক্যব্যয়ে 'প্রেসিডেণ্ট' শব্দটির উপরে দরাজ হাতে সই বসিয়ে দেন।

একবার এক বিলাতফেরত 'ছোকরা হাকিম' কি মনে করে কমিটি মিটিং-এ এসে উপস্থিত। সেদিনকার অ্যাজেন্ডা অর্থাৎ বিষয়-সূচীর সব চেয়ে দরকারী দফা ছিল হেডমাস্টার নির্বাচন।

স্কুলের জন্ম থেকে এখানে অনেক হেডমাস্টার এসেছেন গেছেন। তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের তফাৎ অনেক, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁরা এক—সকলেই ব্রাহ্মণ। এ মিলটা ঠিক দৈবাৎ ঘটে নি। কাগজে কলমে কোথাও অবশ্য উল্লেখ নেই, কিন্তু অপ্রকাশ্যে এটা এঁদের নীতি। হেডমাস্টার সম্মানীয় ব্যক্তি।

স্কুলের শীর্ষস্থান ছাড়া স্থানীয় সমাজেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকেন। সেটা এ'রা কোনো অব্রাহ্মণকে দিতে প্রস্তুত নন।

অনেক ব্রাহ্মণও সেই সামাজিক মান এ'রা যেরকমটা চান সেভাবে বজায় রেখে চলতে পারেন না। এই যেমন, কদিন আগে যিনি ছিলেন, তিনি পারেন নি। তাঁকে যেতে হল। এ রকম যাওয়া আসা লেগেই থাকে।

অন্যান্য বারের মত এবারেও সেক্রেটারী, উপাধি থেকে যতটা বোঝা যায়, অব্রাহ্মণদের আগেই সরিয়ে দিলেন। যাঁরা রইলেন, তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত গুণাবলী এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সঙ্গে কোন্ অঞ্চলের, কি রকম স্তরের লোক, এসব বিষয়েও যথাসম্ভব বিবেচনা করে একজনকে যখন নির্বাচিত করে ফেলেছেন, তখন এস্. ডি. ও. এসে উপস্থিত।

যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদির পর আলোচ্য বিষয়ে এসে সেক্রেটারী বললেন— আমরা একজনকে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। আপনি অনুমোদন করলেই হয়।

ঐ একখানা দরখাস্তই এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্টের সামনে। তিনি সেটার সঙ্গে অন্য আবেদনগুলোও দেখতে চাইলেন। একটি একটি করে সব পড়লেন, লাল নীল পেন্সিল দিয়ে দু-চারটে দাগ দিলেন এখানে-ওখানে। তার পর একখানা বেছে নিয়ে বললেন—সব দিক বিচার করে দেখলে এ'কেই নিতে হয়। আপনারা যাকে সিলেক্ট করেছেন তার এবং অন্য সকলের চেয়ে এই ভদ্রলোকই সব বিষয়ে বেশী উপযুক্ত।

মেম্বাররা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, কিন্তু এস. ডি. ও.র কথার উপরে কথা বলতে কেউ এগিয়ে এলেন না। প্রেসিডেণ্ট তাঁর হাতের দরখাস্ত-খানার উপর 'নির্বাচিত' কথাটা লিখে তার সঙ্গে নিয়োগপত্র পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

সেক্রেটারী পাশেই বসে ছিলেন। উঁকি মেরে নামটা একবার দেখেই তাঁর সারা মুখখানা প্রথমে ঘৃণায় কুঞ্চিত এবং তার পরেই ক্রোধে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। অন্য মেম্বার যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের আর নাম দেখবার দরকার হয় নি। সেক্রেটারীর মুখের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের হাবভাব থেকে একটা কথা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এর পরে আর কিছু করবার নেই।

ব্রজসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের হেড মাস্টার হয়ে এলেন জ্ঞানচন্দ্র বসাক। আসবার কদিন পরেই বুঝলেন, না এলেই বোধ হয় ভাল করতেন। হয়তো প্রথম সুযোগেই ফিরে যাবার আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্বাচনের ইতিহাসটুকু কানে যেতে কি মনে করে নিরস্ত হলেন। কানে যে দিল সে-ও তাঁর একমাত্র অব্রাহ্মণ সহকর্মী। শুধু অব্রাহ্মণ নয়, অহিন্দু—স্কুলের মৌলবী, হেদায়েত আলি। পাশের দু-একটা গ্রাম থেকে কজন মুসলমান ছাত্র পড়তে আসত। তাদের সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ ছিল আরবী কিংবা পারসী। সুতরাং একটি মৌলবী রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। সে-ই একদিন নতুন মনিবকে

সেলাম জানাবার ছলে তাঁর নিয়োগ-রহস্যটা চুপি চুপি উদ্ঘাটিত করে এল। তার দু-একদিন পরেই মহকুমা হাকিসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন হেড মাস্টার। সেক্রেটারীকে জানিয়ে গেলেন। কারণ দেখালেন, কাজে যোগ দেবার পর স্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে আসাটা হেড মাস্টারের প্রথম কর্তব্য। স্কুলের স্বার্থেও প্রয়োজন। কে কী রকম লোক কে জানে? হয়তো না গেলে ভিতরে ভিতরে চটে থাকবে।

যুক্তিটা শুনে গেলেন সেক্রেটারী, কোনো মন্তব্য করলেন না। শুধু নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন—তা বেশ।

জ্ঞানবাবু ফিরে আসবার পর তাঁর কথাবার্তা, চালচলন দেখে সেক্রেটারী এবং অন্যান্য মেম্বারদেরও ধারণা হল, দেখাটা শুধু দেখা নয়, তার মধ্যে অন্য উদ্দেশ্যও ছিল, এবং তার কিছুটা অন্ততঃ হাসিল করে ফিরেছে। একে বেশী ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

শুকচর এবং তার আশেপাশে কয়েকখানা গ্রাম জুড়ে বিশাল ব্রাহ্মণসমাজ। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন—একটা কিছু প্রায়ই লেগে আছে। বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানেই গোটা সমাজ নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্কুলের হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্ররাও তার অন্তর্ভুক্ত। নিমন্ত্রণ মানেই মধ্যাহ্নভোজন অর্থাৎ বেলা একটা-দুটোয় ডাক পড়ে। যেহেতু প্রায় পনের আনা ছাত্র ব্রাহ্মণ, বারোটার সময় গোটা স্কুল ছুটি হয়ে যায় এবং এরকম উপলক্ষ মাসে অন্ততঃ দু-তিনটা কিংবা কখনো কখনো তার বেশীও দেখা দেয়।

জ্ঞানবাবুর আমলে প্রথম নিমন্ত্রণ যেদিন এল, তাঁকে এই চিরাচরিত প্রথা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলেন তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের সকলেরই যে এ ব্যাপারে মনে মনে সমর্থন ছিল তা নয়। অপছন্দ হলেও এত দিন সেটা ছিল অব্যক্ত। আজ হেড মাস্টারের মনোভাবটা আঁচ করে কেউ কেউ গোপনে মুখ খুললেন তাঁর কাছে। কেউ কেউ আবার ব্যাপারটাকে সম্ভাবিত বিরোধের ইন্ধন হিসাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। হেড মাস্টার সেদিন আগের মত বারোটার সময় ছুটির ঘণ্টা দিতে বলে দিলেন।

পরদিন ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ হাজির হল—ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণে যোগ দেবার জন্যে কোন ছাত্রকেই অসময়ে ছুটি দেওয়া হবে না।

বহুকালের প্রথা। এযাবৎ কোনো হেড মাস্টার আপত্তি করেন নি। হঠাৎ একেবারে বন্ধ করে দেওয়ায় একটা চাপা আন্দোলন জেগে উঠল। কেউ কেউ জ্ঞানবাবুকে বোঝাতে এলেন, ব্রাহ্মণসমাজ রুষ্ট হবেন এবং তার ফলে স্কুল ভেঙে যেতে পারে। হেড মাস্টার সব শুনে গেলেন কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। রফা হিসাবে অনেকে প্রস্তাব করলেন, এক ঘণ্টা আগে অর্থাৎ তিনটা নাগাদ ছুটি দেওয়া হউক। তাতেও তাঁকে রাজী করানো গেল না।

ঘটনাক্রমে ঠিক এর পরের নিমন্ত্রণটা এল স্বয়ং সেক্রেটারির বাড়ি থেকে। তাঁর নাতির অন্নপ্রাশন। তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর কমিটির দুজন সম্ভ্রান্ত মেম্বার হেড মাস্টারকে অনুরোধ করতে এলেন—এবারটাকে বিশেষ

উপলক্ষ মনে করে তাঁর অর্ডার যেন কিছুটা শিথিল করা হয়। জ্ঞানবাবু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

অনেকে ভেবেছিল এর পরে প্রকাশ্য গোলমাল অনিবার্য। কিন্তু কিছুই হল না। চারদিকের উত্তাপ বরং ধীরে ধীরে জুড়িয়ে এল। এখানে-ওখানে যে-সব প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল, তাও পড়ে গেল। ক্রমে এতেই ধাতস্থ হয়ে গেল ছেলেরা। কোনো কোনো বাড়িতে মাস্টার ও ছাত্রদের ছুটির পরে কিংবা রাত্রিতে খাওয়াবার ব্যবস্থা হল।

কমিটির দু-একটি মেম্বার এই নিয়ে হেড মাস্টারের কৈফিয়ৎ তলবের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারি ধ্যানেশ রায় সেদিকে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মিটিং ডাকলেই এস্. ডি. ও. এসে হাজির হবে, এবং তারপর যা হবে, সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সেই 'ছোকরা' যতদিন না অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে, ততদিন সব কিছু নীরবে সয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিছুদিন যেতেই আর একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করলেন হেড মাস্টার।

তাঁকে নিয়ে দুজন মাত্র গ্র্যাজুয়েট। বাকী যিনি তিনি বি. এস-সি., ঐ গ্রামেই বাড়ি, অনেক বয়স, চোখে রীতিমত ঝাপসা দেখেন, শরীরও দুর্বল। কিন্তু স্বাস্থ্য বা চোখের জোর না থাক, নিস্তারণবাবুর জোর ছিল অন্যত্র, অর্থাৎ আসল জায়গায়। তিনি একজন প্রভাবশালী মেম্বারের নিকট-আত্মীয়, সেক্রেটারীর সঙ্গেও কিঞ্চিৎ দূরসম্পর্ক দাবি করতেন। তাঁর কাজ ছিল উপরের দিকে তিন ক্লাসে অঙ্ক পড়ানো। অর্থাৎ লিখিত রুটিন অনুসারে তাই। কিন্তু আসলে তিনি বরাবর একটি অলিখিত রুটিন অনুসরণ করে এসেছেন। ক্লাসে ঢুকেই হাঁক দিতেন—অমুক চ্যাপটার থেকে অত নম্বর অঙ্কটা কর। জ্যামিতির দিন বলতেন—অত নম্বর উপপাদ্যটা বই না দেখে লিখে ফেল। বলেই পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিতেন। ছেলেরা অঙ্কের বদলে গল্প-গুজব করত। প্রথমে কিছুক্ষণ তাই নিয়ে দু-চার মিনিট তর্জনগর্জন করতেন মাস্টারমশাই। ছেলেরা কিছুমাত্র ভড়কাত না। তাদের জানা ছিল, তার পরেই শোনা যাবে তাঁর নাসিকা-গর্জন। সেটা যখন শেষ হবে, তখন পিরিয়ডও শেষ।

নতুন হেড মাস্টার আসবার পর তিনি তাঁর চিরাচরিত রুটিন বদলাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে আর কদ্দিন? জ্ঞানবাবু ওসব নিয়ে কিছু বললেন না। একদিন একান্তে ডেকে নিয়ে বিনীতভাবে পরামর্শ দিলেন—আপনি কিছুদিন ছুটি নিন, মাস্টারমশাই।

নিস্তারণবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন—আজ্ঞে?

—আপনার শরীরের জন্যেই বলছি। অনেকদিন একনাগাড়ে কাজ করে এসেছেন, এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

নিস্তারণবাবু মনে মনে বুঝলেন, যে ছুটি তাঁকে দিতে চাইছেন হেড মাস্টার, তার শুরু আছে, শেষ নেই, এবং সেটা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে

না। কিন্তু বাইরে সেটা মেনে নেওয়া যায় না, বিশেষতঃ তিনি যখন একেবারে অসহায় নন। একটু জোরের সঙ্গেই বললেন—ছুটির তো তেমন দরকার বোধ করছি না।

—করছেন না ?

—নাঃ। শরীর আমার ভালোই আছে।

কমিটির কানে যখন কথাটা গেল, অনেকেই ওঁকে ভরসা দিলেন—ছুটি নেবেন না আপনি। দেখি ও কি করতে পারে। মগের মুলুক পেয়েছে নাকি ?

পরের সোমবার যথারীতি ক্লাস নিতে যাচ্ছিলেন নিস্তারণবাবু, দপ্তরী এসে একটা বাঁধানো খাতা রাখল তাঁর সামনে।

—কী এটা ?

—হেড মাস্টারবাবু দিলেন।

এক নজর দেখেই চোখ দুটো জ্বলে উঠল। ক্লাসে না গিয়ে ছুটলেন হেড মাস্টারের ঘরে। খাতাটা সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন—এটা কী করেছেন ?

—পড়ে দেবো কি ? নিরুত্তাপ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন হেড মাস্টার।

—নাইন-টেনে অঙ্ক পড়াবে কে ? প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগেকার সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন নিস্তারণবাবু।

—ওতেই রয়েছে। আমি।

—আপনি !

দুটি শীর্ষশ্রেণীতে কম্পালসরি এবং অপ্‌শনাল ম্যাথেমেটিক্‌স্‌ পড়াবার ভার হেড মাস্টার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন, নিস্তারণবাবুর হাতে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ ক্লাস এইট এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নীচের আর একটা ক্লাস। সারাদিনে এই তাঁর কাজ—পাঁচ পিরিয়ডের জায়গায় মাত্র দু পিরিয়ড। আগের চেয়ে অনেক হালকা কাজ। তাঁর তো খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু কাজের পরিমাণটাই কি সব ? তার গুরুত্ব বা ইম্পর্টান্স বলে একটা কথা আছে, এবং সেটা ওজনের ওপর নির্ভর করে না, ঘণ্টা মিনিট দিয়েও মাপা যায় না।

তাঁর এই লঘুকরণ অর্থাৎ কার্যতঃ পদাবনতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারতেন নিস্তারণবাবু, যদি তাঁকে হটিয়ে অন্য কোনো শিক্ষককে সেখানে বসানো হত। কিন্তু সে পথও বন্ধ করে দিয়েছেন হেড মাস্টার। সে জায়গাটি তিনি নিজেই দখল করেছেন। তাই নিস্তারণবাবুর উত্তেজনা আপনা থেকেই নেমে এল। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বিস্ময় (তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা হতাশাময় ক্ষোভ) প্রকাশ করলেন—আপনি অঙ্ক পড়াবেন !

—দেখি চেষ্টা করে।

দীর্ঘ ছুটির আবেদন ছাড়া তাঁর আর কোনো রাস্তা রইল না। হেড মাস্টার তার উপর যে নোটটি দিলেন, তার মধ্যে সেটা অবিলম্বে গ্রহণ করবার জোর সুপারিশ তো রইলই, তার সঙ্গে আর যা রইল তার মধ্যে নিস্তারণবাবুর বিরুদ্ধে

কিছু না থাকলেও তাঁর ফিরে আসার পথটি যে এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কমিটির প্রতিটি মেম্বারই তা জলের মত স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কিন্তু কেউ কোনো কথা বললেন না। সেক্রেটারীও গম্ভীরভাবে সই করে দিলেন।

লড়াই থেমে যাবার পর টেবিলের দুদিকে বসে দুপক্ষ যখন সন্ধিপত্রে সই করেন, তখন যে পক্ষ বাধ্য হয়ে সন্ধি করছেন, তাদের মুখেও ঠিক এই গাম্ভীর্য ও নীরবতা দেখা যায়। তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারে, তার একটিমাত্র অর্থ—এখানেই শেষ নয়।

ব্রজসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজিং কমিটি, বিশেষ করে তার প্রতিষ্ঠাতা জমিদার বংশের সুযোগ্য প্রতিনিধি ধ্যানেশরঞ্জন রায়ও ব্যাপারটাকে ঐখানে শেষ হতে দেন নি। তাঁরা নীরবে অপেক্ষা করে ছিলেন। শুধু ঐ একদিনের একটি ঘটনা নয়, তার আগে ও পরে বহু ঘটনার জের টেনে টেনে চলেছিলেন।

যতীশের নিয়োগটাও অনেকখানি তার মধ্যে পড়ে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তার উপরে কেউ বিরূপ ছিলেন না। কিন্তু যেভাবে তাকে আনা হল, অর্থাৎ যে অতি-তৎপরতার সঙ্গে নিস্তারণ মৈত্রের শূন্যস্থান পূরণ করা হল, সেটা তাঁরা স্বেচ্ছায় মেনে নেন নি। এখানেও একরকম বাধ্য হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন।

নীতীশ যখন এল, তখন স্কুলের ছোট বড় সবকিছুতেই জ্ঞানচন্দ্র বসাকের অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু বাইরে থেকে সেই ছোটখাটো শান্ত মানুষটিকে দেখে কিছুই বোঝা যেত না, ভিতরে ঢুকলেই টের পাওয়া যেত সেটা কী এবং কতখানি। নীতীশ তাঁকে বেশীদিন পায় নি। কিন্তু যে কটা মাস ছিলেন তার এবং অন্যান্য অনেক ছেলের সারা মন জুড়ে ছিলেন। সে নীচের দিকে পড়ে, হেডমাস্টার তার কাছে অনেক দূরের মানুষ। তবু প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করত তিনি আছেন, এবং স্কুলের প্রতিটি কোণ সে সম্বন্ধে সজাগ।

তারপর একদিন তিনি চলে গেলেন। সকলের চোখের উপর দিয়ে, কিন্তু কারো দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। তিনশ সাড়ে তিনশ ছেলে, পনর-ষোল জন মাস্টারমশাই, আরো কত লোক, কেউ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল। একটি 'টুঁ' শব্দ কারো মুখ থেকে শোনা গেল না। যেন একদল পাথরের পুতুল!

শুধু চলে যাওয়াটা যত বড় দুঃখেরই হোক, তার চেয়ে সেদিন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল—যে কারণে, যে-ভাবে তিনি চলে গেলেন। ঐটুকু বয়সেই মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে নীতীশের মনে যে অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছিল তার সবখানিই উজ্জ্বল নয়। সেইদিন দেখল তার এক কালো কঠোর কলঙ্কময় রূপ!

নতুন মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন হেড মাস্টার। আগেকার সেই ছোকরা এস্. ডি. ও. বদলি হয়ে গেছেন। ইনি এসেছেন সম্প্রতি। তার পরে আর স্কুল কমিটির কোনো মিটিং হয় নি। নবাগত প্রেসিডেণ্টকে একবার সেলাম জানিয়ে আসা প্রয়োজন। কথাটা ধ্যানেশ রায়ই বুঝিয়েছিলেন জ্ঞানবাবুকে। তাঁকে যেতে হয়েছিল।

শনিবার রাত্রে গিয়ে রবিবার দুপুরের দিকে ফিরে এলেন। বাসার সামনে

ভিড়। কাকে যেন গোল হয়ে ঘিরে আছে কতকগুলো লোক। দূর থেকে দেখে একটু অবাক হলেন মনে মনে। কিছুটা আশঙ্কাও হল—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো? বাসায় স্ত্রী একা। তিনি আবার বেশ কিছুটা সেকেলে, ভীষণ পর্দা মেনে চলেন, অর্থাৎ লোকজনের সামনে বেরোন না। অবশ্য গ্রামের লোকজনও বড় একটা আসে না তাঁর বাড়ি। মেয়েরাও না। বাসাটাই যে শুধু পাড়া থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন তাই নয়, তিনিও ওখানকার সমাজজীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে আছেন।

কাছে আসতেই চোখে পড়ল কে একজন মেয়েছেলে বসে আছে বরজার সামনে, চারদিকে লোক। তাদের চোখেমুখে চাপল্য ও কৌতূহল, যেন একটা কিছু মজার সন্ধান পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বসাক মশাই। ভয়ের কিছু নয়।

শুনলেন, একজন লোক মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে—কবে গিয়েছিলেন বাবু তোমার কাছে?

—চার-পাঁচ দিন আগে।

—বাবুকে দেখে চিনতে পারবে?

মেয়েটির জবাব পাবার আগেই জ্ঞানবাবু সামনে এসে পড়লেন। জানতে চাইলেন—কী ব্যাপার? কী চাই তোমাদের?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। সেই লোকটি—জ্ঞানবাবু তাকে রায়বাবুদের কাছারি-বাড়িতে দেখেছেন, ওখানকার কর্মচারী—স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করল—দ্যাখ তো এই সেই বাবু কিনা?

সে একবার চোখ তুলে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে বলল—হ্যাঁ।

—ছিঃ ছিঃ মশাই, হেড মাস্টারের দিকে ফিরে ধিক্কারের সুরে বলে উঠল সেই কাছারির আমলা—আপনি একজন শিক্ষক, আপনার এই কাণ্ড! তাও আবার টাকা বাকী রেখে এসেছেন!

স্ত্রীলোকটির পায়ে চটি জুতো, অশালীন চেহারা, পোশাক, চাহনি ইত্যাদি এক পলক দেখেই জ্ঞানবাবু তার পরিচয়টা ধরতে পেরেছিলেন। বাজারের একধারে এদের ডেরা, এর মতো আরো কজন। চটি পায়ে, সায়া ছাড়া মিহিকাপড় পরে হাটের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেই অশোভন বেশবাস, হাবভাব তাঁর চোখেও পড়ে থাকবে। একবার তার দিকে, একবার লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখলেন। একজনকেও চেনেন বলে মনে হল না। সবাই বোধহয় ভাড়া করা। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। পরক্ষণেই আত্মস্থ হলেন। এখানে বিচলিত হলে চলবে না। ধীর শান্ত কণ্ঠে স্ত্রীলোকটিকে বললেন—কত দিতে হবে তোমাকে?

পকেট থেকে মনিব্যাগটা বের করলেন। মেয়েটা একটু অবাক হয়ে তাকাল। ঠিক এই জিনিসটা বোধহয় সে ধারণা করতে পারে নি। হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না। এবার সেই আমলাটির দিকে ফিরলেন হেড মাস্টার—আপনি বলতে পারবেন? এরা কত পায়, আমি তো জানি না।

সে-ও যেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। বাদ-প্রতিবাদ চেঁচামেচি রাগারাগি —এ সব সে বোঝে, তাতেই বরাবর অভ্যস্ত এবং তার জন্যে বোধহয় তৈরী হয়েও এসেছিল। কিন্তু এ কী! এতবড় একটা মিথ্যা জঘন্য কলঙ্ক প্রকাশ্যে এতগুলো লোকের সামনে নিঃশব্দে মেনে নিতে পারে কোনো মানুষ, নিজের চোখে দেখেও বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না। এক পা দু পা করে পিছিয়ে গিয়ে হঠাৎ চম্পট দিল। যারা মজা দেখতে এসেছিল, তারাও ব্যাপারটা জমল না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড করল নাটকের যেটি আসল পাত্রী। নিজেকে একা দেখে ভয়ে ভয়ে একবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর এমনভাবে ছুটে বেরিয়ে গেল যেন পিছন থেকে কেউ তাকে তাড়া করেছে।

কিন্তু এর চেয়েও অভাবনীয় দুর্ঘটনা পরমুহূর্তেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, জ্ঞানবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি।

বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন গৃহিণী—আকস্মিক মৃত্যু-শোকে মানুষ যেমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে,—আমার কপালে এই ছিল গো, এসব দেখবার আগে আমার মরণ হল না কেন?

বসাক থমকে দাঁড়ালেন—এতদূর এগিয়ে গেছে ওরা! এতবড় সর্বনাশের পরেও প্রতিপক্ষকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না। কী সুনিপুণ অস্ত্রবিদ্যা! ওরা জানে, ঠিক কোন্ জায়গাটিতে আঘাত হানলে শত্রুকে সবচেয়ে বেশী কাবু করা যায়!

সংসারাভিজ্ঞ বিচক্ষণ মানুষ জ্ঞানচন্দ্র বসাক। নারীচরিত্রের স্পর্শকাতর দুর্বল স্থানটি তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। তবু অভিমান হল স্ত্রীর উপর। এত ঠুনকো তার বিশ্বাস! এতগুলো বছর একসঙ্গে ঘর করবার পর এত সহজে ভেঙে পড়ল। চাপা তিরস্কারের সুরে বললেন—কী ছেলেমানুষি করছ! ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?

—খুব বুঝেছি—ফেটে পড়ল অশ্রুরুদ্ধ গর্জন, এখ্খুনি আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও। নৈলে গলায় দড়ি দেবো।

তাঁর মা তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু সক্ষম ছিলেন না নিশ্চয়ই। কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুতও বোধহয় ছিলেন না। তবু সবচেয়ে বড় দুঃখের দিনে সব মানুষেরই বোধহয় মাকে মনে পড়ে।

পরদিনই চলে গেলেন হেড মাস্টার। দশটার সময় স্কুলে গিয়েই ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দিলেন সেক্রেটারীর কাছে। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরে এলেন। স্কুলের দপ্তরী ওঁর বাড়িতেই থাকত। রবিবার দিন বাড়ি গিয়েছিল, সোমবার সকালে ফিরে এসেছে। এদিকের খবর কিছুই জানত না। সে-ই গিয়ে একটা গোরুর গাড়ি ডেকে নিয়ে এল। সামান্য মালপত্র। তার সঙ্গে দীর্ঘ ঘোমটাঘেরা স্ত্রীকে তুলে দিয়ে, নিজে পিছনে হেঁটে রওনা হলেন। স্কুলের সামনে দিয়ে পথ। ছেলেরা এসে ভীড় করল। মাস্টারমশাইরাও এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কারো মুখের দিকে তাকালেন না। কাউকে সামান্য সম্ভাষণটুকুও করলেন না। সামনের পানে চেয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন।

কর্তৃপক্ষের এই হীন অপচেষ্টার কাছে কখনো মাথা নোয়াতেন না জ্ঞানচন্দ্র বসাক। অতবড় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে বিজয়ীর মত গিয়ে দাঁড়াতেন স্কুলের দরজায়। কাজ করে যেতেন। কিন্তু এই আরোপিত কলঙ্কের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে হলে সকলের আগে জোর আসবে যেখান থেকে সেখানটা যে তাঁর প্রথমেই ধসে পড়েছে। যে আস্তণ অটুট থাকলে দুনিয়ার অনাস্থাকে অগ্রাহ্য করা যায়, সেইখানেই যে ভাঙন। তাই মিথ্যার কাছে হার মেনে অপরাধীর মত চলে গেলেন।

নীতীশ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। কত সব অসম্ভব কল্পনা তার মাথার মধ্যে খেলে যেতে লাগল। এমন কিছু ঘটবে, কোন আকস্মিক দৈবানুকূল্য যাতে করে আবার ফিরে আসবেন মাস্টারমশাই। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

সেই রাত্রেই বিরাট ভোজের আয়োজন হল সেক্রেটারীর বাড়ি। বড় বড় খাসী মারা হল। অন্যান্য মাস্টারদের সঙ্গে যতীশেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সে-ই তখন হেড মাস্টার, যতদিন অন্য নিয়োগ না হয়। ভোজসভায় তার উপস্থিতি সকলের আগে। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিতেরা আহারে বসবার আগে তার কাছে বিশেষ দূত পাঠালেন ধ্যানেশ রায়। যতীশ বলে পাঠাল, শরীর ভালো নেই।

লোকটি যখন ফিরে এসে জানাল, ধ্যানেশবাবুর প্রশস্ত কপালে কয়েকটা কুণ্ডন-রেখা দেখা দিল। কারো নজরে পড়ল কি পড়ল না। মুহূর্তকাল। পরক্ষণেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, এবং অনুগত অতিথিদের নিয়ে আনন্দোৎসবে মিশে গেলেন।

হেড মাস্টার মশায়ের এইভাবে চলে যাওয়াটা নীতুর মনকে এমন নাড়া দিয়েছিল যে মায়ের কাছে পরের চিঠিতে তার উল্লেখ না করে থাকতে পারে নি। সব কথা অবশ্য বলে নি। একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফলে গভীর লাঞ্ছনা নিয়ে হঠাৎ চলে গেছেন, সেটুকুই শুধু জানিয়েছিল। তার সঙ্গে আরেকটা খবর ছিল, এবং সেটা আনন্দের—"মেজদাদা হেড মাস্টার হইয়াছেন।"

মনোরমার কাছে ঐটাই আসল খবর। উত্তরে দেবনাথের বিদ্যায় যতখানি কুলোয় এবং একখানা পোস্টকার্ডের পৃষ্ঠায় যতটা আঁটে, ছেলের উন্নতির জন্যে বার বার আহ্লাদ প্রকাশ করলেন, ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং শেষের দিকে একটি আদেশ করলেন কনিষ্ঠ পুত্রকে। নীতীশ বড় বিপদে পড়ল। অথচ না মেনেও উপায় নেই। মা লিখে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া তাদের কুলদেবতা স্বয়ং নারায়ণ জড়িয়ে আছেন তার মধ্যে।

সারাদিন গেল নিজেকে তৈরী করতে। একে ভীষণ লাজুক, তার উপরে দাদাকে রীতিমত ভয় করে। বয়সের তুলনায় যতীশও বেশ খানিকটা গম্ভীর এবং রাশভারী। ছোট ভায়ের উপর তার স্নেহের অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু তার অভিব্যক্তি বড় সংযত। ব্যবহারে, কথাবার্তায় সামান্য আবেগ বা উচ্ছ্বাস কখনো

প্রকাশ পায় না।

সন্ধ্যার পর মেজদা বেড়িয়ে ফিরলে নীতীশ ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়াল। ইতস্ততঃ করতে লাগল। যতীশ বলল—কিছু বলবি ?

—আমাকে—আমাকে একটা টাকা দিন।

—টাকা! রাত্তিরে টাকা দিয়ে কী করবি ?

—না আমি নয়, মানে আমার কোনো দরকার নেই, মা লিখেছেন—

—কী লিখেছেন মা ?

—লিখেছেন টাকাটা তোর দাদার—

বাকীটা আর বলা হল না। একরাশ লজ্জা এসে জিভটা জড়িয়ে ধরল।

—আচ্ছা বোকা তো! কই, চিঠিটা কই ?

এবার যেন ধড়ে প্রাণ এল। ছুটে গিয়ে বালিশের তলা থেকে পোস্টকার্ডখানা এনে দাদার হাতে তুলে দিল। যতীশ পড়তে পড়তে চোখ না তুলেই খুশির সুরে বলল—এরি মধ্যে খবরটা দেওয়া হয়ে গেছে?…ও, এই ব্যাপার! মারও যেমন কাণ্ড!

হাসি মুখে উঠে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে একটা রুপোর টাকা বের করে ভায়ের হাতে দিল। তারপর তক্তপোশের উপর বসে পড়ে মাথাটা একটু নীচু করে বলল—নে।

নীতু হাত বাড়িয়ে টাকাটা আস্তে দাদার কপালে ঠেকিয়ে যখন ভাবছে এবার কি করবে, যতীশ বলল—ওটা তোর সুটকেসেই রেখে দে। বাড়ি গিয়ে মাকে দিস।

নীতু চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে দাদার ডাক শুনতে পেল—শোন। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। যতীশ তার কণ্ঠায় হাত দিয়ে বলল—অত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন ? পেট ভরে খাস না বুঝি ?

নীতীশ জানে প্রশ্নটা একেবারে অর্থহীন। দুবেলা এক সঙ্গেই তারা খেতে বসে এবং সে যতই 'না' 'না' করুক, মেজদার নির্দেশে ঠাকুর পাতে অনেক কিছু চাপায়—দুমুঠো বেশী ভাত, একখানা বাড়তি মাছ, কিংবা খানিকটা দুধ। না খেলে সেখানে বসেই ধমক খেতে হয়।

পেট ভরে খায় না—এহেন অনুযোগের কী উত্তর দেবে সে? মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এর পর যতীশ, কখনো যা করে না, হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। কপালে, গালে ঘন কোঁকড়া চুলগুলোয় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—পড়গে যা।

দু-তিন দিনের মধ্যেই পর পর তিনখানা চিঠি পেল যতীশ। মা লিখলেন—যথারীতি আশীর্বাদ ইত্যাদির পর, এবার তোমাকে অন্য বাসায় যাইতে হইবে। সেখানে বেশী ঘর আছে। বেতনও কিছু বেশী পাইবে। যদি মত কর, আমি গিয়া থাকিতে পারি। ঠাকুর রাখিবার দরকার হইবে না। এখানকার সংসার ইহারাই চালাইতে পারিবে।

দাদা লিখলেন—তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। আজ যদি স্বর্গীয় পিতাঠাকুর জীবিত থাকিতেন,···ইত্যাদি। তার পরের অংশটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। জিনিসপত্রের দাম রোজ রোজ বাড়িয়া চলিয়াছে। জমির তেমন ফলন নাই। কিছু টাকা না বাড়াইলে সাংসারিক ব্যয়নির্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা উচিত বিবেচনা হয় করিও।

তৃতীয় চিঠিখানা ফুলির। লেখক দেবনাথ। বেশ গুছিয়ে মুন্সিয়ানার সঙ্গে লিখেছে—আমার সেই ভগ্নীটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পিসীমাতা আমাদের আশায় অনেকদিন বসিয়াছিলেন। কিন্তু চারিদিকে নিন্দা হইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া বিবাহ দিয়া দিলেন। তাহার পরেরটিও বেশ ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, রং খুব ফর্সা না হইলেও মুখ-চোখ ভাল, গড়নও বেশ গোলগাল। এবার আর কোনো ওজর-আপত্তি শুনিব না। তোমার মত পাইলেই উনি মেয়ে দেখিতে যাইবেন।

অর্থাৎ ফুলির হাত থেকে নিস্তার নেই। এ ভগিনীটিও যদি ফসকে যায়, পরেরটি 'ততদিনে ডাগর হইয়া উঠিবে।

যার উপর ভিত্তি করে এই চিঠিগুলো রচিত, তার সেই অস্থায়ী হেড মাস্টারির মেয়াদ যে মাত্র দিন কয়েকের, সে খবর এঁরা কেউ জানেন না। জানাতে গেলেও ঠিক বুঝবেন না। মা নিরাশ হবেন, দাদা অন্য অর্থ করবেন, ফুলি আঘাত পাবে। তাই এ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়ে যতীশ তিনজনকেই আগামী গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লিখে দিল।

তার আর মাস তিনেক বাকী।

এর মধ্যেই তাকে স্বস্থানে অবতরণ করতে হবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থায়ী হেড মাস্টার নিয়োগে দেরি হতে লাগল।

জ্ঞানবাবু চলে যাবার কদিন পরেই নোটিস এল, ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেকটর আসছেন। বাৎসরিক নয়, বিশেষ পরিদর্শন। কমিটি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অন্য কোথাও কোনো ত্রুটি বা গলদ নেই। বসাক লোকটা চালিয়ে গেছে ভালোই। কিন্তু একজন মাত্র গ্রাজুয়েট। তা নিয়ে কড়া মন্তব্য করে বসতে পারে। তাদের তরফে উপযুক্ত কৈফিয়ত অবশ্য আছে। কিন্তু কী রকম লোক কে জানে? না-ও শুনতে পারে। তেমন কিছু একটা লিখে বসলে 'এড্' নিয়ে টানাটানি।

গ্রামের একটি গরিব ছেলে বি. এ. পাস করে বসে ছিল। অঙ্কে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স, এম্. এ. পড়বার সঙ্গতি নেই। সুবিধামত চাকরিও জোটাতে পারছিল না। 'ব্রজসুন্দরী'র দিকে সে নজর দেয় নি। জানত, এখানে দরকার একটি নতুন হেড মাস্টার। যতীশবাবু যদি স্থায়ীভাবে প্রমোশন পেতেন, তখন না হয় চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ একদিন ধ্যানেশবাবুর বৈঠকখানায় তার ডাক পড়ল। তখনো কিছু বুঝতে পারে নি। তারপর একেবারে অবাক হয়ে গেল। তদ্বির নেই, খোশামোদ নেই, একখানা দরখাস্ত পর্যন্ত নেই, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে চাকরির অফার! এমন কাণ্ড কে

কোথায় শুনেছে !

ইন্‌স্‌পেকটরটি একসময়ে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। অন্য অনেকের মত তাঁর পরিদর্শন শুধু স্কুলের বাড়িঘর, চেয়ার-বেঞ্চি, আর্থিক অবস্থা এবং পরিচালনা কমিটিতে সীমাবন্ধ থাকত না, ছেলেদের পড়ানো কাজটা কেমন চলেছে, সেদিকেও তিনি বিশেষ নজর দিতেন। একটা দিন নির্দিষ্ট থাকত ঐ জন্যে। স্কুল রোজ যেমন চলে, তেমনি চলবে। তিনি একা ক্লাসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবেন। এখানে তরুণ হেড মাস্টার এবং আরো দু-একজন শিক্ষকের শিক্ষকতার কাজ দেখে খুশী হলেন এবং সে সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্যও করে গেলেন তাঁর রিপোর্টে। রিপোর্টটা কমিটির প্রেসিডেণ্ট এস্‌. ডি. ও. সাহেবের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল, তিনি নতুন হেড মাস্টার নিয়োগের ব্যাপারে তেমন গা করলেন না। সেক্রেটারীর তাগিদ পেয়েও হবে হবে করে সময় নিতে লাগলেন।

গ্রীষ্মের ছুটির আর কদিন মাত্র বাকী। স্কুলে ফুটবলের মরসুম চলছে। ওটা ছুটির আগেই সেরে ফেলতে হয়। বন্ধের মধ্যেও খেলা চলে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। স্কুল টীম তখন চালু থাকে না।

এবারে একটি নতুন কম্‌পিটিশনের আয়োজন করেছেন নতুন হেড মাস্টার। ইণ্টার-ক্লাস টুর্ণামেণ্ট্। দুটো ডিভিশনে খেলা হচ্ছে। ‘এ’-তে রয়েছে ক্লাস টেন থেকে সেভেন, আর ‘বি’-তে খেলছে সিক্‌স্ থেকে থ্রী। দুটো কাপ দেওয়া হবে। তার মধ্যে একটার ডোনার স্বয়ং হেড মাস্টার, আরেকটা দিচ্ছেন গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, খেলাধুলায় তাঁর ভীষণ ঝোঁক। এই ব্যাপারে ছেলেদের এবং কিছু কিছু মাস্টার মশায়ের মধ্যেও প্রবল উৎসাহের জোয়ার এসে গেছে।

‘বি’ ডিভিসনের খেলা শেষ হয়েছে, এবার ‘এ’ ডিভিসনের ফাইন্যাল। একদিকে ‘টেন’, আরেকদিকে ‘এইট’। ‘এইট’-এর খেলোয়াড়েরা বয়সে ছোট হলেও, তাদের ‘টীম ওয়ার্ক’ ভালো—ফুটবল খেলায় এই জোটই আসল। ওদিকে ‘টেন’-এ রয়েছে একজন দুর্ভেদ্য ব্যাক্ এবং গোটা দুই দুর্ধর্ষ ফরওয়ার্ড। সুতরাং কোনো পক্ষই কম যাবে না। জমাট খেলা হবে। হার-জিত নিয়ে দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা চলছে! দু-একটা ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়ে গেছে। গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়, কিছু কিছু প্রবীণেরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে ঐ দিনটির দিকে।

সাড়ে চারটায় খেলা। তিনটা বাজতেই যতীশ মাঠে গিয়ে হাজির হল। ছেলেরা তার আগে থেকেই কাজে লেগেছে। সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মাঠটাকে। ‘ট্র্যাক্’ থেকে কিছুটা দূরে চারদিক ঘিরে সারি সারি রঙীন কাগজের নিশান। একদল সুদৃশ্য ব্যাজ পরা ভলাণ্টিয়ার মোতায়েন থাকবে সেই লাইনের পাশে। তাদের কাজ হবে, দারুণ উত্তেজনায় মুহূর্তগুলোয় দর্শকরা যখন চৌহদ্দির দাগ পেরিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইবে, তাদের কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখা।

সাধারণ দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা ঘাসের উপর। বিশিষ্টদের জন্য একটা ধার

জুড়ে স্কুল থেকে বেঞ্চি এনে পেতে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই নিমন্ত্রিত। কিন্তু আসনের বেলায় কোনো ইতরবিশেষ করা হয় নি। গ্রামের বহু ভদ্রলোক এসে ঠাসাঠাসি করে বসে গেছেন।

ধ্যানেশ রায় যখন এসে পেঁছিলেন, খেলা শুরু হয়ে গেছে। যতীশের মনোযোগ ছিল সেইদিকে, সেক্রেটারীকে দেখতে পায় নি। একজন মাস্টার মশাই এসে কানে কানে খবরটা দিতেই উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। সামনের দিকে একটা বেঞ্চি খালি ছিল, সেখানটা দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল। সেক্রেটারী বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—ও গজারটা কে?

যতীশ বুঝতে পারল না। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করবার চেষ্টা করে বলল—কার কথা বলছেন?

—ঐ যে, 'গোল' না কি বলে, তার পাশে দিব্যি চেয়ার পেতে বসে আছে!

—ও-ও, হেসে ফেলল যতীশ, উনি হলেন আমাদের মৌলবী, হেদায়েত আলি। হ্যাঁ; ওঁর চেহারার সঙ্গে গজার মাছের কিছুটা মিল আছে বটে, যদিও মানুষটা একেবারে অন্যরকম।

যতীশ জানত না, অভিধাটি সে-অর্থে ব্যবহার করেন নি সেক্রেটারি। জমিদারদের বৈঠকখানায় এবং আমলা ও পাইক মহলে ওটা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রজাদের বুঝিয়ে থাকে। নামকরণের মধ্যে হয়তো কিছু তাৎপর্যও আছে। জেলের সঙ্গে মাছের যে সম্পর্ক, অন্ততঃ তখনকার দিনে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্কও ছিল অনেকটা সেই রকম। চুনোপুঁটি থেকে রুই-কাতলা—সবাই প্রথমটা প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে, যারা পারবে না, হয় জালে জড়িয়ে যাবে, কিংবা ট্যাটার মুখে ঘায়েল হবে। শুধু এক জাতের মাছ আছে, যার নাম গজার, ধরা পড়বার আগে একবার মরীয়া হয়ে তেড়ে আসে, সুযোগ পেলে কামড়েও দেয়। প্রজাদের মধ্যেও তেমনি একটা মারমুখী জাত ছিল, এবং সাধারণতঃ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাদের সংখ্যাটা ছিল বেশী। 'বাবুরা' তাদের আখ্যা দিয়েছিলেন গজার। মিলটা তাঁদের কাছে চেহারায় নয়, স্বভাবে।

অর্বাচীন হেড মাস্টার কথাটাকে হাল্‌কা ভাবে নিচ্ছে দেখে ধ্যানেশবাবু বিরক্ত হলেন। তার দিকে একটা রূঢ় দৃষ্টি হেনে বললেন,—লোকটা আমাদের প্রজা, অতি সাধারণ রায়ত। ও বসবে চেয়ারে আর আমাদের জন্যে বেঞ্চি! এ কী রকম ব্যবস্থা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এসব আপনার দেখা উচিত ছিল। সব জিনিস ছেলেদের ওপর নির্ভর করা চলে না।

ছেলেমানুষ বলে সেক্রেটারী ওকে অনেক দিন থেকেই তুমি বলে থাকেন। হঠাৎ এই আপনি সম্বোধন যে গৌরব-বোধক নয়, বরং খানিকটা বিদ্রূপাত্মক, যতীশ এবং আশেপাশে যারা ছিল, কারোরই বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু সে ধীর সংযত কণ্ঠে বলল—বন্দোবস্তটা ছেলেরা করে নি, আমিই করেছি।

—আপনি! বিস্ময়ে যেন হতবাক্ হয়ে গেলেন ধ্যানেশ রায়। কিছুক্ষণ পরে

আর একটিমাত্র শব্দ শোনা গেল তাঁর মুখ থেকে, আশ্চর্য !

গোলপোস্টের ধারে হেদায়েৎ আলির অবস্থানটা বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যতীশ বলল—মৌলবীকে ওখানে এমনি বসানো হয় নি। উনি হচ্ছেন গোল-জাজ্। রেফারীকে সাহায্য করবার জন্যে—

—জজই হউন আর ম্যাজিস্ট্রেটই হউন, বাধা দিয়ে বললেন ধ্যানেশবাবু—আমি জানি লোকটা আমাদের প্রজা। আমাদের সামনে চেয়ারে বসতে পারে না। ওকে উঠিয়ে দিন।

—সেটা তো সম্ভব নয়।

—কী বললেন ? সম্ভব নয় ? আমি বললেও না ? (যতীশের কোনো উত্তর শোনা গেল না) তার মানে, আমাকে ডেকে এনে অপমান করাই আপনার উদ্দেশ্য ! আচ্ছা—

অস্থায়ী হেড মাস্টারের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অতিমিহি শান্তিপুরী ধুতির সযত্ন-রচিত কোঁচায় একটা প্রবল ঝাঁকানি দিলেন। তারপর এধারে ওধারে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন—জ্ঞানেশ, পৃথ্বীশ, বিজয়েশ সব চলে এসো !

সবাই রায়গোষ্ঠীর লোক। আরো অনেকে ছিলেন। তাঁদের জন্যে অপেক্ষা না করেই হন হন করে বেরিয়ে গেলেন ধ্যানেশবাবু।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেউ কেউ উঠে পড়ে তাঁকে নিরস্ত করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না।

সেক্রেটারী, বিশেষ করে ধ্যানেশ রায়ের মত সেক্রেটারী যখন স্বরোষে এবং সদলবলে বেরিয়ে গেলেন, কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক (যতীশের তাঁরা শুভানুধ্যায়ী) তাকে পরামর্শ দিলেন, খেলা বন্ধ করে দাও।

যতীশ বলল—তা কী করে হয় ? ফাইন্যাল খেলা !

—কিন্তু এদিকের ফাইন্যাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারছ ? লোক-টাকে তো চেন ! না করতে পারে এমন কোনো কাজ নেই।

একজন এই প্রসঙ্গে জ্ঞানবাবুর ব্যাপারটার উল্লেখ করলেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল, খেলা বন্ধ করে দিলে 'কর্তার' রাগ পড়ে যাবে। তারপর অন্যরকম ব্যবস্থা করে আর একদিন ওটা হতে পারবে। যতীশ তাতে রাজী হল না। খেলা যেমন চলছিল, চলতে লাগল।

দু বছরের উপরের ক্লাসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ক্লাস এইট কাপ-বিজয়ী হল। হেড মাস্টারস্ কাপ। গ্রামের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, গোড়া থেকেই যিনি এই ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়ে আসছিলেন, তিনিই কাপ দিলেন। তার আগে তাঁকে সভাপতি করে একটি সংক্ষিপ্ত সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত ছিল। সূচনায় হেড মাস্টারকে কিছু বলতে হল। স্কুলের শিক্ষা তালিকায় পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোর স্থান যে ছোট নয়, এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ ছাত্রজীবন —এই কথা দিয়ে শুরু করে যতীশ এগিয়ে গেল তার আসল বক্তব্যে। বিশেষ জোর দিয়ে বলল—খেলার মাঠ আসলে বৃহত্তর জীবনের প্রতীক। এখানে জয়ী

হতে হলে যেমন সব চেয়ে বড় প্রয়োজন টীম ওয়ার্ক—নিজ নিজ জায়গায় থেকে পরস্পরের উপর নির্ভরতা, কর্মক্ষেত্রেও তাই। নিজের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেও গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করা। তার চেয়েও বড় জিনিস খেলার মাঠ থেকে যা আমরা সংগ্রহ করি, তার নাম হল Sportsman-like spirit, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, প্রতিপক্ষও আমার মত একই সুযোগ সুবিধার অধিকারী, তার উপরে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, হার-জিত কোনোটাই আমাকে বিচলিত করবে না।

সকলের শেষে যে কথাটির উল্লেখ ছিল, সেটা দর্শকদের উদ্দেশে। তার মধ্যে তার ঐদিনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ রেশ থেকে থাকবে—খেলার মাঠে খেলে আর কজন? বাকী যারা তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। তারা আসে দেখতে, এই যেমন আমরা এসেছি। আমাদেরও ঠিক খেলোয়াড়ের মন নিয়ে আসতে হবে। অন্ততঃ এই সময়টার জন্যে ভুলে যেতে হবে এখানে কে বড়, কে ছোট। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যারা খেলছে, তারা যেমন মনে রাখে না কার সামাজিক মর্যাদা কতখানি, কার আর্থিক অবস্থা কি রকম, আমরা যারা পাশা-পাশি বসে দেখছি, তাদেরও সেই কথা। সেই মনোভাব যদি না আনতে পারি খেলা দেখতে আসা নিরর্থক।

সভাপতি বললেন সকলের শেষে। তাঁর বক্তৃতার বেশির ভাগ জুড়ে রইল তরুণ হেড মাস্টারের উচ্চ প্রশংসা। শুকচর স্কুলের দীর্ঘ ইতিহাসে খেলাধুলোর প্রতি এইরকম মনোযোগ আর কখনো দেওয়া হয় নি, ছাত্র এবং তাদের অভি-ভাবকদের মধ্যেও এতটা উদ্দীপনা দেখা যায় নি। হেড মাস্টারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মকুশলতাই তার জন্য দায়ী। উপসংহারে এই আশা প্রকাশ করলেন সভাপতি—যতীশবাবু যেন সুদীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ছাত্রদের শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে যুগপৎ উন্নতিসাধন করেন।

সভার শেষে যতীশকে খানিকক্ষণ খেলার মাঠে এবং তারপর কিছুক্ষণ স্কুলে কাটিয়ে আসতে হল। বাসায় ফিরতেই নীতু একটা খাম এনে দিল তার হাতে। বলল—সেক্রেটারীর কাছ থেকে এসেছে। তারপর দুবার তাঁর চাকর এসে খবর নিয়ে গেছে আপনি ফিরেছেন কিনা।

বলতে বলতে আবার লোক এসে উপস্থিত। যতীশ চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মিনিট কয়েক ভাবল। তারপর প্যাড থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে দু-লাইন জবাব লিখে লোকটির হাতে দিয়ে দিল।

জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খেতে যাবে, তখন আবার এল সেই লোক। হাতে আর চিঠি নয়, একটা চিরকুট। দেখে শুধু গম্ভীর নয়, যতীশের সারা মুখটা প্রথমে থমথমে এবং ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করল। নীতুকে ডেকে বলল—তুই খেয়ে নে। ঠাকুরকে বল্, ভাত দিতে।

—আপনি খাবেন না?

—আমার দেরি হবে।...বলে ঘরে গিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। সামনেই একটা পোস্টকার্ড পড়ে ছিল। মার চিঠি, দুদিন আগে এসেছে। লিখেছেন, তুমি যদি ছুটি না পাও, কিছু টাকা পাঠাইয়া দিও। আমি এখান হইতে কাহারও

সহিত যাইতে পারিব।

পোস্টকার্ডখানা একবার নাড়াচাড়া করল যতীশ। মা বাসায় আসবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ওখানে অশান্তি হচ্ছে, যদিও কোনো চিঠিতে তার আভাস পর্যন্ত দেন নি। শুধু লিখছেন, তোমাদের দুই ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়ার কণ্ট হইতেছে। ঠাকুর-চাকর কি সব গুছাইয়া করিতে পারে ? ইত্যাদি। যতীশও স্থির করে ফেলেছিল, মাকে এবার আনতে হবে, কয়েকদিনের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করবে।

সেক্রেটারীর চিঠিখানা আরেকবার পড়ল, চিরকুটখানাও দেখল। তারপর জবাব লিখতে বসল। ইংরেজিতে লিখল, যেমন দস্তুর, যারা বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়—ম্যানেজিং কমিটির কাছে কৈফিয়ত দেবার মত কিছু আমি করি নি এবং দিতেও প্রস্তুত নই। আপনারা তাড়াহুড়া করে আমার আচরণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন সেটা ভুল ধারণা প্রসূত। কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে সেইটুকু শুধু বুঝিয়ে দেব, এই উদ্দেশ্যে সময় চেয়েছিলাম। কেননা, এখনই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধীরভাবে আলোচনা করবার মত পরিবেশও আজকের মিটিং-এ পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস নেই।

আপনারা যখন একদিনও সময় দিতে প্রস্তুত নন এবং এই মিটিংয়েই কৈফিয়ত সহ আমার উপস্থিতির জন্যে জিদ করছেন, তখন পদত্যাগ করা ছাড়া আমার অন্য কোনো পথ নেই।

এই চিঠিকেই আমার ইস্তফা পত্র বলে গ্রহণ করলে বাধিত হবো।

॥ ১১ ॥

চিনতে পারছ ?

নীতীশ ঘাড় নেড়ে জানাল, পারছে।

—কে বল তো ?

—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—শুধু বিদ্যাসাগর বললেও ঐ একজন মানুষকেই বোঝায়। ওটা ওঁর উপাধি নয়, নাম।

নীতীশ জানে। তার ইচ্ছা করছিল এগিয়ে গিয়ে ঐ মর্মর-মূর্তির পায়ের তলায় একটা প্রণাম রেখে আসে! মোহিনীদার সামনে কেমন লজ্জা করছিল। তাছাড়া চারদিকে লোক।

মোহিনী বলল—এই চৌকো পুকুরটার নাম গোলদীঘি। ঘুরে দেখবে নাকি ?

নীতুর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। এর থেকে অনেক বড় দীঘি সে তো শুকচরেই দেখে এসেছে। তার চেয়ে রাস্তার ওপারে ঐ বড় বড় থামগুলো, তার নীচে ফুটপাথ থেকে উঠে যাওয়া প্রশস্ত সিঁড়ির দীর্ঘ লাইন তাকে বেশী

আকর্ষণ করল। বাড়ির গড়নটাই বা কি সুন্দর! কি রকম গম্ভীর গম্ভীর দেখতে।

মোহিনী ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল—ওটা হল সেনেট হল্। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাড়ি। ওখানে কনভোকেশন হয়। কনভোকেশন কী জান?

নীতীশ জানে না! কথাটা কখনো শোনে নি। মোহিনী বুঝিয়ে দিল, যারা বি. এ. এম. এ. পাস করে, তাদের ডিগ্রী দেবার জন্যে বছর বছর মস্ত বড় সভা হয় এইখানে। চ্যান্সেলার, মানে লাটসাহেব ডিগ্রী দেন। ভাইস-চ্যান্সেলার থাকেন, ইউনিভার্সিটির কর্তারা, আরো আরো সব গণ্যমান্য লোক আসেন। বক্তৃতা হয়। তার নাম কনভোকেশন।

—আপনি তো বি. এ. পাস করেছেন। আপনাকেও এখানে এসে ডিগ্রী নিতে হয়েছিল?

—আমি? না ভাই, আমার আর আসা হল কই? গাউন ভাড়াতেই পাঁচটা টাকা বেরিয়ে যেত। মেসের দু মাসের সীট্-রেণ্ট।

একটু যেন উদাস সুর লাগলো কথাগুলোয়। দৃষ্টিটাও কেমন বিষণ্ণ। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল বিশাল বাড়িটার দিকে, জীবনে একটিবার মাত্র সেখানে সগৌরবে প্রবেশ করবার বিশেষ অধিকার পেয়েছিল, মাত্র পাঁচটি টাকার জন্যে তার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

ঐ গাউন-প্রসঙ্গেই বোধ হয় কিছু জানতে চাইছিল নীতীশ। মোহিনীদার চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। মোহিনীও এই ক্ষণেকের ভাবান্তর কাটিয়ে উঠে ফিরে গেল আগের প্রসঙ্গে—সেনেট হল্-এর পেছনে ঐ যে মস্ত পাঁচতলা বাড়ি, যার নাম দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, এখান থেকে কিছুটা দেখা যাচ্ছে, ঐ হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি। ভাইস-চ্যান্সেলার বসেন ওখানে। আরো অনেক কিছু আছে—বড় বড় প্রফেসরদের ঘর, বিরাট লাইব্রেরী, অফিস, লেকচার-রুম,—এম. এ. ছাত্রদের জন্যে, তাছাড়া কত কী? তার ওদিকটায় ইডেন হিন্দু হোস্টেল, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা থাকে।

নীতীশ চোখ বড় বড় করে শুনছিল। মোহিনী এগিয়ে যেতে যেতে বলল—ওগুলো আরেক দিন দেখো। আজ চল, এই রাস্তায় যা-যা আছে, দেখিয়ে দিই। এইখানটাই হল যাকে বলে কলকাতার সীট অব্ লার্নিং। বাংলা দেশের যারা বড় বড় মনীষী প্রায় সবাই এখান থেকে মানুষ হয়ে গেছেন।

কলেজ স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে একটা রেলিংঘেরা মাঠের ধারে এসে পড়তেই নীতীশের চোখ গিয়ে পড়ল আর একটি শ্বেতপাথরের মূর্তির উপর। বিদ্যাসাগরের মত বসা নয়, দাঁড়ানো, সাহেবী পোশাক পরা। দীর্ঘকায় পুরুষ, ধীর, সৌম্য মুখ, দেখলেই মাথাটা শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে।

—এটা কার স্ট্যাচু মোহিনীদা?

—ডেভিড হেয়ার। আশ্চর্য মানুষ! ঘড়ি মেরামতের কাজ নিয়ে এসে-ছিলেন এদেশে। লেখাপড়ায় এমন কিছু পণ্ডিত নন। কিন্তু হলে কী হবে? ঘড়িওয়ালা সাহেবের ঝোঁক চাপল ইন্ডিয়ান ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে।

গুটিকয়েক ছেলে জুটিয়ে স্কুল খুললেন কলুটোলায়। যা কিছু রোজগার সব সেখানে ঢালেন। তারপরে কিছু সরকারী সাহায্য যোগাড় হল। বিদ্যাসাগর এসে দাঁড়ালেন ওঁর পেছনে। এগিয়ে চলল কাজ। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার সেই প্রথম পত্তন। ডেভিড হেয়ারের দান সেখানে অক্ষয় হয়ে আছে। ওঁর ডান পাশে ঐ যে বাড়িটা দেখছ, ওরই শুরু হয়েছিল কলুটোলায়। পরে এখানে এনে ওঁর নামে নাম দেওয়া হয়েছে হেয়ার স্কুল।

—এই হেয়ার স্কুল! ধীরে ধীরে চাপা গলায় কথা কটি উচ্চারণ করল নীতীশ।

তার মধ্যে গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়। এই স্কুলে পড়েছিলেন জ্ঞানচন্দ্র বসাক। তাদের বাসায় বসে কথায় কথায় মেজদাকে একদিন বলেছিলেন—তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব, তিনি হেয়ার স্কুলের ছাত্র, তার স্মৃতি কোনো দিন ভুলবার নয়।

নীতীশ আড়াল থেকে শুনেছিল। শুনতে শুনতে এই নামটির প্রতি কেমন একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করেছিল। যাকে কোনো দিন দেখে নি, হয়তো কোনো দিন দেখবে না, তার উপরে একটি সশ্রদ্ধ মমত্ব-বোধ। স্বপ্নেও ভাবে নি, তার পরম শ্রদ্ধাভাজন হেড মাস্টার মশাই-এর মনে যে এতবড় স্থান অধিকার করে রয়েছে, কয়েক মাস না যেতেই সেই গৌরবময় বিদ্যায়তনের সামনে এসে দাঁড়াবে, তাকে দু'চোখ ভরে দেখতে পাবে। একথাও কি ভাবতে পেরেছিল, সেই স্কুলের অদূরেই দাঁড়িয়ে আছেন তার মহান প্রতিষ্ঠাতা? শিক্ষাবিদ নন, রাজ-পুরুষ নন, সামান্য একজন ঘড়ির কারিগর। সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এসে বিদেশী বিধর্মী কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে শুধু সর্বস্ব নয়, নিজেকেও সঁপে দিয়ে গেলেন।

সাদা রংয়ের দোতলা বাড়িটার দিকে নীতীশকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে মোহিনী নীচু হয়ে ওর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলল—পড়বে নাকি এখানে? খুব ভালো স্কুল। ফী বছর ভালো রেজাল্ট করে, কখনো কখনো ফার্স্ট-সেকেণ্ডও হয়।

নীতু যেন ভয় পেয়েছে এমনি চোখে তাকাল মোহিনীদার দিকে। বুকের উপর একটা আঙুল রেখে বলল—আমি!

—হ্যাঁ, তুমি। কেন, ভয় কিসের?

—না মানে, আমাকে—আমাকে ওখানে নেবে কেন?

—কেন নেবে না? তুমিও তো সব পরীক্ষায় অনেক নম্বর পাও। আমি যতীশদার কাছে শুনেছি। চল না, একেবার দেখি চেষ্টা করে।

ওর পিঠের উপর হাত রাখল মোহিনী। নীতুর বুকের ভিতরটা কাঁপছিল, পা দুটো চলতে চাইছিল না। বলল—আজ থাক।

—থাকবে কেন? ভর্তি তো তোমাকে হতেই হবে দু-চার দিনের মধ্যে, যতীশদা আমাকেই বলেছেন তার ব্যবস্থা করতে। এসো না এখানে একবার ঢুঁ মেরে দেখি। না নেয়, চলে আসবো। ধরে তো আর মারবে না!

বেলা বারোটার কাছাকাছি। ছেলেরা সব ক্লাসে। মোহিনীর পিছন পিছন গেঠ পার হয়ে, দারোয়ানের ঘর ডানদিকে রেখে লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল নীতীশ। অফিস দোতলায়, হেড মাস্টারের ঘরেও সেখানে। লোহার ধাপের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ভীরু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল দু-একটা ক্লাসের দিকে। কী চমৎকার দেখতে ছেলেগুলো! তেমনি জামাকাপড়। শহরের ছেলে তো, কেউ কেউ কোট-প্যান্ট পরে এসেছে। কারো পরনে পাজামা-চাপকান, মাথায় লাল টুপি, উপর থেকে মোটা টিকির মত কী একটা ঝুলছে। ধুতি-শার্ট রয়েছে অনেক। একটি মোটা ছেলেকে দেখল, পরেছে ধুতি-কোট, তার উপরে মাথায় একটা গোল টুপি।

—ওরা সব কোন দেশের ছেলে? ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল মোহিনীকে।

—কোন্ দেশের মানে! প্রশ্নটা হঠাৎ ধরতে পারল না মোহিনী।

—কী রকম জামাকাপড় দেখুন না?

—ও-ও, সবাই বাঙালী নয়। কিছু কিছু অ-বাঙালী ছেলেও পড়ে এখানে। মাড়োয়ারী মুসলমান মাদ্রাজী ভাটিয়া···

—সব্বাই কী রকম বড়লোক!

—হ্যাঁ; তা বেশ কিছু আছে। কলকাতার বড়লোকের ছেলেরা হেয়ার আর হিন্দু স্কুলেই পড়তে আসে বেশী। তবে পড়াশুনায় ভাল না হলে এখানে জায়গা নেই। তুমি যদি ঢুকতে পার, অনেক বড়ঘরের ছেলে তোমার বন্ধু হবে। দেখবে আমরা তাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে বসে আছি। তুমি এখন অনেক ছোট; বড় হলে বুঝবে, ওটা আমাদের মিথ্যা অভিমান।

ভর্তির ব্যাপার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টারের হাতে। তিনি নীতীশকে দু-চারটি প্রশ্ন করে পর পর দুজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পাঠালেন। একজন নিলেন ইংরেজী পরীক্ষা, আরেকজন অঙ্ক। দুটোতেই সে ভালো নম্বর পেল। ভর্তির অনুমতি সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। মোহিনী ভীষণ খুশী। নীচে নামতে নামতে বলল—তুমি তো আসতেই চাইছিলে না! ভাগ্যিস আমি ধরে এনেছিলাম! হেয়ার স্কুলে ঢুকবার চান্স পেয়ে গেলে।

নীতীশ তখনো বিশ্বাস করতে সাহস করছিল না, সত্যিই সে হেয়ার স্কুলের ছাত্র হতে চলেছে। তার হেড মাস্টারমশাই যা ছিলেন এবং যার জন্যে গর্ব বোধ করেছেন সারাজীবন। এ তো তাঁর নিজের মুখের কথা!

ওরা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে এসে পড়েছে। সাদা রংয়ের তিনতলা বাড়ি। সেইদিকে আঙুল তুলে মোহিনী বলল—হেয়ার-এ ঢোকা মানে কী বুঝলে? এখানেও তোমার জায়গা হয়ে রইল। বাংলাদেশের, শুধু বাংলাদেশের বলি কেন, গোটা আসাম আর কিছুটা বিহারের যত সেরা ছেলে, সব আসে প্রেসিডেন্সিতে। তুমিও একদিন আসবে। এত বড় সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে?

কথা বলতে বলতে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে মোহিনীর খেয়াল হল—

ওদিকটায় তো যাওয়া হল না ?

—কোন্ দিকটায় ?

—হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্, আর—

বাকীটা জানবার জন্যে মুখ তুলল নীতু। মোহিনী চোখেমুখে উল্লাস ফুটিয়ে বলল—প্যারাগন স্টোর।

—সেটা কী ?

—সেখানে যা আছে, একবার স্বাদ পেলে রোজ ছুটে আসবে।

—কী বলুন তো ! নীতুর চোখেমুখে দারুণ কৌতূহল।

—বলবো ?

—বলুন না ?

—ঘোলের সরবত !

নীতু জোরে হেসে উঠল। মোহিনী বলল—এখন হাসছে, এক চুমুক খেলে একেবারে থ হয়ে যাবে। চল, যাবে ? দাঁড়াও, পকেটের অবস্থাটা দেখে নিই। হ্যাঁ, একটি দু-আনি এখনো সশরীরে বর্তমান। তার মানে দুটো হাফগ্লাস। ম্যাঙ্গো রোজ, না ভ্যানিলা, কোনটা পছন্দ তোমার ?

নীতুর কোনোটাই পছন্দ নয়। বলল—সরবত খাবো কী !

—না খেলে আমি কি করতে পারি ? ডান হাতে একটা হতাশার ভঙ্গি করল মোহিনী, এখন তাহলে কোনদিকে যেতে চাও, শুনি ?

—আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

—হাইকোর্ট দেখিয়ে আনি চলো। বাঙালদের যেটা সবার আগে দেখানো দরকার।

—আহা, আপনি বুঝি বাঙাল নন ?

মোহিনীমোহন ভৌমিক যশোরের ছেলে। বছর দেড়েক আগে দৌলতপুর কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেছে। তার দাদা রোহিণী করেছে অন্য জায়গা থেকে, আরো কয়েক বছর আগে। পটলডাঙ্গায় একটা মেসে থেকে প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারি করে, সকালবেলায় ছেলে পড়ায় আর সন্ধ্যাবেলায় রিপন ল' কলেজে হাজিরা দেয়। রোজ অবশ্য দিতে হয় না। একটা ছোট দল আছে ওদের। প্রফেসর যখন রোল-কল করেন, পালা করে একজন আরেকজনের হয়ে 'প্রেজেন্ট্ স্যার'-টা জানিয়ে দেয়। তার ফলে সপ্তাহে তিন দিন গেলেই চলে।

সম্প্রতি ছোট ভাইকে অর্থাৎ মোহিনীকেও নিয়ে এসেছে। একই মেসে থাকে। তার কাজ—সকাল-সন্ধ্যা দুটো টিউশান, ইংরেজি কাগজে ওয়ান্টেড্ অর্থাৎ কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ এবং সারা দুপুর অফিসপাড়ায় টহল। ল' কলেজটাও জুড়তে চেয়েছিল ঐ সঙ্গে। দাদা কিছুতেই রাজী হয় নি। তার যুক্তিটি অকাট্য —এক বাড়িতে দুজন রাসবিহারী ঘোষের দরকার নেই, একজনই যথেষ্ট। তুমি টহল দিতে থাকো। তারপর দেখা যাবে।

এই রোহিণী ভৌমিক আর যতীশ ভট্চায এক কলেজে পড়াশুনো করেছে,

যদিও ঠিক একসঙ্গে নয়। রোহিণী কিছু উপরে পড়ত। কিন্তু কেমন করে যেন দুজনের মধ্যে একটি প্রগাঢ় সখ্য আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা সাধারণত সহপাঠীদের মধ্যেই জন্মায়। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের সেই বন্ধুত্বের পাশ ছিন্ন হয় নি। চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল।

রোহিণীদের অবস্থা ঠিক যতীশের মত নয়। সংসার থেকে তার উপরে কোন চাপ পড়ে নি। তাই সে সোজা কলকাতায় গিয়ে আইন পড়তে শুরু করেছিল। তার আগে অবশ্য কিছুদিন গেছে ল' কলেজের বাহন হিসাবে ঐ মাস্টারিটা জোটাতে। যতীশকেও লিখেছিল চলে এসো। একসঙ্গে ছেলে চরিয়ে হাত পাকা করে নেওয়া যাক। তারপর একসঙ্গেই মক্কেল চরানো যাবে।

যতীশের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। মফঃস্বলে মাস্টারি নিয়ে চলে যাবার পর রোহিণীকে লিখেছিল, আমি সার পি. সি. রায়ের চেলা। 'বয়কট ল' কলেজ'। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'পবিত্র শিক্ষক বৃত্তি' গ্রহণ করেছি। তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার কিছুদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তিনি সকলের আগে ল' কলেজ দুটোকে ভেঙে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতেন।

তারপর যতীশ যখন সাময়িকভাবে হেড মাস্টার পদে উন্নীত হল, খবর পেয়ে রোহিণী লিখেছিল, তোমার পদোন্নতি হয়েছে, গেঁয়ো ইস্কুলের সিংহাসন লাভ করেছ, সেই সঙ্গে বাগ-বাগিচা ঘেরা একটা খড়ো কি টিনের চালের প্রাসাদও পেয়েছ নিশ্চয়ই। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তুমি তার দাওয়ায় বসে তোমার জ্যাঠামশাই বয়সী গ্রামের বুড়োদের সঙ্গে পাশা খেলতে খেলতে তামাক টানছ। চেহারাটাও চোখে ভাসছে। সস্তা দুধ-ঘি-এর কল্যাণে বেশ নাদুস-নুদুস, দিব্যি একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি শুক্লপক্ষের শশীকলার মত নিত্য বর্ধমান, এক জোড়া মোটা-গোঁফ, চুলে পাক ধরল বলে।

তুমি একবার স্যর পি. সি. রায়ের কথা লিখেছিলে না? তিনি যেমন ল' কলেজ ভাঙতে চেয়েছিলেন, আমারও তেমন ইচ্ছে করছে তোমার ঐ 'আরাম-বাগটি' ভেঙে দিয়ে আসি।

চিঠিতে নতুন কিছুই ছিল না। রোহিণীর যা বরাবরের মত তাই একটু ঝাঁজের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিল। একটি সদ্য বি. এ. পাস করা তেজী ছেলে, জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে না, খাটবে না, ছুটবে না, অভাব ও আঘাতের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ঘাম ঝরবে না তার গায়ে, শুরু থেকেই আরাম খুঁজবে, একটা গ্রাম্য স্কুলের হেড মাস্টারির খুঁটো আশ্রয় করে সারা জীবনটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দেবে, এটা তার কিছুতেই সইছিল না। তাও যতীশ ভট্চাযের মত ছেলে, যার দেহে সামর্থ্য আছে, প্রচুর প্রাণশক্তি আছে, যে **out and out a sportsman**—খালি খেলার মাঠে নয়, জীবনের মাঠেও।

রোহিণীও প্রায়ই বলত, মাস্টারি হচ্ছে ইনভ্যালিড্ চেয়ার! ওটা সুস্থ লোকের জন্যে নয়।

—তুমি যে করছ ? কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আহা, আমার তো এটা খুঁটো নয়, মই। চড়ে উঠবার জন্যে। সে-দরকার শেষ হলেই ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিয়ে চলে যাবো।

শুভানুধ্যায়ী সুহৃদের চিঠি পড়ে যতীশ মনে মনে হেসেছিল। সেদিন কল্পনাও করতে পারে নি তার এই সদ্যলব্ধ হেড মাস্টারি, রোহিণী যার নাম দিয়েছিল 'আরাম-বাগ' এবং যাকে ভেঙে ফেলবার জন্যে তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সত্যি সত্যিই তার ভাঙন একেবারে আসন্ন। ফুটবলের মাঠ থেকে সে পর্বের শুরু এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ।

সে-রাত্রে হেড মাস্টারের চিঠি গিয়ে যখন পৌঁছল কমিটির দরবারে, প্রথমটা সবাই একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। এমন একটা চরম পত্র তারা আশা করেন নি। এর জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন না। বলতে গেলে এটা সেক্রেটারী কিংবা তাঁর বশংবদ ম্যানেজিং কমিটির অভিপ্রেতও নয়! 'ছোকরা' ইদানীং একটু বাঁকা পথে চলছিল, ডাকিয়ে এনে একটু সোজা করে দেবেন, এই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এতটা কেউ ভাবতে পারেন নি।

পরদিন সকালেই ও-পক্ষের ঝাঁজ অনেকটা পড়ে গেল। একজন মেম্বর প্রস্তাব নিয়ে এলেন, লিখিত কৈফিয়ৎ-টৈফিয়তের দরকার নেই, শুধু একবার মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করলেই সব মিটে যাবে। যতীশ রাজী হল না। তারপরেও বেসরকারী ভাবে কিছুটা চেষ্টা চলল, ইস্তফা পত্রটা ফিরিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু হেড মাস্টার তার সিদ্ধান্ত বদলাল না।

রোহিণীর কিছুদিন আগেকার চিঠিখানা তখনো টেবিলের উপর পড়ে আছে। উত্তর দেবার মত কিছু ছিল না বলেই দেয় নি। এবার দেবার প্রয়োজন। বেশী কিছু লিখল না, শুধু জানিয়ে দিল—তুমি যা চেয়েছিলে তাই হল। হেড মাস্টারির সুখ কপালে টিকল না। অমুক তারিখে যাচ্ছি। সঙ্গে নীতু থাকবে।

গাড়িটা যাত্রাশেষের যত কাছে আসছিল ততই বুঝতে পারছিল যতীশ, বুকটা যেন নীচে নেমে যাচ্ছে। সুনিশ্চিত আশ্রয়ের পরিচিত কোণটি ছেড়ে এবার শুরু হল অজানা অনিশ্চয়ের পথে নিরুদ্দেশে যাত্রা। 'আরাম-বাগ' পিছনে পড়ে রইল, সামনে রৌদ্রদগ্ধ মাঠ। কে জানে কোথায় তার শেষ এবং কী আছে তার প্রান্তে।

শুধু নিজের জন্যে হলে যতীশ অত কিছু ভাবত না। কিন্তু সে একা নয়। একটি অপোগণ্ড ছেলের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে তার সঙ্গে, ভাবনা তারই জন্যে।

নীতুর হাত ধরে শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফরমে নেমে পড়ে এদিক ওদিক তাকাল যতীশ। রোহিণীকে এ সময়ে আশা করা যায় না। হয় স্কুল, নয় তো ল' কলেজ—একটা কিছু থাকবেই। ভাইকে হয়তো পাঠাবে। সে-ই বা ওদের চিনবে কেমন করে? তাকেও এরা দেখে নি। ভাবতে ভাবতে এবং লোকের মুখের দিকে দেখতে দেখতে একটু একটু করে এগোচ্ছে, হঠাৎ অতি পরিচিত বলিষ্ঠ কণ্ঠের উল্লাসময় হুঙ্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ভিতর থেকে একটা থাবা এসে

হাত চেপে ধরল।

—নামটা যতীশ বটে, কিন্তু তুমি যে জ্যোতিষ-চর্চা শুরু করেছ, তা তো জানতাম না!

—মানে?

—একেবারে দিনক্ষণ দেখে ঠিক সময়টিতে এসে পড়েছ।

যতীশের কাছে এটা আরো দুর্বোধ্য রয়ে গেল। পরক্ষণেই আসল ব্যাপারটা খোলসা করল রোহিণী। বাবার শরীর ভালো নয়। ওঁকে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই চেঞ্জে যেরোতে হবে। অন্ততঃ দু'মাসের ছুটি দরকার। হতভাগা স্কুল কিছুতেই ছাড়ছে না। বলছে, বদলি দিতে হবে। ব্যস্‌ বদলি এসে গেল। কাল থেকেই লেগে যাও। তারপর নীতুবাবু, কোলকাতায় এসে গেলে! কত বড় স্টেশন, দেখেছ?

নীতিশের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা, কথা বলবে কী! শুধু মাথা নাড়ল এবং প্রগাঢ় বিস্ময়-ভরা চোখ তুলে চার দিকটা দেখতে লাগল।

কলকাতার পথে পথে ছড়ানো শুধু বিস্ময়। যত দেখছিল নীতীশ, ততই নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। বুঝতে পারছিল না, কোনটার আকর্ষণ বড়। এইমাত্র যা দেখে মনে হল, এর আর তুলনা নেই; পরমুহূর্তে যা দেখল, সেটা তার চেয়েও আশ্চর্য।

সেদিন কিন্তু কলেজ স্ট্রীট ছাড়বার পর আর কিছুই তার মন টেনে নিতে পারল না। আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মেস্‌-এ ফিরবার পথে সব কিছ ছাপিয়ে একটিমাত্র ছবিই তার দু'চোখ ভরে রইল। ওয়েস্টকোটের বোতামের ফাঁকে দুটি আঙুল রেখে প্রশান্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন এক শ্বেত মর্মরময় বিদেশী পুরুষ। ঈষৎ-আনত দীর্ঘ দেহ। মুখে গভীর করুণা।

তাঁর পিছনে ছোট একফালি মাঠ; তার এপারে একখানি ধবধবে সাদা রং-এর দোতলা বাড়ি, চারদিক খোলা, যেন আলগোছে দাঁড়িয়ে আছে; ওপারে ঘন সারি দেবদারু বীথির সবুজ ছায়ায় মাথা তুলে উঠেছে এক শুভ্র উন্নত প্রাসাদ।

হেয়ার স্কুল আর প্রেসিডেন্সি কলেজ!

প্রথমটি ছিল নীতুর কল্পনায়, যে-মানুষটিকে সে দূর থেকে মনে মনে তার প্রথম প্রণাম জানিয়েছিল, সেই মহানচেতা কিন্তু ভাগ্যের কাছে পরাজিত হেড মাস্টার জ্ঞানচন্দ্র বসাকের কৈশোর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। পরিণত বয়সেও তিনি যাকে তাঁর অন্তরের মধ্যে সগৌরবে লালন করেছেন, কে ভেবেছিল একদিন সে-ও এসে দাঁড়াবে সেই বিদ্যায়তনের দ্বারপ্রান্তে, অনায়াসে প্রবেশের অধিকার পাবে?

দ্বিতীয়টির ব্যবধান দৃশ্যত অতি সামান্য, একখানি ছোট মাঠ। কিন্তু তার কাছে সেদিন দুর্লঙ্ঘ্য দুস্তর। তবু তাকে আশ্রয় করেও একটি ভীরু স্বপ্ন নীতুর মনের কোণে ছায়া ফেলেছিল। গোপন আকাঙ্ক্ষার একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর। যে বীজ

থেকে তার জন্ম, সেটি বুঝেছিল মোহিনী। রাস্তায় রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে সেই তিনতলা বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে বলেছিল—একদিন এর নাম ছিল হিন্দু কলেজ। তার প্রথম গ্র্যাজুয়েট কে জান ?

নীতু জানত না। মোহিনীর কাছে প্রথম শুনল—বঙ্কিমচন্দ্র। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মনে।

—পড়েছ তাঁর কোন বই ? জিজ্ঞেস করল মোহিনী।

—পড়েছি। আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী। বলতে বলতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোহিনী বলে চলল—বাংলা সাহিত্যের আর একজন দিকপাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—তিনিও এই হিন্দু কলেজের ছাত্র। আরো কত বড় বড় লোক, যাঁদের কথা পড়েছ, পড়বে, দেশকে যাঁরা অনেক কিছু দিয়েছেন, প্রায় সবাই একদিন এখান থেকে মানুষ হয়ে বেরিয়েছিলেন।···তুমিও এখানে পড়বে, আই. এ., বি. এ , এম. এ. পাস করে বেরোবে। তাঁদের মত অনেক বড় হবে।

বলে ওর কাঁধ ধরে নেড়ে দিয়েছিল।

কথাটা হয়তো নেহাৎ কথাচ্ছলে বলা, ছোটদের উৎসাহ দেবার জন্যে শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকেরা যেমন বলে থাকেন। যাদের বলেন, তারাও সেটা সেইভাবে নেয়, ক্ষণিকের জন্যে হয়তো কিছুটা উৎসাহিত হয়, তারপর ভুলে যায়। কিন্তু নীতীশ সেদিন এই কথাগুলো শুনে কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত অনুপ্রেরণা তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। বহুকাল পরেও সেই দিনটি সে ভুলতে পারে নি।

চাকরির 'অ্যাকটিনি'র সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার ছেলে চরাবার ভারও রোহিণী যতীশের উপর চাপিয়ে গিয়েছিল। দুটো সেরে ফিরতে রাত নটা বেজে যেত। সেদিন ঘরে ঢুকে সবে জামা ছাড়ছে, তখনই মোহিনী গিয়ে হেয়ার-স্কুল-ঘটিত সব ব্যাপারটা তাকে সবিস্তারে জানিয়ে দিল। নীতীশকে ইচ্ছা করেই নিজের ঘরে বসিয়ে রেখেছিল। তার সামনে তার কৃতিত্ব এবং বিশেষ করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তেমন করে বলা যেত না। যতীশের কাছ থেকে যতটা উৎসাহ বা ঔৎসুক্য আশা করেছিল মোহিনী, না পেয়ে একটু যেন ক্ষুন্ন হল। যতীশ আগাগোড়া সবটুকু নিঃশব্দে শুনে গিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল—আসল খবরটা নিয়েছ ?

—আসল খবর মানে ?

যতীশ মুখে কিছু না বলে বুড়ো আঙুলের উপর তর্জনী নেড়ে টাকা বাজাবার ইঙ্গিত করল। মোহিনী হেসে ফেলল। তারপর অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বলল—গভর্ণমেন্ট স্কুল তো, তার ওপরে অমন ভালো স্কুল। মাইনেটা একটু বেশী হবে বৈকি।

—কত ?

—পাঁচ টাকা।

যতীশ হাসিমুখেই বলল—তার মানে তোমাদের কপালে আরেকদিন রোদ-ভোগ আছে। কাছাকাছি একটা প্রাইভেট স্কুল পাচ্ছ না ?

—তা পাওয়া যেতে পারে। ঐ তো মিত্র ইন্সটিটিউশন রয়েছে হ্যারিসন রোড-এ।

—কি রকম মাইনে ?

—ওরা আর কত নেবে! টাকা দেড়েক!

—তাহলে ওখানেই দ্যাখ না। 'মিত্র'র তো বেশ নাম-টাম আছে।

—তা আছে। তবে কোথায় 'হেয়ার' আর কোথায় 'মিত্র'!

—তফাত তো হবেই। পাঁচ টাকা আর দেড় টাকাতেও তফাত কম নয়।

মোহিনী সে কথা অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের অস্থায়ী স্কুল মাস্টারের কাছে মাস মাস সাড়ে তিন টাকা যে অনেক, তার তা না জানবার কথা নয়। জানে বলেই যে কথাগুলো ওষ্ঠাগ্রে এসে গিয়েছিল—এই যেমন, নীতুর মত একটি কৃতী মেধাবী ছেলের জীবনে 'হেয়ার' তার আদর্শ, শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা, আভিজাত্য, সহপাঠীদের সাহচর্য সব মিলে যে সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে দিতে পারত, তার চেয়েও বেশী, তার সদ্য জাগ্রত আশা-আকঙ্ক্ষার ব্যর্থতা যে আঘাত তার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে—ইত্যাদি, সবটাই মোহিনী তার মনের তলায় ফিরিয়ে নিয়ে এল। বেরিয়ে যেতে যেতে শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে শুধু বলে গেল, 'মিত্র'তেই নিয়ে যাবো কাল।

নীতীশ জানত, মোহিনী মেজদার সঙ্গে তার ভর্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে গেছে। ফিরে আসার অপেক্ষায় মিনিট গ[illegible]ল। মোহিনী ঘরে ঢুকে তার চোখের দিকে চেয়েই সব বুঝল। বলল—নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, বুঝলে নীতু! ঐ রকম বড় লোকের স্কুলে আমাদের পোষাবে না। গেটের সামনে কত মোটর দাঁড়িয়েছিল দেখলে তো ? সব ছেলেদের গাড়ি। ওরা হয়তো তোমার সঙ্গে কথাই বলবে না। কী দরকার! কাল তোমাকে অন্য একটা স্কুলে নিয়ে যাবো। সে-ও বেশ ভালো স্কুল। বছর বছর স্কলারশিপ পায়।

বড়ঘরের ছেলেদের সম্বন্ধে কালই যে একেবারে উলটো কথা বলেছে মোহিনী, সেটা বোধ হয় তার খেয়াল ছিল না। কিন্তু নীতীশের মনে ছিল। বুদ্ধিমান ছেলে ; এই আকস্মিক মত পরিবর্তনের কারণ যে অন্যত্র, বুঝতে পারল। অভাবের সংসারে ছেলেমেয়েদের বয়স ও অভিজ্ঞতা বড় তাড়াতাড়ি বাড়ে। ব্যাপারটা স্পষ্ট না বুঝলেও অনেকখানি অনুমান করতে অসুবিধা হল না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে তাদের ঘরে চলে গেল।

এপাশে-ওপাশে গায়ে গায়ে লাগানো দোকানপাট কিংবা বসতবাড়ি। একেবারে ফুটপাতের উপর থেকে উঠে গেছে স্কুল-বিল্ডিং। পুরনো, বিবর্ণ, অসুন্দর। না আছে গেট, না কম্পাউন্ড, না মাঠ। অদূরে দাঁড়িয়ে নেই কোনো মহাপুরুষের মর্মর-মূর্তি। কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য কিংবা গৌরব-স্মৃতি জড়িয়ে নেই তার কোনোখানে। নেহাত একটা স্কুল। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনকে নাড়া দেয় না, শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম জাগায় না। বরং ঢুকতে গিয়ে নীতীশের বুকখানা বড়

দমে গেল। এখানে পড়তে হবে?

সিঁড়িতে একরাশ ধুলো। এখানে ওখানে পড়ে আছে কাগজের ঠোঙা, ছেঁড়া শালপাতা। দু-একটা ক্লাসের দিকে নজর পড়ল। ছেলেদের মুখে নেই আভিজাত্যের ছাপ, পোশাক-আশাকে নেই ঐশ্বর্যের পরিচয়। চেয়ার-বেঞ্চি গুলোতেও কেমন যেন একটা মালিন্যের দীনতা ফুটে উঠেছে।

মোহিনীদার পিছন পিছন কাল যাঁর কাছে প্রথম গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার—তাঁর নাম শুনেছিল প্রসন্নবাবু। মুখেও ছিল স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। যে দু-চারটে প্রশ্ন করেছিলেন তার সুরটা কী মিষ্টি! আজ যার কাছে যেতে হল, সে এখানকার কেরানী। অপ্রসন্ন মুখ, কথাবার্তা কাটখোট্টা। মোহিনীর প্রশ্নের যে উত্তর দিল, তার মধ্যেও একটু রুঢ়তার ঝাঁজ পেল নীতীশ—আমাদের এখানে ভর্তি হতে হলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে।

মোহিনীদাও সমানতালে বলল—বেশ তো, নিন না। টেস্টকে আমরা ভয় পাই না।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর পরীক্ষা নিতে যিনি এলেন তাঁর ব্যবহারেও যেন আন্তরিকতার অভাব। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কাগজ চাইতে বললেন—ওটা আমরা দিই না। আপনাকে নিয়ে আসতে হবে।

মোহিনী একটি এক্সারসাইজ বুক কিনে নিয়ে এল।

ব্যাপক পরীক্ষার পর একটুকরো কাগজে মাইনে এবং আনুষাঙ্গক খরচের হিসাব লিখে মোহিনীর হাতে দিয়ে বললেন—কাল এই সময়ে আসবেন টাকা নিয়ে। দেরী করলে সীট নাও থাকতে পারে।

মেস-এ ফিরে কাগজখানা এবারে নীতুই দিল মেজদার হাতে—মোহিনী আর এল না। দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলল—কাল যেতে বলেছে।

যতীশ স্লিপখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। আর কিছু বলল না।

ছোট্ট একখানা ঘরের দুদিকে দুটো কেরোসিন কাঠের তক্তপোশ। একজন মানুষ কোনোরকমে, অর্থাৎ হাত-পা না ছড়িয়ে শুতে পারে। তবে দৈর্ঘ্যটা মানানসই হওয়া দরকার।

একটিতে থাকে যতীশ, আরেকটিতে আরেকজন মেম্বর। পায়ের কাছে একফালি জায়গা। সেখানে মেঝের উপর নীতীশের শোবার ব্যবস্থা। সে 'মেম্বর' নয়, 'গেস্ট'। তার কোনো 'সীট' নেই—সীটরেন্টও দিতে হয় না। খোরাকি-খরচ মেম্বরদের বেলায় পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ যে মাসে যেমন পড়ে, কিন্তু গেস্টের বেলায় নির্দিষ্ট।

যতীশ যখন খেয়ে ঘরে এল, তার রুমমেট তখনো খাচ্ছেন। নীতীশের খাওয়া আগেই হয়েছিল। গোটানো বিছানাটা, অর্থাৎ মায়ের হাতে সেলাই করা মোটা কাঁথাখানা মেঝেতে বিছিয়ে নিয়ে—(ছোট্ট বালিশটাও তাঁর হাতের, মোটা গামছার তৈরী খোল, ভিতরে নিজেদের গাছ থেকে পাড়া শিমুল তুলো)—

শোবার আয়োজন করছিল। মেজদার ডাক শুনে তক্তপোশের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

যতীশ বলল—বোস। নিজেও পাশে বসে হাতখানা রাখল ওর পিঠের উপর। নীতুর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছিল। অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে মাটির দিকে চেয়ে জড়সড় হয়ে বসে অপেক্ষা করে রইল, কী জানি কি বলবেন মেজদা। যতীশ বলল—খুব মন খারাপ লাগছে, না?

নীতু ভাবল, মেজদা বোধ হয় বাড়ির জন্য মন খারাপের কথা বলছেন। মাথা নেড়ে জানাল, না। যতীশ কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল—'মিত্র' থাক। হেয়ার স্কুলেই ভর্তি হয়ে যাও।

নীতু যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। মেজদার মুখের দিকে এখনো সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না; বিশেষ করে অত কাছে বসে। এই মুহূর্তে সব সঙ্কোচ কেটে গিয়ে কোথা থেকে যেন বিপুল সাহস এসে গেল তার মনে। আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে ধরল মেজদার মুখের পানে। তার থেকে উপচে পড়ছে গভীর কৃতজ্ঞতা।

যতীশ বলল—ভর্তি হলেই তো হবে না, খাটতে হবে। ওখানকার মত যাতে ফার্স্ট হতে পার।

নীতীশ ভয়ে ভয়ে বলল—এখানে অনেক ভালো ভালো ছেলে পড়ে।

—পড়লই বা, তারা যদি পারে, তুমি কেন পারবে না? আমি তো রইলাম। ...যাও শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।

নীতু উঠতে উঠতে শুনল, মেজদা যেন অনেকটা নিজের মনে বলছেন—আসছে সেশান থেকে একটা ফ্রি-স্টুডেন্ট্‌শিপ যদি পাওয়া যায়, তবেই তো! তা না হলে—

বাকীটা আর বললেন না। না বললেও ওটা যে কত প্রয়োজন, নীতীশের চেয়ে কে বেশী জানে? প্রসন্নবাবু মাইনে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মেধাবী গরীব ছাত্রদের ফ্রি স্টুডেণ্টশিপ দেওয়া হয়। মেধাবী—অর্থাৎ যারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। মেজদার দিকে চেয়েই সে চেষ্টা তাকে প্রাণ-পণ করে যেতে হবে। মা বলে দিয়েছিলেন, রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মা সরস্বতীকে মনে মনে প্রণাম করে বলবি, মা আমাকে বিদ্যা দাও। সব দিন মনে থাকে না। কখনো বা বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম এসে যায়। আজ অনেকক্ষণ জেগে রইল। একদিকে আশাপূর্তির আনন্দ, আরেকদিকে কেমন একটা ভয়। এতদিন যে পথ ধরে চলে এসেছে, একটানা সরল পথ। আজ থেকে যেন একটা নতুন পথ শুরু হল—আগাগোড়া কঠিন, বন্ধুর। একটা নতুন ভার এসে চাপল। কে জানে বইতে পারবে কিনা? মায়ের কথাটা বার বার মনে পড়তে লাগল। অন্ধকারে হাত জোড় করে ভক্তিনত অন্তরে অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা জানাল দেবী সরস্বতীর কাছে—আমি যেন আমার মায়ের ইচ্ছা, দাদার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

শুধু মা এবং দাদার ইচ্ছা নয়, তার পিছনে রয়েছে আরেকজনের অন্তিম

অভিলাষ। তার স্বর্গত পিতা। মাকে তিনি শেষ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন— যেমন করে পার, ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিও। মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছে সে কথা। হয়ত মেজদাকেও বলেছেন। তাঁরা তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেন নি। তাঁদের যেটুকু করণীয় তাঁরা করেছেন, করে চলেছেন। বাকীটুকু তার নিজের হাতে। সেখানে যেন কোনো ত্রুটি কোনো শৈথিল্য না দেখা দেয় এই মুহূর্ত থেকে এই হল তার সংকল্প।

॥ ১২ ॥

নীতীশ যখন ভর্তি হল, বছরের তিন-চার মাস চলে গেছে। সব নতুন বই। পড়াবার ধরন আলাদা। যাকে পড়া আদায় করা বলে, পল্লী অঞ্চলের স্কুলের সে-রীতি এখানে ততটা কড়াভাবে মেনে চলতেন না মাস্টার মশাইরা। অনেকখানি ছেলেদের উপর ছেড়ে দিতেন। বেশির ভাগ ছেলের প্রাইভেট টিউটর ছিল। পড়িয়ে দেওয়ার ভার ছিল তাদের উপর। নীতীশের সে সুবিধা ছিল না, যদিও যতীশ কখনো কখনো খানিকটা সাহায্য করত, কিন্তু প্রায়ই তার সময় হয়ে উঠত না। তবু অ্যানুয়াল পরীক্ষার ফল খারাপ হয় নি। বেশ উপরের দিকেই নাম ছিল, এবং প্রসন্নবাবুর অনুগ্রহে ফ্রী স্টুডেন্টশিপ পেতেও অসুবিধা হয় নি। 'বিনে মাইনে'র উমেদার এখানে বেশী নয়।

নীতীশ খুশি হয়েছিল। মেজদার কিছুটা সাশ্রয় হল, একটুখানি ভার কমল। ঐ সামান্য আয় থেকে তখনো তাঁকে নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। মণিঅর্ডারগুলো সে-ই নিয়ে যায় পোস্ট-অফিসে। দু চার দিন দেরি হলেই বড়দার কাছ থেকে যেমন ঠাসবুনানী পোস্টকার্ড আসে, সেগুলো মোটেই সুখপাঠ্য নয়। অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার দীর্ঘ কাহিনী।

কিন্তু ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি গিয়ে যা দেখে, তার সঙ্গে সেসব বর্ণনার কোনো মিল নেই। দিব্যি সচ্ছল অবস্থা, শুকচরে যাবার আগে যেমন দেখে গিয়েছিল। বরং তার চেয়েও ভালো। বৌদি যখন দু-তিনখানা বড় বড় মাছ সমেত এক-এক বাটি ঝোল তাদের দু ভায়ের সামনে ধরে দেয় এবং মা সামনে বসে আরো দুখানা নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, নীতীশের চোখের উপর ভেসে ওঠে তাদের মেসের মহাদেব ঠাকুরের 'রামরস'। একগঙ্গা গরম জলের মধ্যে মাছের টুকরোটা যে কোথায় লুকিয়ে পড়ে খুঁজে বের করতে সময় লাগে। আরেকটা বাড়তি টুকরো! সে শুধু থেকে যায় বাবুদের লোলুপ দৃষ্টি আর আর্দ্র রসনায়। মহাদেবের আঙুল গলিয়ে কারো পাতে গিয়ে পড়ে না। অন্তত নীতীশের সামনে সে অসম্ভব ঘটনা কখনো ঘটে নি। তবে 'ঝোল' নামক একটি হলুদবর্ণ অতি তরল পদার্থ বণ্টনে তার কোনো কার্পণ্য নেই। তার ভাণ্ডার অপরিমেয়। সম্ভবত সেই জন্যেই তার নাম দিয়েছিল 'রামরস'। রামরাজ্য ছাড়া কোনো জিনিসের এমন অন্তহীন সরবরাহ আর কোথাও সম্ভব নয়।

মাছের চেয়ে আরেকটা জিনিসের অভাব নীতীশকে বড় তীব্রভাবে বিঁধত। খাবার পাতে একটু দুধ, মেস-এর মেনুতে যার অস্তিত্ব কল্পনাতীত। কলকাতায় গিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত খেয়ে উঠে মনে হত তার পেট ভরে নি। শেষপাতে দুধভাত না হলে খাওয়াটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়. জন্ম থেকে সকলের বেলাতেই সে এই নিয়ম দেখে এসেছে। চাকরদের জন্যেও তার ব্যবস্থা ছিল। ঘরের গরুর দুধ যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখনো মা তাদের বরাদ্দ বন্ধ করতেন না। বলতেন—ওরে তোরা উঠিস নে। একটা করে ফোঁটা দেবো। পরিমাণ সামান্য। এক ফোঁটাই বলা যায়। তবু দিতে হবে। তা না হলে খাওয়া হল না।

আরেকটা নিয়ম ছিল মার। দুধভাতটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলে বাটিতে একটু জল ঢেলে খেয়ে নিতে হবে। বলতেন—অতটা রক্ত হবে গায়ে। একটু বড় হবার পর নীতীশ ওটা মানতে চাইত না—তাই আবার হয় নাকি! কিন্তু মা কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। শুকচরে যাবার আগে দু ভাইকেই বার বার বলে দিয়েছিলেন। মায়ের সামনে আপত্তি করলেও তাঁর কাছ থেকে দূরে গিয়ে, ফি-বারে অতখানি রক্তের আশা না করলেও, নিয়মটা সে বরাবর মেনে চলেছে।

কলকাতা থেমে যেবার প্রথম ছুটিতে বাড়ি গেল নীতীশ, মনোরমা সকলের সামনে কিছু বললেন না। নিজের ঘরে নিয়ে ছেলের কণ্ঠায় হাত বুলিয়ে বললেন—এ কী চেহারা হয়েছে! পেট ভরে খাস না বুঝি!

—কে বললে? এত-এত খাই।

—ঠাকুর কেমন রাঁধে?

—ভালোই।

—হ্যাঁরে, দুধটুধ খাস তো?

নীতু একদিকে মাথা নোয়াল। বলল না—দুধ সেখানে স্বপ্ন।

মনোরমা একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন—আর সেই যে আমি বলে দিয়েছিলাম—?

—বাটি-ধোয়া জল তো?

—সেসব বুঝি ছেড়ে দিয়েছ!

—না, না। ছাড়বো কেন?

রোহিণীর আইনের লেকচার পুরো হয়ে গিয়েছিল, বাকী ছিল পরীক্ষা-গুলো। তার জন্যে তাকে আবার কলকাতায় আসতে হল। ঐ মেস-এই উঠল, কিন্তু স্কুলে আর ফিরে গেল না। তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। ঘন ঘন দেশে যাওয়া দরকার। মেস-এর খরচ চালাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলার টিউশনটা যতীশের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে হল। মোহিনী তখনো বেকার। ছাত্রটি না থাকায় যতীশের বেশ কিছুটা টানাটানি দেখা দিল। বেশী দিন অবশ্য নয়। আরেকটি আবার জুটে গেল, তবে প্রাপ্তি আগের চেয়ে কিছু কম।

নীতুর মাইনে না থাকলেও হেয়ার স্কুলে পড়বার দরুন কিছু বাড়তি খরচ ছিল। জামাকাপড়ের দিকে একটু বিশেষ নজর দিতে হত। অতবড় সরকারী

স্কুল। বেশির ভাগই অভিজাত পরিবারের ছেলে। বাকী যারা তারাও এসেছে সচ্ছল এবং অবস্থাপন্ন ঘর থেকে। তাদের সঙ্গে সমানতালে না চললেও পোশাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলা দরকার। তা না হলে নিজেকে যদি ছোট বলে মনে করে ঐ বয়সের একটি ছেলেকে তার জন্যে দোষ দেওয়া যায় না। সপ্তাহান্তে সাবান-কাচা কোঁচকানো টুইলের শার্ট পরে অন্যত্র হয়তো চলে যেত, কিন্তু ওখানে সেটা নিতান্ত বেমানান। তাছাড়া নীতীশ অনেক ছেলের মধ্যে যে-কোনো একজন নয়, সে বিশেষজন। একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তার ক্লাসে, পরিচয় আছে। ব্যাক বেঞ্চে, ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সামনের সারির ছেলে, তাকে সকলের চোখের সামনে থাকতে হয়। নানা কাজে তার ডাক পড়ে, নানাজনের সঙ্গে তার প্রয়োজন। সেইভাবে তাকে চলতে হয়। তার জামাকাপড়গুলো দামী না হোক, দীন হলে চলে না। তার মধ্যে ঐশ্বর্য না থাক, ভব্যতা অবশ্যই থাকবে। সম্পদের জলুস না থাক সুরুচির ছাপ থাকতেই হবে।

যতীশের সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। তার নিজের পোশাক বলতে দুজোড়া ধুতি এবং দুটি শার্ট। তাদের উপর ধোবিচিহ্ন কিংবা ডাইং ক্লিনিং-এর নম্বর পড়ত কদাচিৎ। সে কাজের ভার নিয়েছিল তার নিজের দুটি হাত এবং একখণ্ড সানলাইট সাবান। 'ইস্ত্রি' নামক প্রক্রিয়াটিও বাদ পড়ত না। সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তার রুমমেট। হাতিয়ার বলতে একটি কাঁসার বাটি এবং তার মধ্যে কিছুটা গরম জল। তারই সাহায্যে ঐ পর্বটি তিনি সুনিপুণভাবে করে দিতেন। যতীশ প্রথম প্রথম আপত্তি করত। বলত—দিন না, আমি করে নিচ্ছি।

—আপনি! তাহলেই হয়েছে! মনে করছেন এ আর শক্ত কী, গোটাকয়েক টান! অত সোজা নয় মশাই। এর মধ্যে অনেক মুন্সিয়ানা আছে। আপনার দ্বারা হবে না।

বাটি চালাতে চালাতে বলতেন—আপিসে সবাই কি বলে জানেন? মল্লিক সব সময়েই ফিটফাট। ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, এতটুকু ভাঁজ নেই কোনোখানে। যা পাও সবই তো যায় ধোবার পেছনে! খাও কী? আমি বলি, হাওয়া।

বলে হো হো করে হেসে উঠতেন ম্যাকনীল কোম্পানীর সাঁইত্রিশ টাকা মাইনের ডেসপ্যাচ ক্লার্ক বাবুরাম মল্লিক। সংসারে যে যত ক্ষুদ্রই হোক, প্রত্যেকেরই একটা কোনো গর্ব থাকে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত, যা না হলে মানুষ বাঁচে না। বাবুরাম মল্লিকের গর্ব ছিল তাঁর 'ইস্ত্রি'।

যে কোনো কারণেই হোক যতীশকে তার ভালো লেগেছিল। সাত-আট বছর আছেন এই আঠারো নম্বরের মেস-এ, কত রুমমেট-এর সঙ্গে ঘর করেছেন, ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, কিন্তু নিজে থেকে যেচে কারো কাপড়জামা ইস্ত্রি করে দেন নি। শুধু করে দেওয়া নয়, বিদ্যাটা তাকে শিখিয়ে দেবেন, এরকম ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু যতীশ জানত সেটা তিনি কোনো দিনই পারবেন না। ওটা ওঁর ট্রেড-সিক্রেট।

'ইস্ত্রি' বিদ্যা সম্বন্ধে বাবুরাম মল্লিকের আত্মবিশ্বাস যতই প্রবল হোক,

নীতুর বেলায় তার প্রয়োগে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তার উপরে যে অখুশী ছিলেন তা নয়, কিন্তু কেমন একটা বিচিত্র মনোভাব ছিল। সে যেন ঠিক ওঁদের দলে নয়। 'দাদা'র সঙ্গে যেমন অতি সহজে মিশতেন, একটা অন্তরঙ্গ একাত্মতা অনুভব করতেন, 'ভাই'-এর সঙ্গে তা পারতেন না। সে যেন একটু আলাদা, যদিও তার চালচলন, কথাবার্তা বা অন্য কোনো বিষয়ে এমন কিছু পান নি যার জন্যে তাঁদের আর ওর মধ্যে কোনো লাইন টানা চলে। বরং এই শান্ত, বিনয়ী, মুখচোরা ছেলেটার উপর বাবুরামবাবুর একটা স্নেহের টান ছিল। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সেটা তাঁর কথায় বা ব্যবহারে প্রায় অব্যক্ত রয়ে গেছে।

নিজের চেয়ে ভাই-এর জামাকাপড়ের দিকে যতীশ বেশী নজর রাখত। তাদের সংখ্যাও ছিল বেশী এবং সেগুলো পাড়ার 'বগলা লন্ড্রী'তে নিয়মিত কাচিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল। দাদার দেখাদেখি নীতু প্রথম দিকে তার ধুতি-শার্টে সাবান লাগাতে শুরু করেছিল। স্কুলে ঢুকবার পর যতীশ আর সেটা চালাতে দেয় নি!

নীতু ক্লাস নাইন-এ উঠল। যতীশের সেটা ফাইনাল ইয়ার, তৃতীয় বছর। আর এক বছর পরেই 'রিপন'-এ ঘোরাঘুরি তার শেষ হবে। আরো কিছুদিন লাগবে পরীক্ষার বেড়াগুলো পার হতে। প্রথমটা অর্থাৎ প্রিলিমিনারী আগেই উতরে গেছে। বাকী থাকবে দুটো। তারপর 'ঘোরাঘুরি'র স্থান বদল। কলেজের হল ছেড়ে কাছারির মাঠ। মাঠের বেঞ্চি থেকে এজলাসের টেবিলের ধারে গিয়ে পোঁছতে ক'মাস লাগবে, কিংবা কত বছর, নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর। আপাতত সেসব নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। রোহিণী যেমন ফাইনাল পাস করেই কালো কোট পরে পুলিশ-কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছে, তার বেলায় সেটা হবে না। তাকে আটকে থাকতে হবে নীতুর জন্যে। সে যতদিম তার স্কুলের সামনেকার ছোট্ট মাঠখানা পার হয়ে ওপারের তিনতলা বাড়িটিতে গিয়ে না ওঠে, ততদিন অন্তত যতীশকে ছেলে চরিয়েই যেতে হবে, রোহিণীর ভাষায় 'মক্কেল চরাবার' সুযোগ দেখা দেবে না। তার পরেই বা কতদিন আসবে সে সুযোগ? সে প্রশ্নের উত্তর রয়েছে নীতুর হাতে। সে যতদিন তার কলেজে পড়ার ব্যয়ভার, অন্তত তার বড় অংশটা নিজেই বহন করতে না পারে। তার জন্যে দরকার একটা স্কলারশিপ। যেমন তেমন একটা হলেই চলবে না, সব চেয়ে উঁচু যে কটা, তারই একটা সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

ক্লাস নাইন-এ উঠবার পর থেকেই যতীশ ভাইকে সে সম্বন্ধে সজাগ করে তুলছিল। একদিন ছিল, যখন কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যা আহরণ করাই সে ছাত্রজীবনের চরম আদর্শ বলে মনে করত না। এই ক'বছর আগেও শুকচর স্কুলের খেলার মাঠে তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল—স্কুলের শিক্ষা তালিকায় পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোর স্থান ছোট নয়, এই দুয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে

পূর্ণাঙ্গ ছাত্রজীবন। এ কথা সেদিন শুধু বক্তৃতাচ্ছলে বলে নি। এই তার মনের কথা, তার বিশ্বাস। এই দুয়ের বাইরে আরো অনেক দিক আছে, একটি কিশোর ছাত্রের জীবনে যার অনুশীলন না ঘটলে সে একটা পুরো মানুষ হবার সুযোগ পায় না। সেগুলো ঠিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ কর্মতালিকার অঙ্গ। শিক্ষাবিদরা বলেন, একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিস্। মফঃস্বলের স্কুলগুলো ইচ্ছা থাকলেও সঙ্গতির অভাবে তার ব্যবস্থা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিচালকের অভাব। কলকাতাতেই বা কটা স্কুলে তার দেখা পাওয়া যায়? 'হেয়ার' 'হিন্দুতে' কিছু বন্দোবস্ত আছে। অন্য ছেলেদের মত নীতীশও তার পূর্ণ সুযোগ নেবে, শুধু পাঠ্য কেতাবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে না রেখে দাঁড়াবে গিয়ে ফুটবল-ক্রিকেটের মাঠে, যোগ দেবে স্পোর্টস, বয়স্কাউট্স্ এবং বিভিন্ন শরীর ও মননচর্চায়, ম্যাগাজিন চালাবে, ডিবেটিং সোসাইটিতে অংশ নেবে, দল বেঁধে বেড়াতে যাবে, পিকনিক করবে, গোলদীঘিতে সাঁতার কাটবে, দাঁড় টানবে ইডেন গার্ডেনের সর্পিল খালে,—এক কথায় উন্নত বলিষ্ঠ ছাত্র-জীবনের পুরো স্বাদ পেয়ে মানুষ হবে।

এই আশা পোষণ করা এবং এই পথে ছোট ভাইকে উৎসাহিত করাই যতীশের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক, যা প্রত্যাশিত, তাই কি সব সময়ে ঘটে? প্রয়োজন বড় কঠোর। সে মানুষকে ঢেলে সাজায়, তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে। শুকচর স্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক যতীশ ভট্চাজ খিদিরপুরের এক অখ্যাত গলির ততোধিক অখ্যত এক বিদ্যা-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের অস্থায়ী ফোর্থ মাস্টার এক মানুষ নয়। তিন বছর অবিরাম ঘানি টেনে টেনে সে ক্লান্ত, মুক্তির জন্যে অস্থির। তখন তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—নীতুটা ভালোভাবে পাস করে বেরোক, দরকার নেই তার একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটির, তার চেয়ে যে-অঙ্ক পাঁচবার করেছে, সেটা সাতবার করুক, আদ্যপান্ত গলাধঃকরণ করুক ইউক্লিডের উপপাদ্য, নেসফিল্ডের ফ্রেজেস্ অ্যাণ্ড ইডয়মস্, আর বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদী। সেগুলোকে উগরে দিয়ে আসুক 'দ্বারভাঙ্গার' টপ ফ্লোরে পরীক্ষার খাতায়। এই রুটিন-বাঁধা পথ বেয়ে যে চলে, ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, সে আদর্শ ছাত্র না হোক, আদর্শ পরীক্ষার্থী। নীতুকে তাই হতে হবে। একটি ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ তার চাই-ই।

নীতু বুদ্ধিমান ছেলে। সে তার দাদার অবস্থা জানে, নিজের ভবিষ্যৎ বোঝে। আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যে তার জীবনপরীক্ষা সেটাও তার উপলব্ধি করবার কথা। যতীশ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।

সেদিন তার স্কুলের কোনো এক বড়কর্তার মৃত্যু উপলক্ষে সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রটিকেও মনে মনে ছুটি দিয়ে দিল, অর্থাৎ তার কাছে আর গেল না। দু-একটা অন্য কাজ সেরে সাড়ে চারটা নাগাদ মেস-এর কাছে এসে যখন পেঁছিল, দেখল দরজার সামনে গলিপথটা প্রায় বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল মোটরগাড়ি। অবাক হল। গাড়িওয়ালাদের এলাকা তো এটা নয়। হঠাৎ নজরে পড়ল, ওপাশের দোরটা কে খুলে ধরতেই নেমে যাচ্ছে নীতীশ। ভিতরে

অস্পষ্টভাবে যাকে দেখা গেল, তার বয়স ওরই মত, মুখে ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের ঔজ্জ্বল্য। কী একটা কথা হল দুজনে। একপশলা হাসি। তারপর বিদায় দেবার ভঙ্গিতে ডান হাতটা নেড়ে সে ভিতরের দিকে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হর্ন-এর আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গাড়িখানা।

যতীশের মুখখানাও অজ্ঞাতসারে গম্ভীর হয়ে উঠল।

নীতীশ দাদাকে দেখতে পায় নি। তরতর করে সিঁড়িগুলো ডিঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন্ একটা নতুন-শোনা গানের কলি গুন গুন করে গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল। বইখাতা রেখে যখন জামা খুলছে, পিছনে জুতোর শব্দ শুনতেই গানটা হঠাৎ থেমে গেল। যতীশ তো কোনো দিন এ সময়ে ফেরে না! একটু আশ্চর্য হল। তার চেয়ে বেশী খুশি হল দাদাকে দেখে। আগে থেকেই মনের মধ্যে একটা খুশীর হাওয়া বইছিল। একবার ইচ্ছা হল, জিজ্ঞাসা করে আজ এত সকাল সকাল ফিরলেন কি করে? কিছুদিন আগেও এরকম একটা ইচ্ছা তার মনের কোণেও ঠাঁই পেত না। যে পারিবারিক আবহাওয়ায় সে মানুষ, শিশু বয়স থেকে যা দেখেছে এবং বড়দের কাছে শুনে এসেছে, তাতে করে এটা স্বাভাবিক নয়। দাদা গুরুজন, তাঁর থেকে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হবে, তাঁর সামনে অকারণে মুখ খুলতে নেই, গায়ে পড়ে কিছু বলতে যাওয়া বাচালতা। তাঁর চোখে চোখে তাকানো অশিষ্টাচার। তাদের 'সমাজে' এইটাই রীতি।

নীতুর বেলায় এর উপরে আরো একটা বাধা ছিল। দাদাকে সে মনে মনে কেমন 'ভয়' করে চলত, যদিও যতীশের ব্যবহারে কোনো রূঢ়তা দূরে থাক, কিছুমাত্র স্নেহের অভাব কখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু সে স্নেহ ছিল প্রচ্ছন্ন। তার প্রকাশ ছিল তার চোখ দুটিতে, সামান্য দু-একটা কথাবার্তায়। নীতীশের কাছে তা লুকানো ছিল না। তবু দাদার সামনে সে আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারত না।

কলকাতার অভিজাত স্কুলে দু-চারটি বন্ধুর সংস্পর্শে এসে যে 'সমাজ' তার চোখে পড়ল, সেখানে বড় ভাইবোনদের সঙ্গে ছোট ভাই-এর সম্পর্কটা অন্য রকম। তারা একসঙ্গে বসে হাসি-গল্প হৈ-চৈ করে। তার মধ্যে 'ভয়' নেই, আড়ষ্টতা নেই। বড়-ছোটর প্রভেদটা প্রকট নয়। পরস্পরের মধ্যে ঠাট্টাতামাশাও চলে। যেন একদল বন্ধু। তার মধ্যে শুধু 'দাদারা' নন, 'বাবারা'ও মাঝে মাঝে এসে আসর জমিয়ে তোলেন। উভয় তরফই অত্যন্ত সহজ। বড় ভাইকে এরা 'তুমি' বলে, কেউ কেউ বাবাকেও। প্রথম যেদিন শুনল, রীতিমত চমকে উঠেছিল নীতীশ। তারপর মনে হয়েছে, এটাই ঠিক। 'আপনি'র মধ্যে কেমন একটা দূর-দূর পর-পর ভাব রয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তার দাদাকে 'তুমি' বলা সে কল্পনাও করতে পারে না।

আড়চোখে যতীশের মুখের দিকে চেয়ে এইমাত্র যে কথাটা তার মনে হয়েছিল—জানতে চাইবে, স্কুল বুঝি তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে, কিংবা সন্ধ্যাবেলার ছাত্রটি বুঝি আজ পড়ে নি—সেটা মনের কোণেই মিলিয়ে গেল। অন্য দিনের তুলনায় অনেকটা গম্ভীর দেখাচ্ছে দাদাকে। নীতুর মুখেও অজানা আশঙ্কার

ছায়া পড়ল। চাকরি-বাকরির ব্যাপারটাই সকলের আগে মনে হল। সেই সম্পর্কে কোনো নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে হয়তো। কিন্তু এ 'সমস্যা' যে একেবারে আলাদা এবং তাকে নিয়ে, কল্পনা করতে পারল না।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা অতি তুচ্ছ। ওখানকার কত ছেলেরই তো গাড়ি আছে। তাদের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, তার মধ্যে অন্যায়ও কিছু নেই। সে ওকে মেস-এর দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। এক গাড়িতে পাশা-পাশি বসে গল্প করতে করতে এসেছে দুটি বন্ধু—এ তো আনন্দের কথা। এই-ভাবেই একে নিতে চাইল যতীশ। এতে ভাবনার কী আছে? কিন্তু একটুকরো মেঘ মনের কোণ থেকে নড়তে চাইল না। ঐ গাড়িটা শুধু গাড়ি নয়। একটি বিশেষ জগৎ, একটি বিশেষ সমাজের প্রতীক। সেখানকার সঙ্গে ওদের ব্যবধান অতি দুস্তর। কিন্তু তার একটা আকর্ষণ আছে—যেমনি মনোরম, তেমনি প্রবল, বিশেষ করে ঐ বয়সের একটি ভাবপ্রবণ ছেলের পক্ষে। সেইজন্যেই এই দু-জগতের ভিতরে যে দূরত্ব, তাকে কঠোরভাবে রক্ষা করে চলা প্রয়োজন। তা না হলে ভেসে যাবার সম্ভাবনা।

যতীশ ভাবছিল, বিধাতা তো তাদের রুপোর চামচ মুখে দিয়ে সংসারে পাঠান নি। জন্মাবার পর তাদের মুখে উঠেছিল একটা অতি সাধারণ ঝিনুক। দু-এর জাত একেবারে আলাদা। সেটা শুরু থেকেই মেনে চলা উচিত।

কিছুদিন আগেকার একটা সামান্য ঘটনা মনে পড়ল। মাসের শেষে যেমন হয়, মনিব্যাগের অবস্থা অতি ক্ষীণ। সেদিন ঝেড়ে-ঝুড়ে যা পাওয়া গেল, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে খিদিরপুরের ট্রামভাড়া কোনোরকমে কুলিয়ে যেতে পারে, তার উপরে আর কিছু থাকে না! ভাগ্যিস নীতুর বৈকালিক জলখাবারের পয়সাটা আগেই দেওয়া আছে। কিন্তু ঐদিনই তার ডাইং ক্লিনিং থেকে কাপড়-জামা আনবার তারিখ। তার কী করা যায়! যে শার্টটা পরছিল, সত্যিই ময়লা হয়ে গেছে। অগত্যা বাবুরামবাবুর শরণ নিতে হল। নিজের জামার সঙ্গে নীতুর শার্টটা কেচে এনে বলল, এর ওপরেও একটা ম্যাজিক টাচ লাগিয়ে দেবেন দাদা।

নীতু তখন ছিল না। চিলেকোঠায় বসে পড়ছিল। কোঠা বা ঘর বললে স্থানটিকে একটু অতিরিক্ত গৌরব দেওয়া হবে। সিঁড়িটা যেখানে ছাতে গিয়ে মিশেছে, তার বাঁদিকে রেলিং-এর ধারে একটা ফালি। দৈর্ঘ্য নিতান্ত কম নয়, পাঁচ ফুট মত হবে, প্রস্থ ফুট দেড়েক। মেস-এর সম্পত্তি নয়, বাড়িওয়ালার খাস দখলেই ছিল বরাবর; তাঁর কী সব মালপত্তর দিয়ে ঠাসা। জনকয়েক মেম্বর তাঁকে কিঞ্চিৎ চাপ দিয়ে নীতুর জন্যে ওটি উদ্ধার করেছেন, এবং তিনিও যখন শুনলেন ছেলেটি লেখাপড়ায় খুব ভালো, একটা আলাদা সীট নেবার মত সঙ্গতি নেই, তখন আর আপত্তি করেন নি।

স্কুলের জন্যে তৈরী হয়ে যখন নেমে এল (একটু আগেই নামল, 'বগল ডাইং' থেকে কাপড় আনবার কথা তার মনে ছিল) বাবুরামবাবু বললেন—ঐ যে তোমার শার্ট ইস্ত্রি করে রেখেছি। চলবে তো!

নীতু জবাব দিল না। কিন্তু তার চোখে এবং কপালে যে কুঞ্চন দেখা দিল তার থেকেই বাবুরাম তাঁর ইস্ত্রি-কর্মের দক্ষতা সম্বন্ধে ওর মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। ঘরের কোণে দাদার জামাকাপড় রাখবার দড়িটার দিকে চেয়ে নীতু বলল—দাদা নেই ?

প্রশ্নটা অনেকটা স্বগতোক্তির মত। দাদা যে এর একটু আগেই বেরিয়ে পড়েন, তার সেটা অজানা নয়। তবু বাবুরাম একটা উত্তর দিতে পারতেন। দিলেন না।

নীতীশ এক মুহূর্ত কি ভাবল। দেয়ালের তাকে সাজানো তার বইগুলোর পিছনে হাত দিয়ে একটা দুআনি বের করে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঐটিই তার মবলক সঞ্চয়, জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো। অন্তত আটদিন লেগেছে এই দুআনায় পৌঁছতে। রোজকার বরাদ্দ—চিড়ে দু'পয়সা, ছোট্ট একভাঁড় কালী-তলার দই দু'পয়সা, চিনি এক পয়সা, চাঁপাকলা এক পয়সা। উত্তম ফলার ! তার থেকে কলাটা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়, এবং মাঝে মাঝে তাই দিয়ে থাকে নীতীশ। কখনো কখনো চিনিও। একেবারে কেটে দেওয়া সম্ভব না হলেও কিছুটা জমানো চলে। এমন সুন্দর চিনিপাতা দই ! তার উপরে এক পয়সার চিনি লাগে না।

বাবুরামের অনুমান ঠিক। 'বগলা লণ্ড্রী'তেই গিয়েছিল নীতীশ। ধুতি আর শার্ট নিয়ে যখন ফিরল, তিনি তখন বেরোচ্ছেন। আড়চোখে একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। বলা বাহুল্য, দৃষ্টিটা অপ্রসন্ন। তারপরেই নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন।

ঘটনাটি পরদিন যতীশের সামনে ব্যক্ত করতে গিয়ে কিছুটা রং ফলিয়ে থাকবেন। সেটুকু বাদ দিলেও একে সে একেবারে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারে নি। বর্ণনার সঙ্গে বাবুরাম একটি মন্তব্য যোগ করেছিলেন—আমি আপনাকে আগেই বলেছি, ও আর আমরা ঠিক একদলে পড়ি না।

কথাটা যা একেবারে মিথ্যা নয়, অন্তত ভাববার মত, তারই লক্ষণ যেন দেখা যাচ্ছে। অতখানি আশঙ্কা যদি অতিরিক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়, এটা তো মানতেই হবে যে মেলামেশাটা ওর মনকে এমন একটা দিকে নিয়ে যেতে পারে যা নির্বোধ ও একাগ্র পড়াশুনার পক্ষে অনুকূল নয়। অথচ সামনে সময় মাত্র একটি বছর। তার মধ্যে এই ছেলেকে তৈরী হতে হবে। এ তো শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নয়, তার ভাগ্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফল থেকেই নির্ধারিত হবে তার জীবনের গতি। এখানে যদি না উঁচু ধাপে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভবিষ্যতের সিঁড়িপথ অন্ধকার।

উঁচুতে গিয়ে দাঁড়াবার সোজা রাস্তা তো আগেই বলে দিয়েছে যতীশ। ইংরেজিতে তাকে বলে ক্র্যামিং। পাঠ্য কেতাবের অসার তথ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলো ঠেসে ভরে দেওয়া। তার জন্য দরকার বারংবার একই জিনিস পড়া—আবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকে যা "বোধাদপি গরীয়সী" বলে স্বীকৃত। কিন্তু বড় নিরস প্রক্রিয়া। তেমনি নিষ্প্রাণ ও ক্লান্তিকর। চোখ কান বুজে চালিয়ে যেতে

হবে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ডিসট্র্যাক্‌শন্‌ অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ ঘটবার মত কিছু যেন সামনে না থাকে।

তাই এল শেষ পর্যন্ত। লোভনীয় ডিসট্র্যাক্‌শন্‌। আরামবহুল, প্রাচুর্যময়, বিলাসোজ্জ্বল জীবনের হাতছানি, যার অগ্রদূত ঐ আলোঝলমল বিশাল মোটরগাড়ি। মেস-এর গলিপথে ঢুকতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কষ্ট হয়েছিল বেরোতে।

তাই হয়;—বিমর্ষ মুখে মনে মনে মাথা নাড়ল যতীশ, জীবনের পথেও যা অপ্রত্যাশিত বা অনভিপ্রেত, এমনি হঠাৎ এবং সহজেই এসে পড়ে, কিন্তু সহজে যায় না।

এর পরে একদিন ছুটির পরে নীচে নামছিল নীতীশ! পিছন থেকে সুশান্ত এসে ধরে ফেলল—কোথায় যাচ্ছ অমন হন হন করে?

নীতু ফিরে দাঁড়িয়ে হাসল—কোথায় আর যাবো? বাড়ি।

—দাঁড়াও, আমিও তো যাবো।

—না; আজ আর তোমাকে কষ্ট করে পৌঁছে দিতে হবে না।

—বেশ। আজকের কষ্টটা তাহলে তুমিই করো। মানে, আমাকে পৌঁছে দাও।

এই কদিন আগেই ওদের বাগবাজারের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে নীতীশ। সুশান্ত একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বেশ বড় বাড়ি। ওদেরই মত সুবেশ, সুন্দর, ছিমছাম। আগাগোড়া সাজানো গোছানো। কোনোখানে এতটুকু ধুলি-মালিন্যের স্পর্শ নেই। ওখানে সকলের মধ্যে বসে ভিতরে ভিতরে ভালো লেগেছিল নীতীশের, কিন্তু বাইরের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মনে হচ্ছিল, ঐ পরিবেশে সে বড় বেশী বেমানান, যেন ওখানে গিয়ে বসাটা তার অনধিকার প্রবেশ। সুশান্তর মা তাকে সামনে বসে খাইয়েছিলেন। সে-সব খাবার তার কাছে একেবারে নতুন। প্যাস্ট্রি এই প্রথম দেখল। চীজ যে কোন্‌ চিজ, কেমন করে কিসের সঙ্গে খেতে হয়, তাও জানত না। আড়চোখে সুশান্তর ডিসের দিকে চেয়ে তাকে পাঠ নিতে হচ্ছিল আর এই ভেবে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল যে এঁরা সব ধরে ফেলেছেন, বুঝে নিয়েছেন সে তাঁদের স্তরের, তাঁদের সমাজের নয়।

খাবারের চাইতেও নতুন লাগছিল সুশান্তর মাকে। তার নিজের মায়ের সঙ্গে কত তফাৎ—চেহারায়, বেশভূষায়, কথাবার্তায়, চালচলনে! তবু চোখ দুটি থেকে তেমনি স্নেহ ঝরে পড়ছে! তেমনি মাধুর্যময় মুখখানা। সেখানে বড়লোকের কোনো বিশেষ ছাপ নেই, দম্ভ বা দূরত্বের চিহ্নও চোখে পড়ল না। অতি সহজে তাকে গ্রহণ করলেন, অনায়াসে আপন করে নিলেন! অথচ এই বড়লোকদের সম্বন্ধে সে কত কথাই না শুনেছে! তারা একটা আলাদা জাত, এবং প্রতি আচরণে জানিয়ে দেয়, তারা আলাদা। এঁদের আচরণে অন্তত তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

সুশান্তর ছোট বোন রুনুকেও সেইদিন দেখেছিল নীতীশ। বেশ লম্বা,

ছিপছিপে গড়ন, ফ্রক পরে। ক্লাস সিক্সে উঠেছে। অত বড় মেয়ে ফ্রক পরে দেখে প্রথমটা একটু অবাক হয়েছিল। তারপর বুঝেছিল, এটাই এখানকার রীতি। তাদের সমাজে হলে নিন্দাকরত সবাই। অথচ নিন্দার কী আছে এর মধ্যে? বরং, নিজের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, ফ্রকেই বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে।

প্রথমে সে আসে নি, সুশান্তর হাঁকডাকেও না। তারপর মা ডাকতে লাজুক লাজুক মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে। আসতেই সুশান্ত বলেছিল—ফোর্থ হয়ে উঠেছে; তাতেই মেয়ের মাটিতে পা পড়ে না। আর এই দ্যাখ্ একজন জলজ্যান্ত ফার্স্ট বয়।···জানো মা, নীতীশ হাফ্ ইয়ার্লিতে দারুণ নম্বর পেয়েছে।

—প্রতিভাবান ছেলে, ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন মা—নাক-চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

শোনামাত্র ঝুনু হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়েছিল ওর মুখের পানে। মাথা নুইয়ে বসে থাকলেও নীতীশের দৃষ্টি এড়ায় নি।

—তাছাড়া, এমন সুন্দর রিসাইট্ করে—বন্ধুগৌরবে উচ্ছলকণ্ঠ সুশান্তর—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ।

—তাই নাকি!—তার মার মুখেও খুশির সুর।

—হয়ে যাক না একটা? সুশান্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল, মার ভীষণ ফেবারিট্ পোয়েট্।

—হ্যাঁ বাবা, ওঁর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে।

—আর বাবা ঠিক উল্টো। বলেন, রবি ঠাকুর আবার কবিতা লিখতে শিখল কবে?

—ওঁর কথা ছেড়ে দাও।

—কার কথা ছেড়ে দেবে? বলতে বলতে সুশান্তর বাবাও এসে পড়েছিলেন আপিস ফেরত। নীতীশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—কে ছেলেটি?

তাঁর সঙ্গে সেদিন বেশী আলাপ হয় নি। যে দু-চারটা কথা বলেছিলেন, তার মধ্যেও একটা সরল আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছিল নীতীশ! ভারী দিলখোলা মানুষ! একটু পাগলাটে। জোর দিয়েই বলেছিলেন—বাংলা-টাংলা পড়ে কিচ্ছু হবে না। খালি সময় নষ্ট। ইংরেজি পড়। যে লাইনেই যাও, কাজে লাগবে। আমি একসময়ে সরকারী চাকরি করতাম, এখন ব্যবসা করি। দু জায়গাতেই দেখলাম, উঁচুতে উঠতে হলে একটি জিনিস সকলের আগে দরকার। তার নাম গুড্ ইংলিশ।

আর একটা ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক—ইংরেজি শিখবার সোজা রাস্তাটা তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। কশে ইসপ্স্ ফেবল পড়। রোজ একটা করে গল্প মুখস্থ করে যাও। ব্যস, আর কিছু ভাবতে হবে না।

সেদিনকার সেই বিকেলটি নীতীশের কাছে শুধু বিশেষ নয়, অনন্য। একটি নতুন অভিজ্ঞতা, যার স্বাদ সে আগে পায় নি। একটি আলাদা জগৎ, যার

সম্বন্ধে সে ছিল একান্ত অজ্ঞ। সব ছাপিয়ে তার মধ্যে একটি মাধুর্য ছিল, এবং সুশান্তর কাছ থেকে আজ আবার যখন যাবার তাগিদ এল, তখন সেইটুকুই তার মনের নিভৃতে আনাগোনা করছিল। সুশান্ত তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে উঠল—কী ভাবছ? চল।

—আজ থাক।

—কেন, থাকবে কেন? ভয় নেই, পড়ার ক্ষতি হবে না। ছটার আগেই পৌঁছে দিয়ে যাব।

—না, সেজন্য নয়।

—তবে?

নীতীশ হঠাৎ কোনো ওজর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। এগিয়েও গেল না। মনটা যে ভিতরে ভিতরে ঐ দিকেই টানছে, নিজের কাছে লুকোতে পারছিল না বলে আরো লজ্জা করছিল। সুশান্ত কাঁধের উপর হাত রাখতেই আর আপত্তি করল না।

গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, নীতীশ তখনো বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল। বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। সুশান্তর মাথায় তখন এক ফন্দি এসেছে—একটা মজা করা যাবে। প্রথমটা তোমাকে ওপরে নিয়ে যাবো না। বাইরের ঘরে বসবে।

মতলবটা বুঝতে না পেরে নীতু তার দিকে ফিরতেই বাকীটুকু ব্যক্ত করল সুশান্ত—মা মাঝে মাঝে বলে কিনা, নীতুকে একদিন নিয়ে আসিস। ঝুনুটা অমনি ফোড়ন কাটবে, এলে তো!

—কেন, আসবে না কেন?

—যা একখানা কলা-বৌ!

আজ অমনি একটা কিছু বললেই ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দেবো তোমার সামনে। খুব জব্দ হবে।

নীতীশের সারামুখে কে যেন একরাশ আবির মাখিয়ে দিল। ইচ্ছা করছিল, মাটির সঙ্গে মিশে যায়, কিংবা গাড়ি থামিয়ে ঐখানেই নেমে পড়ে।

কোনোটাই সম্ভব নয়।

নীতীশকে নীচের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে সুশান্ত উপরে উঠে গেল। মতলবটা আপাতত মার কাছেও ভাঙা হবে না। সুযোগ করে নিয়ে ঝুনুর সাক্ষাতে কথাটা পাড়বে, একটু অন্যরকম করে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলবে—এল না মা।

মা জানতে চাইবেন—কে?

—আর কে? নীতু। এত করে বললাম, শুনল না। তার নাকি কি সব কাজ আছে। বিকেল বেলা আবার কী কাজ বল দিকিন?

ঝুনু এই সুযোগে দাদাকে একটা খোঁচা দেবার লোভ নিশ্চয়ই সামলাতে পারবে না। বলে উঠবে—তা থাকে বৈকি? সবাই তো তোমার মত আড্ডা দিয়ে আর বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারম খেলে বেড়ায় না। ভালো ছেলেরা পড়াশুনো করে।

কিংবা বলবে—তা হলেই বুঝতে পারছ কতখানি বন্ধু তোমার !

অথবা, এরই মধ্যে যেরকম পেকে উঠেছে ঝুনুটা, মা শুনতে পান এমনি ভাবে নীতুর উদ্দেশেও একটা বাঁকা কটাক্ষ করে বসতে পারে, এর আগে যেমন করেছে। হয়তো বলে ফেলবে—মাথায় একটা ঘোমটা দিয়ে আসতে বললে না কেন তোমার বন্ধুকে ?

—বটে ! দাঁড়া বলে দিচ্ছি, বলে তখনই সিঁড়ির মাথা থেকে হাঁক দেবে সুশান্ত—'নীতু' ! কিংবা বোনকে ধরে নিয়ে হাজির করে দেবে তার মুখোমুখি। ছোট হলে কি হয় ? বোনের সঙ্গে কথায় কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। এইভাবে তাকে জব্দ করবে।

—তোমার পায় পড়ি, দাদা। বলো না—বলে যতই কাকুতিমিনতি করুক, শোনা হবে না। নীতুর সামনেই সব ফাঁস করে দেবে। একখানা মজা যা হবে না তারপর !

এমন একটা চমৎকার ফন্দি যে তার মাথায় এসেছে তার জন্যে নিজেই নিজেকে বাহবা দিল সুশান্ত, এবং কল্পিত ঘটনার দৃশ্যগুলো মনে মনে মহড়া দিতে দিতে উপরে উঠে গেল। গিয়েই ঝুনুর খোঁজ করল। কোথায় ঝুনু ? এঘর ওঘর ঘুরে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করল—ঝুনু আসে নি মা ?

—এসে আবার একটু বেরোল।

—কোথায় গেল ?

—নীলাদের বাড়ি। ও এসে ডেকে নিয়ে গেল।

নীলাদের বাড়ি অবশ্য দূর নয়। কয়েকখানা বাড়ির পরেই। কিন্তু দুই বন্ধুতে একবার জমে গেলে সন্ধ্যার আগে ছাড়া পাবার আশা নেই। অর্থাৎ সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবার উপক্রম। নীতু বেচারা আর কতক্ষণ একা একা বাইরের ঘরে বসে থাকবে ? মনে মনে বিরক্ত হল সুশান্ত। তার কথাতেও সেটা অস্পষ্ট রইল না—তোমার মেয়ে বড্ড আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে, মা। এখন থেকেই শাসন করা দরকার।

মা মনে মনে হাসলেন। তাঁর কিশোর পুত্রটি যে হঠাৎ এতখানি কড়া অভিভাবক হয়ে উঠল, তার আসল কারণটা বুঝতে পারলেন না। স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতেই দুজনের মধ্যে খুনসুড়ি শুরু হয়। আজ একা একা ফাঁকা লাগছে। বোনের উপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

বললেন—বলে গেছে বেশী দেরী হবে না। এখ্খুনি এসে পড়বে।

অগত্যা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই স্থির করল সুশান্ত।

বাইরের ঘরে বসতে পেয়ে নীতীশ যেন বেঁচে গেল। এখনই একটা মস্ত বড় ফাঁড়ার মুখে পড়তে হল না। কিন্তু তারপর ? কী কাণ্ড করে বসে সুশান্ত কে জানে ? ভাবতেই হাত-পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠল। একবার ভাবল, এই ফাঁকে সরে পড়লে কেমন হয় ? পরক্ষণেই বুঝল, সেটা বড় বিশ্রী দেখাবে। কাল যখন দেখা হবে, কী কৈফিয়ত দেবে ওর কাছে ? আরো লজ্জায় পড়তে হবে। সুশান্ত যেরকম ছেলে, হয়তো মস্ত বড় একটা 'ফান' হিসাবে কথাটা সারা ক্লাসে

রটিয়ে দিতে পারে। কিংবা ওকে ভুল বুঝতেও পারে। মনে করবে, বাইরের ঘরে একা বসিয়ে চলে যাওয়ায় নীতু রাগ করে চলে গেছে।

দেরি হচ্ছে দেখে একদিকে যেমন খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছিল নীতীশ, আরেক-দিকে তেমনি আশঙ্কাও বাড়ছিল। উপরে নিশ্চয়ই কোনো বড় রকম মতলব আঁটা হচ্ছে। হয়তো ঝুনুও আছে তার মধ্যে। কী অবস্থার সামনে গিয়ে তাকে পড়তে হবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

ঘরের দেয়ালে কয়েকখানা ছবি ছিল। বেশির ভাগ ল্যান্ড্‌স্কেপ। বিদেশী দৃশ্য। দুখানা ছিল বড় অয়েল পেইন্টিং; চওড়া সোনালি ফ্রেমে বাঁধা। একটিতে অনেক সাহেব-মেম—ভিকটোরিয়ান যুগের কিংবা তারও আগেকার দিনের জমকালো পোশাক তাদের গায়ে। ফ্রেমের উপর বসানো একটি চাকতি। তাতে ছোট ছোট অক্ষরে কি সব লেখা। সম্ভবত ছবির পরিচয়। বসে বসে বোঝা যাচ্ছিল না বলে কাছে গিয়ে দেখবার জন্যে যেমনি উঠেছে নীতীশ দরজার দিকে নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কাঠ। চোখ দুটো আপনা থেকেই নেমে এল।

ঝুনুও কম অবাক হয় নি। নীতীশ নিজে থেকে ওদের বাড়িতে এসেছে, এ যে একেবারে অভাবনীয়। বিস্ময়ের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম মৃদু হাসিও খেলে গেল ঠোঁটের কোণে। এলে কি হয়? চুপ করে বসে আছে বাইরের ঘরে। সোজা ওপরে চলে যাওয়া দূরে থাক, বন্ধুকে একবার ডাকতেও পারে নি। তাতে যে খানিকটা গলা ছাড়তে হয়। চাকরবাকরদের খোঁজ করে একটা খবর দেবার মত 'সাহসটুকুও' হয় নি। আচ্ছা ছেলে যা হোক!

দরজার সামনে এগিয়ে এসে বলল—আপনি কখন এলেন?

নীতীশ চোখ দুটো একটু তুলল। উত্তরও একটা দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটা বাক্য পুরো করতে পারল না। বলল—এই—মানে, কিছুক্ষণ—

—দাদকে খবর দিয়েছেন?

এবার অসহায়ভাবে তাকাল নীতীশ। বুঝে উঠতে পারল না, এইমাত্র যে তাকে এখানে বসতে বলে চলে গেল, তাকে আবার খবর দেওয়া যায় কেমন করে।

ঝুনু হাসি চেপে বলল—ওপরে চলুন।

—আমি! সবিস্ময়ে নিজের বুকের ওপর আঙুল রাখল নীতু।

—হ্যাঁ; কেন, মার সঙ্গে দেখা করবেন না?

—কিন্তু সুশান্ত যে বললে—

—সুশান্ত বললে! দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে নাকি?

এবার নীতীশের খেয়াল হল সুশান্ত যে মতলব নিয়ে গেছে, সেটা তো এর জানবার কথা নয়। বোনকে এবং সেই সঙ্গে তাকেও কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলাই তার প্ল্যান। এই কথা মনে হতেই এর সঙ্গে কেমন একটা যোগসূত্র অনুভব করল। তাদের দুজনকে যেন এক দলে ফেলেছে সুশান্ত। অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আনন্দের ধারা বয়ে গেল। বেশ সহজভাবে বলল—ও

আর আমি তো একসঙ্গেই এলাম।

—একসঙ্গে এলেন! কথাগুলো অনেকটা আপন মনে আউড়ে গেল ঝুনু, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। সুশান্ত নীতীশকে সঙ্গে করে এনে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে উপরে চলে গেছে, এটা কেমন করে বিশ্বাস করে?

ব্যাপারটার কোনো মাথা-মুণ্ডু বের করতে না পেরে ঝুনু যখন চুপ করে ভাবছে, সেই ফাঁকে, নীতীশের মনে হল, তারও কিছু একটা বলা উচিত। এতক্ষণ ও-তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আর সে শুধু উত্তর দিয়ে গেছে। এবার তার তরফ থেকেও যদি দু-একটা প্রশ্ন না করা যায়, তার 'কলাবো' অপবাদটাই কায়েম হয়ে দাঁড়াবে। তাকে প্রমাণ করতে হবে, সেও কথা বলতে জানে। কিন্তু কী জিজ্ঞেস করা যায়? একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল—আপনি ভাল আছেন?

—এমা! আপনি বলতে হয়? আমি না আপনার ছোট? আপনি আমার দাদার বন্ধু না?

সবই সত্যি। কিন্তু সত্যি হলেই কি ফস করে 'আপনি'র বদলে 'তুমি' বসিয়ে দেওয়া যায়? এর পরে আর কোন্ প্রশ্ন করা যায়, তাও ভাববার কথা। সে ভাবনা থেকে সুশান্ত তাকে রক্ষা করল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বোনকে উদ্দেশ করে বলল—এতক্ষণে বুঝি পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে ফেরা হল? সেই কখন থেকে এসে বসে আছে বেচারা। মহারাণীর দেখাই নেই!

অর্থাৎ ঝুনুর জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে নীতু। একা একা তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখবার আসল উদ্দেশ্য তো আর ব্যক্ত করা যায় না। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে এমনি একটা অসার কৈফিয়ত এনে হাজির করল সুশান্ত। তার নিজের কাছেই কেমন বেখাপ্পা শোনাল। কিন্তু আর কী বলা যায়?

ঝুনুর কানে কিন্তু বড় মিষ্টি লাগল এই কারণটা। তার জন্যে বসে আছে নীতু! একটা মধুর লজ্জায় চোখ দুটো নেমে এল। সারা মুখময় ছড়িয়ে পড়ল রক্তিমাভা। পাছে ধরা পড়ে যায় তাই কোনো দিকে না চেয়ে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেল।

সে যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে সুশান্ত নীতীশের কাছে সরে এসে চাপা গলায় হতাশার সুরে বলল—কিছু হল না। চল, ওপরে গিয়ে বসি।

—আমি এখন যাই।

—পাগল! মা তাহলে আস্ত রাখবে আমাকে?

উপরে নিয়ে গিয়েও যে সহজে নিস্তার পেল সুশান্ত তা নয়। মার কাছে বেশ খানিকটা অনুযোগ শুনতে হল। নীতীশ যে তার সঙ্গে এসেছে, এ খবরটা চেপে গিয়ে ও নিজে থেকে এসে নীচে বসে আছে, এরকম একটি কাহিনী রচনা করবার সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ঝুনু এসে সত্য ঘটনাটা আগেই ফাঁস করে দিয়েছে। যাকে জব্দ করতে চেয়েছিল, সে-ই তাকে উল্টে জব্দ করে বসে আছে।

আজকের জলযোগের ব্যবস্থাটা হল একেবারে দেশী মতে। কেক্, প্যাস্ট্রি,

প্যাটীজ,—ইত্যাদির জায়গায় গরম গরম ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম। এসব জিনিসে নীতীশ একেবারে অনভ্যস্ত নয়। খাবার টেবিলে সেদিন যে অস্বস্তি বোধ করছিল আজ আর সেটা রইল না। প্রথম দিনের সদ্য পরিচয়ের বাধাও অনেকটা কেটে গিয়েছিল। তার উপরে এদের এই পরকে আপন করে নেবার সহজ ধরনটি তার স্বভাবজ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠবার পথও সহজ করে দিল।

চা'এর পাট শেষ হতেই মা সুশান্তর উদ্দেশে বললেন—তিনজনে এবার লাউঞ্জে বসে গল্প কর।

সে প্রতিবাদ করে উঠল—আর তুমি বুঝি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকবে? কী যেন সেই কবিতাটা, নীতু, তুমি সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলে?—রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা, পরের লাইনটা ভুলে গেছি। বল না?

নীতুর মনে ছিল, কিন্তু বলল না। মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

সুশান্ত বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—'বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।' মার হয়েছে ঠিক তাই।

মা বললেন—তা যাই বল, রান্নাঘরই তো মেয়েদের রাজত্ব। বল নীতু।

নীতু কিছু বলবার আগেই সুশান্ত চেঁচিয়ে উঠল—মোটে না। ওসব বাজে কথা শুনছি না। চল! বলে, উঠে গিয়ে মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে লাউঞ্জের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করল।

দৃশ্যটি নীতীশের চোখে নতুন! তার মায়ের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তার গভীরতা কারো চেয়ে কম নয়। হয়তো অনেকের জীবনেই মা অতখানি জায়গা জুড়ে নেই। তবু বড় হবার পর মাকে অমন করে আদর করার কথা সে ভাবতে পারে না। তাদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত সংসারে ঠিক এ জিনিসটি সে দেখে নি। মা-ছেলের সম্বন্ধ যতই অন্তরঙ্গ হোক, তার প্রকাশের এই ধরনটি সেখানে বোধহয় একটু বিসদৃশ। এটা তাদের রীতি নয়। কেউ যদি করে অন্যেরা মনে করবে বাড়াবাড়ি।

এবার যখন বাড়ি যাবে, নিজের মনে বলল নীতীশ, সে কি পারবে এমন করে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে? ভাবতেই কেমন লজ্জা-লজ্জা করছিল। ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা করলেও পারবে না। এগিয়ে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবে। মা তার মাথায় গায় হাত বুলিয়ে দেবেন। হয়তো কণ্ঠায় হাত দিয়ে বলবেন, ইস, বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠবে।

যখন ছোট ছিল, নটখোলায় যখন পড়ত, তখন বাড়ি এলে মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। এখন আর তেমন করে আদর করবেন না। এখন সে বড় হয়েছে। সুশান্তরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান। এরা অত তাড়াতাড়ি বড় হয় না। হলেও মায়ের এই নিবিড় সান্নিধ্য, শুধু মনের দিক থেকে নয়, বাইরের দিক থেকেও বারবার ভোগ করতে পারে।

সুশান্ত যখন মাকে ওঘরে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তিনি একটু

বিরক্তির সুরে বললেন—হচ্ছে কী ! সেটা যে নিছক কৃত্রিম তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল নীতীশ। সেখান থেকে উপচে পড়ছিল একটি মধুর খুশির ধারা।

এ ব্যাপারে, অর্থাৎ মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে বসাতে দাদার পিছনে খুকুরও যে পুরো সমর্থন রয়েছে, তার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটিই তা বলে দিচ্ছিল। মুখের কথায় অবশ্য অন্য সুর প্রকাশ পেল—আহা ! বুড়ো ছেলের কাণ্ড দ্যাখ না ?

—কেন, তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে ? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল সুশান্তর, এবং তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেশ খানিকটা জয়োল্লাস। বোনকে এবার সে সত্যি সত্যি হারিয়ে দিয়েছে। মাও তার পক্ষ নিলেন, হিংসে হলে চলবে কেন ? মেয়ের দিকে চোখ তুললেন, ও আগে এসেছে, ওর দাবি বড়।

—ইস, তাই বুঝি ? বলে মেয়েও তার পাল্টা দাবি প্রয়োগ করতে ছুটে গেল। মা এবার তেড়ে উঠলেন—তোরা এইসব করবি, না নীতুকে নিয়ে গিয়ে ওঘরে বসবি ? তারপর স্বর নামিয়ে মিষ্টি সুরে বললেন—আমি ভাঁড়ারটা বের করে দিয়েই আসছি।

সমস্ত দৃশ্যটি তৃষিত চক্ষু মেলে উপভোগ করল নীতীশ। তার সমস্ত মন মাধুর্যে ভরে গেল। সেই সঙ্গে একটি বেদনার স্পর্শ—তারা এটা পারে না, তাদের ঘরে, আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব নিয়ে তার যে পরিচিত সমাজ, সেখানে পারিবারিক আনন্দের এই সহজ স্বচ্ছন্দ মধুর রূপটি অকল্পনীয়। এমন করে তারা মিশতে জানে না।

কথা ছিল, সন্ধ্যার আগেই নীতীশকে মেস-এ ফিরে যেতে হবে। তার পড়তে বসবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, দাদাই ঠিক করে দিয়েছেন। সেটা না পেরিয়ে যায়। কিন্তু পেরিয়ে গেল। আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা কখন ফুরিয়ে গেছে, তার খেয়াল ছিল না। আগের দিন যেমন সে প্রায় সব সময়টা চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছিল, আজ হল ঠিক উল্টো। সুশান্তর মা তার দেশের কথা, মা-ভাই-বোনদের কথা একটি একটি করে জেনে নিচ্ছিলেন, আর সে ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছিল। বিশেষ করে তাদের সেই গাছপালা ঘেরা বাড়িটা, তার প্রশস্ত উঠোন, বাড়ি থেকে নেমেই সেই বিশাল মাঠ, মাঠের কোলে বিল, এমনি দিনে প্রথম বর্ষার জল এসে যখন পড়ছে তার বুকে, সেই তীব্র স্রোত ঠেলে উজিয়ে যাওয়া কই মাছের সারি—এসব কথা যখন বলছিল, তখন আর তার গলায় বা বলায় কোনো জড়তা ছিল না। আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার কাহিনীর মধ্যে, তার তিনটি শ্রোতার কাছেই যা শুধু নতুন নয়, আশ্চর্য। তাদের চোখের তারায় ফুটে ওঠা প্রদীপ্ত কৌতূহল তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। সময়ের জ্ঞান ছিল না।

সেদিন সারা বিকেলটি ছিল নির্মেঘ, উজ্জ্বল। তারপর কখন সেখানে মেঘ জমেছে, সায়াহ্নের ম্লান আলোটুকু কালো পর্দায় ঢেকে গেছে, কারো জানা নেই। হঠাৎ গুরুগুরু ডাক শুনে চারজনেরই চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এল বৃষ্টি।

॥ ১৩ ॥

কলকাতায় বসেই তুমি ভেনিস দেখার সাধ মেটাতে পার ; তার জন্যে জাহাজের টিকিট কাটবার দরকার নেই, দরকার শুধু কয়েক পশলা বৃষ্টি—এই ধরনের রসিকতা নীতীশ তার মেস-এর বাবুদের মুখে শুনেছে এবং লক্ষ্য করেছে, অন্তত তাদের এই অঞ্চলে, যার নাম কালীতলা, কথাটার মধ্যে খুব বেশী অত্যুক্তি নেই। বর্ষার দিনে মাঝে মাঝে রাস্তাগুলো সত্যিই এক একটা খাল হয়ে দাঁড়ায় এবং তার উপর দিয়ে গণ্ডোলা না চললেও বড় বড় মাটির গামলায় চড়ে বস্তির ছেলেরা মনের আনন্দ পারাপার করে। অচল ট্রামগুলোকে মনে হয় সারি সারি নোঙর করা জাহাজ। রিকশার চাকা দেখা যায় না। জল কেটে কেটে যখন চলে মনে হয় অফিস-ফেরত বাবুরা নৌকা-বিহারে বেরিয়েছেন। বিহারটা যে বিশেষ উপভোগ করছেন না, সেটা তাঁদের হাঁটুর উপরে গোটানো ধুতি, ভিজে জামা কাপড় এবং বিরক্তিভরা মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

কলকাতার প্রথম বর্ষাটা নীতীশ কিন্তু খুব উপভোগ করেছিল। সে জলের দেশের ছেলে। যেদিন খুব বৃষ্টি নামত মেস-এর জানালায় বসে গলির দিকে চেয়ে মনটা তার উদাস হয়ে যেত। চোখের উপর ভেসে উঠত তাদের চালতা-তলার হালট* এমনি জলে ডুবে গেছে, ঘন বৃষ্টি মাথায় করে সন্ধ্যার মুখে একজন দুজন করে হাট থেকে ফিরছে তার প্রতিবেশীরা, কারো হাতে মাছের খালুই, কারো কাঁধে সামান্য সবজি কিংবা অন্য কিছু কিছু সওদা সমেত ধামা, পরনের কাপড় যতটা সম্ভব তুলে শক্ত করে কোমরের সঙ্গে বাঁধা—এখানকার চোখে যা ঠিক ভব্য বলে মনে হবে না,—মুখে কিন্তু ক্ষোভ নেই, নালিশ নেই কথাবার্তায়, গল্প করতে করতে চলেছে। জল কাদা ভেঙে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই যাওয়া-আসাটা তাদের নিত্য জীবনের অঙ্গ। গ্রাম্য প্রকৃতির এই উৎপাতগুলো তাদের প্রাত্যহিক অভ্যাসের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কোথাও বিশেষ বাধে না।

এখানে ঠিক উলটো। একমাত্র ঐ উলঙ্গ ছেলেগুলো যারা মাটির গামলা চালাচ্ছে কিংবা হুটোপাটি করছে গলির মোড়ে মোড়ে, তারা ছাড়া আর সকলেই অপ্রসন্ন। কেউ নীরবে কেউ সরবে অভিশাপ দিতে দিতে চলেছে এই আষাঢ়ের বৃষ্টিধারাকে, মুণ্ডপাত করছে কর্পোরেশনের কিংবা পাশ দিয়ে দ্রুত চলমান দু-একখানা মোটর গাড়ির দিকে সরোষে তাকিয়ে এমন সব উক্তি করছে যা ঠিক শ্রাব্য নয়, অন্তত ভদ্রসমাজে চলে না।

সুশান্তদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে যখন সারি বাঁধা ট্রামগুলো চোখে পড়ল এবং গাড়ির নীচে জলের শব্দ শুনতে পেল, তখন নীতীশও এই দুর্যোগকে মনে মনে অভিশাপ না দিয়ে পারল না। পিছনের সীটে তারা দুই বন্ধু, সামনে ড্রাইভার। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে

* অপেক্ষাকৃত চওড়া মেঠো পথ।

এল। বাইরে তখনো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দু'ধারের কাঁচ বন্ধ। সুশান্ত বলল—এবার বোধহয় তোমাদের কালীতলা ক্যানালে পড়লাম। তার সুর হালকা, মুখ হাসি-হাসি। নীতুর দিকে তাকাল। সে কোনো সাড়া দিল না। সুশান্ত হাত বাড়িয়ে ছোট্ট সুইচটা টিপতেই গাড়ির মধ্যে একটি মৃদু আলো জ্বলে উঠল। নীতুর মুখেও বাইরের আকাশের মত আষাঢ়-মেঘের গাম্ভীর্য। সুশান্ত বলল—তোমার দাদা কি রাগ করবেন? রাত হয়েছে বলে?

—না, না, রাগ করবেন কেন? হাসবার চেষ্টা করল নীতীশ। হাসিটি যে ফুটল না সে নিজেও বুঝতে পারল।

সুশান্ত আর কিছু বলল না। নীতীশ রাস্তার দিকে চেয়ে টের পেল, জল একটু একটু করে বাড়ছে। বলল—আমি এখানেই নেমে যাই।

—এখানে নামবে কী! এই জলের মধ্যে! তার ওপরে বৃষ্টি হচ্ছে।

—এ বৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হবে না।

—অসুবিধা হবে না মানে? ভিজে ঢোল হয়ে যাবে। গাড়ি যদ্দুর যায় চল না?

নীতীশের মেস-এ যেতে হলে ঠনঠনের কালীবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিতে হয়। ওখানটায় জল আরো গভীর বলে ড্রাইভার তার খানিকটা আগে থেকেই অন্য গলিতে ঢুকল এবং কম জল পেয়ে গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিল। সরু গলি। লোকজন নেই বললেই হয়। দু-একজন যা চলছিল, গাড়ির আওয়াজ শুনেই তাড়াতাড়ি নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হঠাৎ বাঁ দিক থেকে একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার—ঈস, দিলে তো জামাটা শেষ করে! একটু আস্তে চালালে কি মান খোয়া যায় ড্রাইভার সায়েব?

নীতীশ চমকে উঠল। গলাটা তার চেনা। ঠিক পাশেই একটি ল্যাম্প-পোস্ট। তার আলোতে মানুষটিকেও স্পষ্ট দেখা গেল। অগ্নিগোলকের মত দুটি চক্ষু তখন ড্রাইভার ছাড়িয়ে আরোহীদের উপর এসে পড়েছে। চোখাচোখি হতেই নীতীশ চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তার আগেই অপর পক্ষ যে তাকে চিনে ফেলেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।

মেস-এর গলিতে জল কম। গাড়ি যেতে পারত। কিন্তু ওদিকে দিয়ে বেরোনো যাবে না, ঘুরিয়ে আনতে হবে। সে বড় কঠিন কসরৎ। গাড়ি সগর্জনে আপত্তি জানাতে থাকবে। সাড়াশব্দ পড়ে যাবে মেস-এর সামনে। আজ অন্তত নীতীশ তা চাইছিল না। গলিতে ঢুকবার মুখে গাড়িটা যে-ই দাঁড়িয়েছে সে বলে উঠল, এইখানেই থাক। এটুকু আমি হেঁটে যেতে পারবো।

সুশান্ত আর আপত্তি করল না, দরজাটা খুলে ধরল। বৃষ্টি আর তখন নেই।

উপরে উঠে রেলিংঘেরা সরু বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে নীতুর নজরে পড়ল দাদার দুখানা পা। তক্তপোশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, দরজার ঠিক সামনে। বুকের ভিতরটা জোরে জোরে উঠানামা করতে লাগল। পা দুটোও মন্থর হয়ে এল। ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে বইগুলো যখন তাকের উপর

রাখতে যাচ্ছে, যতীশ খবরের কাগজখানা মুখের উপর থেকে সরিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলল—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

উত্তর দিতে গিয়ে একবার ঢোক গিলতে হল নীতীশকে। তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল—সুশান্তদের বাড়ি।

—সুশান্ত কে ?

—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

—কোথায় থাকে ?

—বাগবাজার।

—বাগবাজার ! কী করে এলি ?

—ওদের গাড়িতে।

আর কোনো প্রশ্ন না করে খবরের কাগজে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল যতীশ। কিন্তু শুধু ঐ দৃষ্টিটাই রইল সেখানে, মন আর ফিরে গেল না। মন চলে গেল কয়েক দিন পিছনে। হয়তো মেস-এর সামনে দেখা সেই গাড়িটাই আজ আবার পেঁৗছে দিয়ে গেল, সেই ছেলেটিই সুশান্ত। কিংবা এটি কোনো নতুন বন্ধু। গাড়িওয়ালা ছেলে তো ওখানে একটি দুটি নয়।

প্রথম দিনকার ব্যাপারটাকে একেবারে তুচ্ছ করে না দেখলেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব না দেবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল যতীশ। ও নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে নি, যদিও ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ ছিল। ঐ মোটরটাকে যদি শুধু যান হিসাবে দেখা যেত, যাতে চড়ে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করে, তাহলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ওর পরিধি আরো অনেকখানি বিস্তৃত। ও একটা জীবনধারা থেকে আরেকটা জীবনধারায় নিয়ে যাবার পথ খুলে দিচ্ছে। সে দু-এর চেহারা একেবারে আলাদা। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ঐ দ্বিতীয়টির মধ্যে একটি আপাত-মনোরম আকর্ষণ আছে, যার পরিণাম তাদের জীবনে অনেক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

সেদিন এইটুকুই ভেবেছিল যতীশ। আজ সেই ভাবনার মধ্যে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। শুরুতে যা ছিল শুধু আকর্ষণ, ক্রমশ তা প্রলোভনের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। সেদিন ছিল ছুটির পরে স্কুল থেকে মেস-এ পেঁৗছে দেওয়া, আজ ডাক এসেছে বাড়ি থেকে, এ পক্ষ থেকে সাড়াও রয়েছে। দিন দিন সেটা ব্যাপকতর হবে। সুতরাং আর দেরি নয়, এবার রাশ টানা প্রয়োজন।

যতীশ স্থির করল আজই খাবার পরে এ প্রসঙ্গে কথা পাড়বে। উঠে পড়ে বলল—চল, খেয়ে আসি।

নীতীশের পেট ভরা, খাবার স্পৃহা একেবারেই ছিল না, কিন্তু সে কথা বলবার সাহস হল না। এতটা রাত বাইরে কাটানো, তার উপরে বাইরে থেকে খেয়ে আসা—অপরাধের মাত্রা তাতে অনেকখানি বেড়ে যাবে। খিদে থাক আর না থাক ভাতের থালার সামনে গিয়ে বসতে হবে এবং কিছুটা মুখেও পুরতে হবে। দাদার দৃষ্টি সেদিকে সজাগ।

দুজনে বেরোতে যাবে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন বাবুরামবাবু।

তাঁর নিজের হাতে কাচা এবং বাটিসহযোগে সযত্নে ইস্ত্রি করা ধবধবে সাদা সার্টটির গায়ে একরাশ কাদার ছোপ। মুখে নাকে এবং কপালেও কিছু ছিটে গিয়ে লেগেছে। সেটা অবশ্য তিনি দেখতে পাচ্ছেন না এবং সম্ভবত জানতেও পারেন নি। পারলেও আপাতত তার শোক এবং ক্ষোভ দেহের চেয়ে জামার জন্যেই বেশী। সেইটাই স্বাভাবিক। কপালের দাগ তো ধুলেই উঠে যায় কিন্তু কাপড়ের দাগ? তার পিছনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাছাড়া বাদল দিনে গায়ে এক-আধটু কাদার ছিটে লোকের নজরে পড়ে না। কিন্তু ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের উপর এই কর্দম-লাঞ্ছনা সবাই একবার তাকিয়ে দেখে। রাস্তার লোকের সহানুভূতিরও অভাব হয় না। কিন্তু তাদের মুখের ভাষায় দুঃখ প্রকাশ যতই থাক, চোখের ভাষায় থাকে কৌতুক।

সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়ে ফিরছিলেন বাবুরাম। ঘরে ঢুকতেই যতীশ বলে উঠল—ঈস্! এ কেমন করে হল?

নীতু ছিল পিছনে। বাবুরাম তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে উষ্মার সুরে বললেন—আপনার ঐ বড়লোক ভাইটিকে জিজ্ঞেস করুন।

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে যতীশ ভাইয়ের দিকে চোখ ফেরাল। সে যথারীতি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবুরাম তাকে উদ্দেশ করে বললেন—চুপ করে আছ কেন? বল না?

নীতু তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে আশেপাশের ঘর থেকে আরো দু'চারজন মেম্বার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সকলের চোখেই কৌতূহল এবং মুখে ঐ একই প্রশ্ন। বাবুরামকে ঘটনাটা প্রকাশ করতে হল। এবার বেশ কিছুটা শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—এ কিছু না। আমাদের যতীশবাবুর ভাই মোটরে চড়ে একটা হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। দোষ আমারই। তাড়াতাড়ি পালাতে পারি নি। তাই,— বলে জামার অবস্থাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

—হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল? নীতু! ওপাশ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করলেন কে একজন।

—আপনি কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন, মশাই? ও মোটর চড়বে কোত্থেকে? দৃঢ় স্বরে বললেন আরেকজন।

বাবুরাম প্রতিবাদ করলেন—আমার তো আর ভীমরতি হয় নি যে ভুল দেখবো। ওকেই জিজ্ঞেস করুন না?

সেই ভদ্রলোক নীতীশের দিকে ফিরলেন—তাই নাকি নীতু? তুমি মোটরে করে বেরিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, মাথা না তুলেই উত্তর দিল নীতীশ।

—কার মোটর?

—আমার এক বন্ধুর।

তিনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। অন্য একজনের মন্তব্য শোনা গেল —এরই মধ্যে বেশ ডানা গজিয়েছে দেখছি।

—আহা, ডানা গজাবার কী দেখলে ? সেই ভদ্রলোকই বোধহয় যেতে যেতে বললেন—বন্ধুর গাড়ি আছে। বেড়াতে বেরিয়েছে। এতে দোষের কী আছে ?

অন্য সময় হলে যতীশও হয়তো ব্যাপারটাকে সেইভাবেই দেখত। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ করে যে পরিস্থিতির সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হল, তাতে করে স্বভাবতই মনের ভিতর অনেকখানি তিক্ততা জমে উঠল। ক্ষোভও হল। এই ভাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সে প্রাণপাত করে চলেছে। আর এর সেদিকে হুঁশ নেই। বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি আমোদ করে সময় নষ্ট করছে। নিতান্ত ছোট নয় যে নিজের ভালোমন্দ বোঝে না। আজ বাদে কাল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। সে কথাও যেন ভুলে মেরে বসে আছে ! তাদের মত যারা গরীব, লোকের বাড়িতে থেকে সংসারের নানা খাটনি খেটে বাজার করে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কত কষ্টে তারা লেখাপড়া করে। একে তার কোনোটাই করতে হচ্ছে না। শুধু পড়াশুনো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। সব চেয়ে সেরা স্কুলে, তাদের পক্ষে কল্পনাতীত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে মানুষ হচ্ছে। একমাত্র কাম্য—সেগুলো যেন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। কোথায় সে চেষ্টা ?

ভাবতে গিয়ে যতীশের মনটা নৈরাশ্যে ভরে গেল। করুক যা খুশি। বড় ভাইয়ের যেটুকু কর্তব্য তাই শুধু সে করে যাবে। বাকী ওর নিজের হাতে। ও যদি ইচ্ছা করে গা ভাসিয়ে বসে থাকে থাক। তার ফল ও নিজেই ভোগ করবে। তার কাজ সে করেছে। বারংবার সাবধান করে দিয়েছে। তারপরেও যদি না শোনে, আর কী করবার আছে ?

পরক্ষণেই মনে হল, না, নীতুর জন্যে তার করণীয় অনেক। ও শুধু তার ভাই নয়, ভার। সে ভার তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে যতদিন সেটা ও নিজের কাঁধে তুলে নিতে না পারে। ওকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া তার দায়, তার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার। পিতার শেষ ইচ্ছা তো সে জানে। নিজের কানে শোনে নি, কিন্তু মা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যু এসে যখন শিয়রে দাঁড়িয়েছে তখনো তিনি তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না, ইষ্টদেবতার নাম নিতে পারছেন না। সেই বেদনা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মনোরমা স্বামীকে শেষ আশ্বাস দিয়েছিলেন —তুমি ভেবো না। যতে যদি মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, এর ভার সে-ই তুলে নেবে।

তাই নিয়েছে যতীশ। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভাইয়ের উপরে তাকে যদি রূঢ় হতে হয়, তাতেও তার পিছিয়ে আসা চলবে না।

বাইরে আবার অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে যে গুমোট ভাবটা ছিল, কেটে গিয়ে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা পড়েছে। সারাদিন খাটুনির পর এঘরে-ওঘরে আরামে ঘুমোচ্ছে বাবুরা। পাশের তক্তপোশে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে বাবুরামবাবুও কুঁকড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। যতীশের চোখে ঘুম নেই। তার নিজের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। এ কটা বছর একটানা চলবার পর এবার একটা মোড় দেখা যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছেই স্থির করতে হবে কোন

পথ ধরবে। তার সঙ্গেও নীতুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের চেয়ে ভাইয়ের চিন্তাই তার বিনিদ্র মস্তিষ্কের সবটুকু অধিকার করে রইল।

মেঝের বিছানায় নীতুও অনেক রাত পর্যন্ত তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝখানে দোল খেতে খেতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার আগে তার চোখের উপর বারবার আনাগোনা করছিল ঐ দিনেরই কয়েকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। একটি আনন্দমুখর আষাঢ় সন্ধ্যা, যা এই প্রথম এসেছিল তার জীবনে, হয়তো আর কোনোদিন আসবে না। বুঝতে পারছিল ওটা তার কাছে নিষিদ্ধ জগৎ। হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল। সেটা যে অনধিকার প্রবেশ তখনই জানত, নিজের জগতে ফিরে এসে আরো কঠোর ভাবে জানল। কিন্তু যা নিষিদ্ধ তারই উপরে মানুষের লোভ, যেদিকে তাকাতে নেই চোখ দুটো বারে বারে সেইখানে গিয়ে পড়ে। বাগবাজারে একটি বিশেষ গৃহের দোতলায় ফেলে আসা সন্ধ্যাটি নীতুর মনের কোণে বারংবার আনাগোনা করতে লাগল।

বৃষ্টিটা যখন চেপে এল সকলের চকিত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল সেইদিকে। নীতুরও কম চমক লাগেনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ভাবনা—ফিরবে কেমন করে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সুশান্ত ভীষণ খুশী, আরো কিছুক্ষণ আটকে রাখা যাবে বন্ধুকে। খুশীটা যে ছোঁয়াচে, বাকী দুজনের চোখেমুখেও তার সদ্য প্রমাণ পাওয়া গেল। নীতীশের বিশেষ করে চোখে পড়ল সেই চোখ দুটি যার মধ্যে প্রথম দিকে ছিল একটু লাজুক-লাজুক ভাব, তারপর কখন সেটা কেটে গেছে, যার চোখ সে নিজেও হয়তো টের পায় নি, এখন জ্বলজ্বল করছে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহভরা আনন্দ।

বৃষ্টি আসতেই নীতীশের গল্পে ছেদ পড়েছিল। বলতে যাচ্ছিল, কটা বাজে? উঠতে হবে। তার আগেই সুশান্ত বলে উঠল—এবার একটা রেসিটেশন।

একটু দূরে মায়ের গা ঘেঁষে বসেছিল ঝুনু। দাদার প্রস্তাব শুনেই লাফ দিয়ে উঠল—চয়নিকা নিয়ে আসবো?

এর পরে আর ওঠবার প্রস্তাব আসে কেমন করে?

সুশান্ত বোনকে থামিয়ে দিল—দূর, চয়নিকা লাগবে কিসে? সব ওর মুখস্থ।

নীতীশ তখনো ইতস্তত করছিল। তারপর মা-ও যখন ছেলেমেয়েকে সমর্থন করলেন, তখন সুশান্তর দিকে চেয়ে জানতে চাইল—কোন্‌টা?

—যেটা তোমার খুশি। আচ্ছা ঐটে হোক। সেই 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে!' তারপর কী যেন?

মা অনুচ্চকণ্ঠে ধরিয়ে দিলেন—ওরে আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে—

—চমৎকার! সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সুশান্ত, তোমারও তাহলে যাওয়া হচ্ছে না। কবি মানা করছেন। তার ওপরে আর কথা নেই।

সকলের মিলিত হাসি। তার মধ্য থেকে একটি চপল কিশোরী-কণ্ঠের মধুঝঙ্কার এতদূরে এই মেস-এর বিছানায় শুয়েও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল নীতীশ।

স্বপ্ন জিনিসটার পরমায়ু বড় স্বল্প। রাতটুকু ফুরোলেই তার শেষ। শুধু ক্ষণিকের নয়, সে বড় সুকুমার। দিনের আলোর তাপ সইতে পারে না।

নীতীশের আধ-ঘুম আধ-জাগরণে জড়ানো স্বপ্নটুকু ভোর না হতেই ফুরিয়ে গেল। সে দিন দেখা দিল অন্য দিনের তুলনায় তার রূপটি বেশী বাস্তব, বেশী রূঢ়। একরাশ পড়া পড়ে আছে। অন্যদিন রাতেই তার বেশির ভাগ সারা হয়ে যায়। আজ সবটাই পড়েছে সকালের ঘাড়ে। তৈরী করে ওঠা শক্ত। যদি কোনো মাস্টার মশাই কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন, লজ্জায় পড়তে হবে ' 'ভালো ছেলে' হবার গৌরব যেমনি আছে, বিপদও কম নয়।

তার চেয়ে বড় কথা, রাতের ঘটনাগুলো শুধু ঘটেই গেছে, আজ তার জের টানার পালা। সেটা যে প্রীতিকর হবে না, দাদার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি চোখ বুজে জেগে ছিলেন, সেটা সে টের পেয়েছে এবং তার কারণটাও অনুমান করে নিয়েছে।

যতীশ উঠবার আগেই সে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে পড়ার ঘরে অর্থাৎ সিঁড়ির পাশে সেই ফালি জায়গাটায় উঠে গিয়েছিল। পড়ায় মন দিতে পারছিল না। চোখ দুটো বারে বারে যাচ্ছিল সিঁড়ির গোড়ায়, দাদার পায়ের শব্দের আশঙ্কায়। দাদার মুখ থেকে রূঢ় কথা, কিংবা যাকে শাসন বলে—তাতে সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আজ তার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। অন্যায় সে কিছু করে নি, কিন্তু তাকে যেটা মানায় সেইটুকুর মধ্যেই মানিয়ে চলার যে অবশ্য কর্তব্য তার থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দাদার দুশ্চিন্তা যে সেইখানে, সে কথা সে সহজেই বুঝেছে।

তিনিও তা অস্পষ্ট রাখেন নি। আজ হয়তো আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন। তার প্রয়োজন ছিল না। নীতীশ সেটা মেনে নিয়ে তার জন্যেই নিজেকে তৈরী করে তুলছিল। সুশান্ত আর সে এক নয়, তাদের জীবনধারা একখাতে বইছে না। সুশান্তর ভবিষ্যৎ অনেকটা আপন থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে, নীতুকে সেটা গড়ে তুলতে হবে। ওর পথ মসৃণ সুন্দর সাবলীল, তার বন্ধুর কঠোর আয়াস-সঙ্কুল। কদিন আগে পড়েছিল 'এবার ফিরাও মোরে'। তার কটা লাইন হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

> জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
> সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
> প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
> সুখী করি সর্বজনে।

যতীশ উপরে উঠে এল। সাড়া পেয়েই বইয়ের পাতায় চোখ দুটোকে ফিরিয়ে এনেছিল নীতু। সব কিছুর জন্যে তৈরী থাকলেও বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

যতীশ খানিকটা উঠেই হাত বাড়িয়ে একখানা বই ওর হাতে দিয়ে বলল—স্কুল থেকে ফিরে খাবার-টাবার খেয়ে এই প্যাসেজটা করে রাখবি। আমি রাত্রে এসে দেখবো।

একটু থেমে বলল—বাকীগুলোও অমনি রোজ একটা করে করে ফেলতে হবে।

ট্রানস্লেশনের বই। বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্যে কতক-গুলো লেশন বা পাঠ দেওয়া আছে, তারই একটির মাথায় ঢ্যারা চিহ্ন।

আর কোনো কথা না বলেই তাড়াতাড়ি নেমে গেল যতীশ। নীতু অবাক হয়ে সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মনে করল এখন পুরো পড়াশুনোর সময় বলে হয়তো আসল ব্যাপারটা পাড়লেন না, পরে স্কুলে যাবার পথে বলে যাবেন। তখন তারও উঠে পড়বার সময়। কিন্তু যতীশ আর এল না।

যথাকালে বইখাতা নিয়ে যখন নীচে এসে দেখল, দাদা বেরিয়ে গেছেন, নীতুর চোখে এই ব্যাপারটা অন্য অর্থ নিয়ে দেখা দিল। এই ট্রানস্লেশনের টাস্কের মধ্যেই বোধহয় তাঁর বাকী বক্তব্যটুকু রয়ে গেছে। আলাদাভাবে সেটা ব্যক্ত করবার প্রয়োজন হল না। সন্ধ্যাটা বাঁধা পড়ে গেল। ছুটির পরের ফাঁকটুকু ভরাট করে দেওয়া হল। তার মধ্যে অন্য কিছু ঢোকাবার অবকাশ রইল না।

নিষেধ মাত্রই অপ্রিয়। তার মধ্যে একটা রূঢ়তা আছে। 'ওটা করো না', 'ওখানে যেও না'—এই কথাগুলোকে কেউ ভালো মনে নেয় না। কোনো রকম মনঃপীড়া না ঘটিয়ে সেই উদ্দেশ্যই সফল হতে পারে যদি ঐ করা এবং যাওয়ার সময়টাকে অন্য কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যায়।

অনেকদিন পরে নটখোলার যদু মাস্টারকে মনে পড়ল। অন্য সব মাস্টার মশাইদের সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্ক ছিল শুধু স্কুলের কয়েক ঘণ্টা। তার বাইরে আর কারো খবর তাঁরা রাখতেন না; যদুবাবু আলাদা মানুষ। স্কুলের পর ছেলেগুলো কোথায় যায়, কী করে, ছুটির দিনগুলো কেমন করে কাটায়—তা নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছিলেন, ঐ সময়গুলো তারা একেবারে বেওয়ারিশ এবং তার ফলে বয়সের ধর্মে এমন কিছু করে বা এমন পরিবেশে ঘুরে বেড়ায় যা কাঁচা মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। নিষেধ করে লাভ হবে না বরং উলটে ফল ফলতে পারে। তাই নিজের আস্তানায় ডেকে এনে ঝাঁকসুদ্ধ বন্দী করলেন। তার জন্যে তাঁকে নানারকম ফাঁদ পাততে হয়েছিল। মজার গল্প, ম্যাজিক, হাত দেখা, কদমা, বাতাসা, চিনির সাজ আরো কত কী! ছেলেরা ভুলে গেল, মাস্টার মশাইয়ের আসল মতলবটা ধরতে পারল না। পারলে কি আর আসত? নীতুও সেদিন বুঝতে পারে নি। আরো বড় হয়ে, নটখোলা যখন ছেড়ে চলে এসেছে, থার্ড মাস্টার যদুবাবুর এই রূপটি তার চোখে ধরা দিয়েছিল। পড়া দেওয়া আর পড়া নেওয়া—এইটুকুর মধ্যেই শিক্ষকের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না, কতকগুলো অপরিণত মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়—এই পরম সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। উপ-লব্ধি হয়তো অনেকেই করে। তিনি একে নিজের কর্মের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। সে দুরূহ কাজটি কজনে করে বা করতে পারে?

যদু মাস্টারের কথা ভাবতে গিয়ে নীতু হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। আজও তাঁকে ভুলতে পারে নি। কুৎসা ও দুর্নামের পশরা মাথায় নিয়ে যেমন করে তিনি

চলে গেলেন—তার জন্যে যে ক্ষোভ, যে অভিমান সেদিন তার শিশুমনকে পীড়িত করেছিল, তাও একেবারে মিলিয়ে যায় নি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকজনের কথা, যেটা মনে পড়লেই সমস্ত বুকখানা বেদনায় টনটন করে ওঠে। কে জানে সে কোথায় আছে, কেমন আছে ?

॥ ১৪ ॥

মেসের দরজা সব সময়েই খোলা। চৌকাঠ পার হয়ে নীতীশ রাস্তায় পড়তে যাবে, ঠিক সামনেই সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল একজন খাকীপরা লোক। সাইকেলের রং লাল। অজ্ঞাতসারে চমকে উঠল। বুঝল লোকটি টেলিগ্রাম বিলি করা পিওন। নিশ্চয়ই কারো কোনো বিপদের খবর বয়ে এনেছে। টেলিগ্রাম নামক বস্তুটির সঙ্গে নীতীশের পরিচয় সামান্য। যে কখানা দেখেছে, সবটার মধ্যেই অশুভ সংবাদ। ঐ সাইকেলের রংটা যেন তার সিগন্যাল বা সংকেত।

কার বিপদ এল যখন ভাবছে, পিয়ন তাকেই জিজ্ঞেস করল—তুমি এখানে থাক ?

—হ্যাঁ।

—যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য আছেন, জানো ?

উত্তর দিতে গিয়ে নীতুর গলা কেঁপে গেল। কোনো রকমে বলল—আমার দাদা। তিনি তো বেরিয়ে গেছেন।

—তোমার দাদা ? তাঁর টেলিগ্রাম আছে। তুমি নেবে ?

—দিন।

পিওন যখন ঘণ্টা বাজিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনো খামখানা খুলতে সাহস হচ্ছিল না। কি জানি কী আছে তার মধ্যে ! তারপর একরকম জোর করে একটা ধার ছিঁড়ে ফেলল।

একবার চোখ বুলিয়েই মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল, চারদিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আরেকবার পড়ল—যদি ভুল দেখে থাকে, ঐ কথাগুলো যদি কোনো রকমে মিথ্যে হয়ে যায় ! বৃথা আশা। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট, প্রতিটি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে—**Mother on death bed. Start at once—Harish.**

প্রচণ্ড আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা একটু যখন কাটিয়ে উঠেছে, নীতীশের খেয়াল হল, টেলিগ্রামখানা এখনি দাদার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে ? স্কুলের নামটা সে জানে, জায়গাটা খিদিরপুর। কোন্ রাস্তায়, কত নম্বর—সেসব কিছু জানা নেই। মোহিনীর কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে সে এখান থেকে চলে গেছে। গোলদীঘির ধারে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে যে মেসটাতে থাকে, সেটা ওর চেনা। কিন্তু এখন গিয়ে তো তাকে পাওয়া যাবে না। কোন্ অফিসে

যেন একটা চাকরি পেয়েছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে।

প্রথমটা হতাশ হয়ে পড়লেও, কিছুক্ষণ পরে নীতীশ নিজের মধ্যেই একটা জোর ফিরে পেল। আত্মপ্রত্যয়ের জোর। বিপদই মানুষকে সেটা এনে দেয়। এখন তো আর সে ছোট নয়, তার উপরে বেশ কিছুদিন আছে এই কলকাতায়। খিদিরপুর গিয়ে একটা স্কুল খুঁজে বের করতে পারবে না?

ভাগ্যিস জলখাবারের বরাদ্দ থেকে বাঁচানো কয়েকটি পয়সা হাতে ছিল! একদিকের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া হয়ে যাবে, যদি এস্‌প্লানেডে গিয়ে ট্রাম ধরা যায়। সে আর এমন কঠিন কি?

সেটা কঠিন না হলেও, স্কুলটা পাওয়া মোটেই সহজ হয় নি। অনেক ঘোরাঘুরি এবং খোঁজাখুঁজির পর দাদার হাতে যখন টেলিগ্রামটা পেঁছে দিল, নীতু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। যতীশ তাকে নিয়ে টিচার্স রুমে একটা খালি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল—কাঁদছিস কেন? ভয় পাবার কী আছে? আজই তো যাচ্ছি আমরা। বোস, আমি ছুটির ব্যবস্থা করে এখ্‌খুনি আসছি।

ভয় যে সে নিজেও কম পায় নি, ভাইয়ের চোখে লুকোবার জন্যেই বোধহয় তাড়াতাড়ি সরে গেল।

আগে আগে ফরিদপুর পর্যন্ত গাড়ি আসত। জিলা শহরের পাশেই ছিল স্টেশন। হঠাৎ পদ্মার রোখ পড়ল রেল লাইনের উপর। কোম্পানীর সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে মাঝখানের বেশ খানিকটা রাস্তা গ্রাস করে বসল। তারপর থেকে আগের স্টেশন গোবিন্দপুরে গাড়ি থামে, তার এদিকে আর আসে না। বর্ষাকালে বিশেষ অসুবিধা নেই। স্টেশনের নীচেই নৌকা-ঘাট। সারি সারি 'এক-মাল্লাই'* দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি এলেই মাঝিরা হাঁকডাক করে যাত্রী সংগ্রহ করে—কোথায় যাবেন কত্তা?

—যাবো তো শেখরডাঙ্গা।

—রায়বাড়ি?

—না, সরকারবাড়ি।

—ও, বুড়া কত্তার ছোট ছাওয়াল বুঝি আপনি?

তরুণ যাত্রীটি হেসে মাথা নাড়তেই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সরকারবাড়ির গিন্নীমার বড় দরাজ হাত। মোটা জলপানের ব্যবস্থা আছে মাঝিদের জন্যে—ডালা ভরা মুড়ি চিঁড়ে বাতাসা কলা নারকেলের সন্দেশ। তেমন করে ধরতে পারলে একটা বড় রকমের সিধাও* জুটে যেতে পারে।

যতীশদেরও অমনি একজন চেনা মাঝি জুটে গেল। গত পুজোয় যখন বাড়ি যায় এর নৌকাতেই গিয়েছিল। সকালবেলা নৌকো ছেড়ে প্রায় পুরো একটা দিন লাগে ভাজনকাদি পেঁছতে। এখন ভরা বর্ষা, চারদিকে জল থৈ থৈ। নদীনালা

* একজন মাঝি-ওয়ালা ছোট নৌকা।

* চাল ডাল তেল নুন কাঁচা তরকারি ইত্যাদি।

খালবিলের সঙ্গে মাঠঘাট ক্ষেতখামার সব একাকার হয়ে গেছে। অনেকখানি পথ কোণাকুণি মেরে দিলে মাঝি। বাড়ির ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ল বেশ খানিকটা বেলা আছে।

নদী নয়, পুকুরও নয়, দু-বাড়ির মাঝখানে খানিকটা নীচু জমি। শুকনোর দিনে ডাঙ্গা পথ, বর্ষায় খাল হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাঁচ-ছ হাত গভীর জল, তার উপরে তীব্র স্রোত। তারই ধার ঘেঁষে পর পর কয়েকটি খেজুর গাছের খণ্ড সাজিয়ে তৈরী হয়েছে ঘাট। স্নান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা, হরিশের মধ্যাহ্ন 'সন্ধ্যা' এবং মনোরমার আহ্নিক সব ব্যবস্থা ঐখানে। ওরই পাশে এসে নৌকো লাগে।

ঘাট দেখা দেবার আগেই নীতু ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার উপরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখছিল। আর একটু কাছে আসতে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে সন্দেহ হল, বোধহয় ভুল দেখছে। পরক্ষণেই বিস্মিত কণ্ঠ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল—মা!

যতীশ ছিল ছইয়ের মধ্যে। দীর্ঘ নৌকোযাত্রায় তার মাথা ঘোরে। পাটাতনের উপর চোখ বুজে শুয়েছিল। কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে বসল। খেজুরের পইটাগুলো তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেল। এ কী করে সম্ভব!

মনোরমা ঘাটে বসে মুখ ধুচ্ছিলেন। অচেনা নৌকো দেখে মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে ডান ভ্রূর উপরে হাত রেখে ঠাহর করবার চেষ্টা করলেন, কে দাঁড়িয়ে! তারপর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেটা যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ, ছেলেদের কারো ধরতে অসুবিধা হল না।

তারাও আশ্বস্ত হল, চিন্তামুক্ত হল, এবং যে টেলিগ্রামটা এই দুদিন ধরে দু ভাইকে আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় চঞ্চল করে তুলেছিল, এবার ভীষণভাবে কৌতূহলী করে তুলল। সে চাঞ্চল্যও কম নয়।

নৌকো থেকে নামতেই হরিশের ছেলেমেয়েরা একটু জড়সড় হয়ে মেজকাকার পায়ের কাছে ঢিপ ঢিপ করে প্রণামগুলো সেরে নিয়ে ছোটকাকাকে নিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক নিকটতর, এবং সেখানে কোনো আড়ষ্টতা নেই।

মনোরমা এগিয়ে গেলেন ছেলেদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। সেই কোন্ ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে নৌকোয় উঠেছে ছেলে দুটো, সারাদিন পেটে প্রায় কিছুই পড়ে নি। ভাত হতে দেরি হবে, ততক্ষণ যাহোক দুটো মুখে দেওয়া। কী দেবেন ছেলেদের সামনে ভাবতে গিয়ে মনটা খুশী হয়ে উঠল। কদিন আগে এককাঁদি কলা কাটা হয়েছে পুকুরপাড় থেকে। ভাল জাতের 'সবরি'*, চারাটা তাঁর নিজের হাতে পোঁতা। বড় একটা কাঁদি বেরোতে দেখে ভারি খুশী হয়েছিলেন। ক্রমে যখন বাড়তে লাগল, মনটা খারাপ হয়ে গেল। পুজো পর্যন্ত

* মর্তমান

থাকবে না, য'তে নীতু খেতে পাবে না। নারায়ণ নিশ্চয়ই তাঁর মনের কথাটা জানতে পেরেছিলেন। তা না হলে এ সময়ে ওদের আসবার কথা নয়।

আজই সকালে দেখেছেন মনোরমা, উপরের দুটো ছড়া তৈরী হয়ে গেছে। ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্যে গোটাকয়েক ফল সরিয়ে রেখে এখনি ওদের পাতে দিতে পারবেন! ঘরের দুধ আছে, এই কদিন আগে চিঁড়ে কুটেছে বৌমা, টাটকা ভাজা খৈ আছে। যেটা ওদের পছন্দ।

হরিশ বাড়ি ছিল না, ফুলিও ঘাটের সামনেটায় আসে নি, একটু তফাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। যতীশ লক্ষ্য করেছে তার চোখে কোনো বিস্ময়ের চিহ্ন নেই, ওদের এই হঠাৎ এসে পড়াটা তার কাছে যেন অভাবিত নয়। আর একটু কাছে আসতে দেখল, তার ঠোঁট দুটো চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। হাসিটা কেমন যেন রহস্যময়। চট করে মনে হল ঐ হাসির সঙ্গে বোধহয় টেলিগ্রামটার যোগ আছে।

—ব্যাপার কি বল তো বৌদি? আরো খানিকটা সরে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল যতীশ।

যখন ছোট ছিল দুজনে দুজনের নাম ধরে ডাকত। দেওর-ভাজের সম্পর্কটা তখন গৌণ, সখ্যের বন্ধনটাই ছিল প্রধান। বড় হবার পর সে বন্ধন ছিন্ন না হলেও অন্তরালে চলে গেছে, প্রকাশ্যে ওরা বৌদি ও ঠাকুরপো।

ফুলি অজ্ঞতার ভান করল না। অর্থপূর্ণভাবে মাথা নেড়ে বলল—দাঁড়াও না, এই তো সবে নৌকো থেকে নামলে। খেয়ে-দেয়ে ঠাণ্ডা হও। তোমার দাদা আসুক। তার কাছ থেকেই শুনতে পাবে।···জামাকাপড় ছাড়; আমি যাই, ভাত বসিয়ে দিই গে।

বলে, ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

পরামর্শটা দিয়েছিলেন বিশ্বাস মশায়। শশী বিশ্বাসের কাকা কেদার বিশ্বাস। অনেককাল দেশছাড়া। গ্রামের বেশির ভাগ লোক তাকে চোখেও দেখে নি, কিন্তু অনেক কিছু শুনেছে তার সম্বন্ধে। যত দিন গেছে সে-সব কাহিনী আপন মনে বেড়ে বেড়ে বাস্তবের বেড়া পেরিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় একটা কিংবদন্তীর কোঠায় নিয়ে ফেলেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন তিনি সশরীরে এসে উপস্থিত। তখন আবার আরেক দফা গুজবের পালা। কোথায় ছিলেন এতদিন? কী করছিলেন? কেন এলেন এতকাল পরে? বরাবরের জন্যে এলেন, না আবার চলে যাবেন রহস্যের অন্তরালে?

তার নিজের মুখ থেকে যেটুকু জানা গেল, দীর্ঘ তিরিশ বছর পুলিস-আফিসে চাকরি করেছেন কেদার বিশ্বাস, এক জিলা শহর থেকে আরেক জিলা শহরে বদলি হয়েছেন, বিয়ে-থা করেন নি, করবার ফুরসৎ হয় নি, কাজের মধ্যেই ডুবে ছিলেন এতকাল, আফিসেই ছিল তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা। সম্প্রতি পেনশন নেবার পর যখন দেখলেন চারদিকটা একেবারে ফাঁকা, হঠাৎ দেশের কথা মনে পড়ল, দেখতে ইচ্ছা হল কেমন আছে শশী। এতটুকু দেখে গিয়েছিলেন তাকে,

আপন জন বলতে ওই তো এখন সব। ফিরে এলেন।

শশী বিশ্বাস দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কাকাকে ফিরে আসতে দেখে বিশেষ পুলকিত হন নি। বাড়ি, জমিজমা, ঘরদোর পুরোটাই জুড়ে বসে ছিলেন। এবার তো অর্ধেক ছাড়তে হবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল করা চলবে না! পুলিসের লোক! কিন্তু দুদিনেই বোঝা গেল, এ অন্য ধরনের পুলিস। স্বল্পে তুষ্ট। বলতে গেলে কিছুই চায় না। তার চেয়েও বড় কথা—হাতে কিছু আছে। সে সংখ্যাটা অবশ্য জানা যাচ্ছে না, তবু যেটুকু এল তাই বা মন্দ কী? যতদিন আছেন মাস মাস পেনশনটাও রইল এবং সেটা ভাইপোর হাতেই তুলে দিচ্ছেন। ভাইপো প্রথমটা একটু আপত্তি করেছিল, যেমন করতে হয়। কাকা বললেন—আমি এ দিয়ে কী করবো? তুই রাখ। আমাকে দুবেলা দুটো খেতে দিস; ব্যাস।

ভাজনকান্দি এবং তার আশপাশের লোকেরা পুলিস বলতে বোঝে বড় দারোগা, ছোট দারোগা, বক্সী, জমাদার, সিপাই। তাদের চেহারা এবং দাপট দুটোই হাড়ে হাড়ে চেনে। কেদার বিশ্বাস কি রকম পুলিস ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তিনিই বুঝিয়ে দিলেন—ওদের চালাবার জন্যে সেরেস্তা আছে, আফিস আছে জিলায় জিলায়। আমি ছিলাম সেই আসল জায়গায়—হেড অফিসের হেড ক্লার্ক। পুলিস সাহেবের নাম শুনেছ তো? এই সব দারোগা-টারোগাদের চাকরি দেওয়া-নেওয়ার মালিক। সেই এস. পি. ছিল এই মুঠোর মধ্যে। যা কিছু অর্ডার সার্কুলার সব বেরোত এই হাত দিয়ে। কথায় কথায় 'সেণ্ড ফর বিসোয়াস্', বিশ্বাস ছাড়া এক পা-ও নড়বে না।

কথার ফাঁকে ফাঁকে এমনি দু-একটা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দিতেন বিশ্বাস মশায়। গ্রামের লোকের শ্রদ্ধা বাড়ল। বুঝল লোকটা 'বিদ্বান'। যতীশ ঠাকুরের মত অতগুলো পাস না দিলেও লেখাপড়া কম শেখে নি। তাছাড়া পুরনো আমলের লোক, পাকা মাথা। বিপদে আপদে বুদ্ধি পরামর্শ নিতে আসতে লাগল বিশ্বাস মশায়ের কাছে। সেদিক দিয়ে উপকারও পেল কেউ কেউ। আগে ঠেকায় পড়লেই ছুটতে হত পাশের গাঁয়ে, গিরীশ কবিরাজ কিংবা দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানায়। বিশেষ পাত্তা পেত না। এখন আর তার দরকার নেই।

হরিশ মাঝে মাঝে গিয়ে বসত কেদার বিশ্বাসের বারান্দায়। কথায় কথায় সংসারের সব খবর তিনি কদিনের মধ্যেই সংগ্রহ করে ফেললেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—মেজো ভাই টাকা পয়সা দেয়?

হরিশ বলল—তা দেয়, কিন্তু এমন সুরে বলল যে বিশ্বাস মশায়ের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধরতে অসুবিধা হল না, ঐ নিয়ে কিঞ্চিৎ মর্মপীড়ার কারণ ঘটেছে। আর দু-একটি প্রশ্নের পরেই সেটা স্পষ্ট হল। অঙ্কের দিক দিয়ে আশানুরূপ না হলেও ইংরেজি মাসের গোড়ার দিকে একটা করে মনি-অর্ডার এতদিন ঠিকমত আসছিল, গত তিন মাস যাবৎ বন্ধ আছে। বিশ্বাস মশায় ব্যাপারটাকে হালকা করবার চেষ্টা করলেন, হয়তো কোনো অসুবিধার জন্যে পাঠাতে পারে নি। কলকাতা শহরে মেস-এ হস্টেলে থাকা মানে এক বাণ্ডিল টাকা। তার ওপরে

ছোট ভাইটির পড়ার খরচ আছে।

—তার আর খরচ কী? ইস্কুলের মাইনে লাগে না, শুধু মেস-এ যা দিতে হয়।

—কী রকম মাইনে পায় যতীশ?

হরিশ এই অঙ্কটিকে, যা শুনেছিল তার চেয়ে বেশ কিছু বাড়িয়ে বলল, এবং তার উপরে যোগ করল দুটো ছাত্র পড়াবার বাড়তি আয়। সেটাও কিঞ্চিৎ ফাঁপিয়ে দিল। মাস তিনেক আগে দুটি ছাত্রই যে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এবং তাদের জায়গায় নতুন কেউ জোটে নি এ খবর যতীশ জানিয়ে দিয়েছে। হরিশ সেটা অবিশ্বাস না করলেও টাকা বন্ধ করবার যথেষ্ট হেতু বলে গ্রহণ করে নি। বিশ্বাস মশায়ের কাছে ছাত্র সংক্রান্ত ব্যাপারটা চাপা রইল। তাহলেও তিনি একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন করে বসলেন—তোমার সংসার তো জমিজমার আয়েই বেশ ভালোভাবে চলে যায়। ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা নেবার দরকার কী?

একদল লোক আছে যারা স্বাচ্ছন্দ্য এবং সচ্ছলতার মধ্যে স্বস্তি পায় না। ভিতরে ভিতরে কামনা করে কোথাও একটা কিছু আটকে যাক, অন্তত লোকে দেখুক এবং বলুক যে সব কিছু ঠিক নেই। অপরের কাছে একরাশ অভাব অভিযোগ তুলে ধরে—তার মধ্যে কতকগুলো হয়তো কল্পিত—তারা এক ধরনের তৃপ্তি পায়। সায় পেলে খুশী হয়। কেউ যদি বলে, বেশ তো আছ বাপু, অসুবিধেটা কোথায়, স্বভাবতই তার উপরে প্রসন্ন হতে পারে না।

হরিশ ভটচায্ সেই দলের মানুষ। বিশ্বাস মশায়কে সে সমীহ করে, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতাকে খাতির করে, কিন্তু তাঁর ঐ প্রশ্নটা ভালো লাগল না। তাছাড়া এ ব্যাপারে আর একটা জিনিস কেন যে তিনি উপেক্ষা করে গেলেন, তাও সে বুঝে উঠতে পারল না। এখানে টাকার প্রয়োজনটাই তো একমাত্র বিবেচ্য নয়। একান্নবর্তী পরিবারে একজন যদি বিদেশে চাকরি করতে যায়, তার আয়ের উপর অন্য সকলের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে সাব্যস্ত হয়ে গেল। এটা তার দেয়, দরকার থাক বা না-ই থাক। না যদি দেয় ধরে নিতে হবে সংসারের প্রতি তার যে দায়িত্ব তা সে পালন করছে না।

হরিশ আপাতত সেদিক দিয়ে গেল না। সবিনয়ে বলল—আজ্ঞে টাকার দরকার আছে বৈকি? সংসার বাড়ছে, জমি তো আর বাড়ছে না। ফলনও তেমন নেই।

—কিন্তু ফসলের দাম বাড়ছে। চাষীর হাতে দুটো পয়সার আমদানি হচ্ছে। আগের চেয়ে সে অনেক বেশী সচ্ছল।

হরিশ বুঝল, এ তর্কে সে কেদার বিশ্বাসের সঙ্গে পেরে উঠবে না। মনে মনে খুশী না হলেও বাইরে সায় দিয়ে উত্তরটাকে সুর মিলিয়ে ঐ একই পথে ঘুরিয়ে দিল—সে কথা ঠিক। সেইজন্যেই তো ও'তেকে বলি দু-চার টাকা যা বাঁচাতে পারিস, পাঠিয়ে দে। সুযোগ সুবিধে মত কিছু কিছু জমি রাখা যাবে। তোদের জন্যেই দরকার। মার নামে যা আছে সে আর কতটুকু?

কথাটা মিথ্যা নয়। যতীশকে এ আশ্বাস সে অনেকবার দিয়েছে, কিন্তু তার

পাঠানো টাকার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আজ পর্যন্ত জমিতে রূপান্তরিত হয় নি। সবটাই গেছে সংসারের পিছনে। মা-ভাইয়ের কাছ থেকে সেকথা সে লুকিয়ে রাখে নি—খরচ কত, দেখছ না ?

বিশ্বাস মশায় তার ভাইপোর কাছ থেকে ভটচায্‌দের পুরো ইতিহাস আগেই জেনে নিয়েছেন। বলতে গেলে শশীই তো এদের এনে বসিয়েছেন এখানে। বাড়িঘর জমিজমা সবই যে হরিশের স্ত্রীর, শ্যামাচরণ ইচ্ছা করলে কিছু কিছু অন্তত নিজের অধিকারে আনতে পারতেন, কিন্তু আনেন নি, এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি—ইত্যাদি বৃত্তান্ত শশী কাকার কাছে সবিস্তারে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষভাবে এবং অকপট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন গৃহিণীর কথা। ছেলে দুটি যেভাবে লেখাপড়া শিখে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, প্রশংসার সঙ্গে তারও উল্লেখ করেছেন। সব কথা শুনে এই পরিবারটির প্রতি ভিতরে ভিতরে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন কেদার বিশ্বাস। বিশেষ করে যে ছেলে দুটিকে তিনি এখনো দেখেন নি তাদের কথাই বেশী ভেবেছেন। তারা এ গাঁয়ের গৌরব, অথচ বলতে গেলে এখানে তাদের কিছুই নেই। যে বাড়িঘরের উপর তাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই, তার দিকে কোনো টান থাকাও স্বাভাবিক নয়। হরিশের নিজের উক্তি থেকে যখন শুনলেন সে এ সম্পর্কে সজাগ, ভাইদের জন্যে কিছু কিছু জমিজমা করবার চেষ্টা করছে, তাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মনে মনে খুশী হলেন। সেই সঙ্গে অনুভব করলেন এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করা গ্রামবাসী হিসাবে তাঁর কর্তব্য। হয়তো সেই সূত্র ধরেই বললেন—মেজো ভাইয়ের বিয়ে দিচ্ছ না কেন ?

—চেষ্টা কি আর কম করছি ? পাত্রীও একরকম ঠিক! কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

—মেয়ে পছন্দ নয় বুঝি ?

—তা বলছে কই ? এখন নয়, পরে হবে।

—মেয়েটি কেমন ?

—গেরস্ত ঘরে যেমন হয়ে থাকে। আপনা-আপনির মধ্যে। আমার শালী, পিসশ্বশুরের মেয়ে। সেই কবে থেকে আশা করে বসে আছে তারা। অন্য কোথাও চেষ্টা করে নি, মেয়ে এদিকে তালগাছ, আর রাখা যায় না। রোজ খবর পাঠাচ্ছেন শাশুড়ী। সবই লিখেছি। বাবুর কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

—তোমার মাকে দিয়ে লিখিয়েছ ?

এবারে একটি নির্জলা মিথ্যা বলতে হল।

মাকে এ ব্যাপারে ভেড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে হরিশচন্দ্র। মনোরমা একটা কথাই বলে এসেছেন বরাবর—ওর যখন ইচ্ছা নয়, পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। ফুলিই এ সম্বন্ধ প্রথম উত্থাপন করেছিল ; আগ্রহ তারই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু দেওরের তেমন মন নেই দেখে আর অগ্রসর হয় নি, পিসীমাকে বরং অন্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দিয়েছিল।

কিন্তু স্ত্রীর ছেড়ে দেওয়া সুতোটা ঐখান থেকে স্বামীর হাতে গিয়ে উঠল।

তার কারণ ছিল। ওপাড়ার ফাজেল মোল্লার পাল্লায় পড়ে পাটের কারবারে নেমেছিল হরিশ্চন্দ্র। লাভের ব্যবসা। বাড়ি বাড়ি থেকে পাট কিনে প্রথমে ঘরে নিয়ে তোলা। সেখানে কিছু গোপন প্রক্রিয়া আছে সে-সব সেরে নৌকো বোঝাই করে বড় বড় হাটে গিয়ে সাহেব কোম্পানীর এজেন্টদের কাছে বেচে দেওয়া। ব্যবসাটা ও-অঞ্চলে সাধারণত মুসলমানরাই চালায়। তাদের স্থানীয় নাম ফড়ে। হরিশ হঠাৎ জুটে গেল তার মধ্যে। লাভের অঙ্কটা ভালোই, এবং তাকে কিছুটা ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তার লোলুপ দৃষ্টির সামনে ধরেছিল ফাজেল মোল্লা।

কলকাতার মনি-অর্ডারগুলো জড়ো হয়ে ততদিনে একটি মোটামুটি পুষ্ট আকার নিয়েছে। সেই বাণ্ডিলটাকে আরো পুষ্ট করে ঘরে আনবার আশায় ফড়ের হাতে তুলে দিল হরিশ। কিন্তু ঘরে আর সেটা ফিরে এল না। হিসাব যখন হল, দেখা গেল আরও কিছু ঢালতে হবে তার পিছনে। সেই 'আরোটা' আসবে কোথা থেকে, এই দুর্ভাবনায় যখন ঘুম হচ্ছে না এবং ওদিকে ফাজেল মোল্লার কোমল সুর ক্রমশ বাজখাই পর্দায় উঠছে, তখন হঠাৎ মনে পড়ল পিস-শাশুড়ীর কথা। ফুলি বিশেষ ভরসা না দিলেও তখনো তিনি যতীশের আশা ত্যাগ করেন নি। হাতে কিছু পুঁজি ছিল। জামাতার কাছে গোপনে তার আভাসও দিয়েছিলেন। হরিশ ভিতরে ভিতরে প্রলুব্ধ হলেও হাত বাড়াতে সাহস করে নি। ভাইকে তার রীতিমত ভয়? এবারে আর সে-সব ভাবলে চলে না। টোপ গিলে ফেলল। ফাজেল ঠাণ্ডা হল, কিন্তু এদিকটা সামলাবার মত কোনো পথই চোখে পড়ছিল না।

বিশ্বাস মশায়ের কথায় কিঞ্চিৎ ভরসা হল, তাঁর মত একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোনো সুরাহা করে দিতে পারেন। মার তরফ থেকে বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হয় নি, এ কথা বললে তিনি কিছু একটা সন্দেহ করে বসতে পারেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল—মা তো লিখে লিখে হয়রান। এখন বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

বিশ্বাস মশায়ের চোখের কোণ-দুটিতে একটু কৌতুক হাসি ফুটে উঠল। বললেন—কাছাকাছি বিয়ের দিন আছে?

—তা আছে বৈকি। এটা তো বিয়ের মাস।

—ওঁরা তৈরী আছেন? মানে, তোমার পিসশ্বশুর?

—শ্বশুর নেই। শাশুড়ী আর তাঁর ছেলেরা সব যোগাড়-যন্তর করে রেখেছেন। তিনদিনের মধ্যে বন্দোবস্ত করে ফেলবেন।

—তোমাদের তো কিছু আয়োজন আছে। তাড়াতাড়ি পেরে উঠবে?

—কেন পারবো না? আমরা তো আর কোনো ঘটা করতে যাচ্ছি না।

—তাহলে এক কাজ কর। একটা টেলিগ্রাম করে দাও।

টেলিগ্রাম? ভয়ে ভয়ে বলল হরিশ। টেলিগ্রামের সঙ্গে এদের মনে সর্বদাই একটা অমঙ্গল জড়িয়ে থাকে।

—হ্যাঁ; যা লিখবার আমিই লিখে দেবো। তুমি শুধু একটা ফরম্‌ নিয়ে এসো।

টেলিগ্রামের বয়ানটা বিশ্বাস মশায়ের। প্রথম খসড়ায় ছিল Mother seriously ill. পড়তে গিয়ে কেমন যেন মিনমিনে মনে হল। আরেকটু জোরদার করা দরকার, সাহেবরা বলত ফোর্সফুল। বার্টার সাহেবের কাছে কোনো চিঠি বা সার্কুলারের ড্রাফট নিয়ে গেলে প্রায়ই বলত, হোয়াই সো টেম্‌? মেক ইট মোর ফোর্সফুল। ইট্‌স্‌ গোয়িং ব্রম্‌ দ' এস্‌. পি.।

তাই করলেন বিশ্বাস মশায়। Seriously ill কেটে দিয়ে বসালেন on death bed ; কথাটা শুধু জোরালো নয়, অনেকখানি গাম্ভীর্যপূর্ণ। একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। 'সিরিয়াসলি ইল্‌' তো সবাই লেখে, বাঁধা গৎ। তাঁর হাত দিয়ে অন্য কিছু বেরোনো দরকার। সারজীবন কলম পিষে এলেন পুলিশ-আফিসের উপর তলায়। তার একটা ছাপ থাকবে না?

গিরীশ কবিরাজের বৈঠকখানায় বেড়াঘেরা যে ডাকঘর সেখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো যায় না। তার জন্যে যেতে হল বড় পোস্টাফিসে, প্রায় এক দুপুরেব পথ। ফিরে এসে রসিদটা বিশ্বাস মশায়ের হাতে দিতেই তিনি বললেন, ব্যস, এবার লাগিয়ে দাও।

—আসবে তো ঠিক ?···তখনো ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না হরিশ্চন্দ্র।

—আসবে না মানে? কেদার বিশ্বাসের ড্রাফট, পাওয়া মাত্তর পাগলের মত ছুটবে।

বাড়ি আসতে আসতে খেয়াল হল, টেলিগ্রামটা গোপন করা গেলেও যে উদ্দেশে পাঠানো, সেটা তো আর গোপন রাখা যায় না। বিয়ের একটা আয়োজন আছে। সকলের আগে পিসশাশুড়ীকে খবর পাঠাতে হবে। মাকেও বলা দরকার। তিনি নিশ্চয়ই ভালোভাবে নেবেন না। তাছাড়া এসে যদি বেঁকে বসে যতীশ? যদি রেগে যায়, মিথ্যা কথা বলে অত দূর থেকে ডেকে আনা হয়েছে বলে? আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেদের মেজাজ বোঝা ভার! তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভালো। আসুক তো, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত কাউকে কিছু বলে কাজ নেই।

সে সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বজায় রইল না। একজনকে বলতে হল। ফুলি। সে-ই একরকম বের করে নিল কথাটা। স্ত্রীজাতিকে যেসব বিশেষ বিশেষ কলা-কৌশল দান করেছেন বিধাতা, তার সাহায্যেই নিল। শুনে প্রথমটা গম্ভীর হয়ে গেল ফুলি।

—এটা ভালো কর নি। ওর যদি ইচ্ছে না থাকে—

—ইচ্ছে নেই কে বললে ? 'না' তো কখনো বলে নি।

—হ্যাঁ-ও তো বলে নি।

—তা একরকম বলেছে বৈকি। এবার তুই একটু চাপ দিলেই—

—আবার চাষাদের মত তুই-তোকারি ?

ফুলি আর সে ফুলি নেই। তার একটি দেওর অত বড় 'বিদ্বান', আরেকটিও কম যায় না! সে বিষয়ে সে অত্যন্ত সজাগ। কথায়-বার্তায় আচারে-ব্যবহারে তাদের আর 'চাষাড়ে' হওয়া চলে না। এদিকে হরিশের পক্ষেও এতদিনের

অভ্যাস ত্যাগ করা মুশকিল। কেমন করে ভোলে, এই ফুলি আজ যেখানেই উঠুক, তার স্কন্ধে এসে যখন চেপেছিল, তার বয়স ছিল আড়াই বছর। সে মূর্তিটা এখনো চোখের উপর ভাসছে।

সে যাই হোক, এখন অন্তত নরম হওয়া তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। ধমক খেয়ে যেন বড় লজ্জায় পড়েছে এমনভাবে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলবো না।

একটু থেমে চোখ টিপে যোগ করল—আসল কাজ হাসিল করা চাই কিন্তু।

সে ভার আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল ফুলি। মাকে তার মনে পড়ে না। চোখ ফুটবার সঙ্গেই দেখেছে এই পিসীকে। নিজের ঘর-সংসার ফেলে ছুটে এসেছিলেন এবং মা-বাপ-মরা ভাইঝির একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন তাকে।

পিসীর কাছে তার অশেষ ঋণ। তাঁর সন্তানদের মধ্যে এই মেয়েটাই আবার তার সব চেয়ে প্রিয়। এদিকে যতীশ শুধু তার দেওর নয়, আবাল্যের সাথী ও সখা। এদের দুটি হাত এক করে দেবে, এ আকাঙ্ক্ষা তার অনেক দিনের, তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

প্রথম ধাক্কাটা 'দাদাই' সামলাবেন, অর্থাৎ টেলিগ্রামের রহস্য হরিশই প্রকাশ করবে ভাইয়ের কাছে, গোড়াতে এইরকম কথা ছিল। ফুলিও যতীশকে সেই আভাস দিয়েছিল, তোমার দাদা আসুক। কিন্তু সময় বুঝে তখনই কোথায় একটি কি জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায়, হরিশচন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল না। দেওরকে আলাদা ডেকে নিয়ে ফুলিকেই ভাঙতে হল কথাটা। যতীশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বিয়ে একটা ছেলেখেলা নয়। তার জন্যে সে প্রস্তুতও ছিল না। বরং এই পর্বটাকে যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়, সেই চেষ্টাই করছিল। বর্তমানে তাদের যে অবস্থা, এটা তার পক্ষে শুধু অনাবশ্যক বিলাস নয়, চরম নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু এদের সেকথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। যদি বলতে যায়, বিয়ে করবার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই আমার, সবাই উড়িয়ে দেবে। বৌ কি একটা হাতি যে তাকে পুষতে তালুক বিকিয়ে যাবে? এতগুলো লোক যেখানে খাচ্ছে, পরছে, সেখানে একজন বাড়তি মানুষের আর কী খরচ! বরং তাদের সংসারে বর্তমানে একটি বাড়তি মেয়েমানুষের বিশেষ প্রয়োজন। মা বুড়ো হয়েছেন, আগের মত খাটতে পারেন না, বড় বৌ একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। প্রায় ফি-বছরই তাঁকে আঁতুড়ঘরে ঢুকতে হয়। শুধু রান্নাবান্নাই তো নয়, ধান পাট কলাই সরষে, একটা কিছু খন্দ লেগেই আছে বারো মাস, সে-সব তোলাপাড়া, সামাল দেওয়া। কে করে এত?

অর্থাৎ মনে মনে স্বীকার করল যতীশ, হাতি নয়, বৌকে বরং হালের বলদ বলা চলে। খাবে যা কাজ দেবে তার অনেক বেশী।

ক্ষোভটা প্রথমে গিয়ে পড়ল দাদার উপর। তার সঙ্গে কিছুটা করুণা। এত অল্পবুদ্ধি এই পাড়াগাঁয়ের লোকগুলোর! তারপরেই মনে হল, অল্পবুদ্ধি হলেও এদের স্বার্থবুদ্ধি অতি প্রবল। তার এই দাদাটিও সেখানে কারো চেয়ে কম

যায় না। তার উপরে একদল ঈর্ষাপরায়ণ শুভানুধ্যায়ী অনবরত পরামর্শ দিচ্ছে —বিয়ে না দিলে এই বয়সের ছেলের কখনো সংসারে মন বসে? কারো কারো মতে কলকাতার শহর অতি ভয়ঙ্কর জায়গা। ডাইনীরা সব ওঁত পেতে বসে আছে। কখনো কোন্‌টা ঘাড়ে চেপে বসবে জানতেও পারবে না। ঐখানেই সংসার পেতে বসবে। মা ভাই ভাজ ভাইপো ভাইঝি—কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না। অতএব বেঁধে ফেল। যা হোক একটা জোয়াল চাপিয়ে দাও কাঁধের উপর।

এদের এসব যুক্তি যতীশের মুখস্থ। তার পিছনে দাদার পূর্ণ সমর্থন আছে, তাও সে জানে। কিন্তু এবার সামনে যে বসে আছে, তার দিকে চোখ ফেরাল। নেহাৎ সাদামাটা একখানা হাসি-হাসি কালো মুখ, মূঢ়, সরল দুটি ভাসা-ভাসা চোখ। তার নীচে গভীর বলিরেখা, অমানুষিক পরিশ্রমের ক্ষতচিহ্ন। বড় মায়া হল। অভিমানও হল। ফুলিও তাকে বুঝল না! তার মনের খবরটা একবার জানতে চাইল না!

—কী ভাবছ এত? চপল সুরে জিজ্ঞাসা করল ফুলি।

যতীশের সুর গভীর—একটা বিয়ে করলেই তুমি খুশী হবে?

—হবে না? কী যে বল তুমি?

—বেশ!

এবার বোধ হয় একটু সন্দেহ হল ফুলির। এই 'বেশ'টা হয়তো 'বেশ' নয়। বলল—ক্ষেন্তিকে তোমার পছন্দ নয় ঠাকুরপো?

—পছন্দ বৈকি! তোমার যখন ইচ্ছে—।

॥ ১৫ ॥

প্রথম যেদিন হেয়ার স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে সদ্য গ্রাম থেকে আসা ভীরু, মুখচোরা, অতিমাত্রায় শান্ত, নিতান্ত সাধারণ ঘরের একটি চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে সেনেট হল ছাড়িয়ে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে চলেছিল, ছোট মাঠটা পেরিয়েই সাদা রং-এর তিনতলা বাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে মোহিনীদা বলেছিলেন, এ গেট্‌টা চিনে রেখে দাও নীতু। আর তো মোটে দুটো বচ্ছর!

'মোহিনীদা' এরই মধ্যে তাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর কথায় যে ইঙ্গিত ছিল সেটা হয়তো নিছক শুভেচ্ছা। তবু তার ভিতরকার সম্ভাবনাটুকু ছেলেটির মনে একটি আশার গুঞ্জন তুলেছিল সেদিন। সেই সঙ্গে আশঙ্কাও কম নয়। দুটি বছরের দূরত্বও তার কাছে তখন অলঙ্ঘনীয়। তার কল্পনা অতদূর উঠতে পারে নি।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে ওপাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ফটকটা তাকে আহ্বান জানিয়েছে। সেটাও যেন বড় অবাস্তব মনে হচ্ছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার যে ভরসা দিলেন, তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা না থাকলেও বিশ্বাস করতে বাধছিল। ওখানে গিয়ে সত্যিই উঠতে পারবে কিনা সে সংশয় তখনো মন জুড়ে

আছে।

'মোহিনীদা'র দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রশস্ত ফটকের ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে একবার শুধু তাকিয়ে দেখেছিল নীতীশ। একসার দীর্ঘদেহ দেবদারু। তার পাশ দিয়ে একটা পথ ওদিকে কোথায় যেন চলে গেছে। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল বিশাল বাড়িটার পানে। বুকখানা কেমন দুরদুর করছিল। কিসের একটা ভয়! অনেক উঁচু পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় এই ভয় জাগে পথিকের মনে।

তারপর হেয়ার স্কুলে যখন সে পুরনো হয়ে গেছে তখনো সেই ভয় তার কাটেনি। মোহিনীদার মুখেই শুনেছিল, বহু প্রতিভার জন্মভূমি এই প্রেসিডেন্সি কলেজ। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসদন এবং উনবিংশ শতাব্দীর আরো কত চিন্তানায়ক। বাংলাদেশ সেদিন স্বর্ণপ্রসূ। তারই মনীষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সারা ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। স্বদেশপ্রেমে রাজশক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামেও সে অগ্রণী। যার জন্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সেই ঐতিহাসিক উক্তি—**What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.**

সেই মনীষার একটা বৃহৎ অংশ লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল এইখানে, এই রেলিংঘেরা বাড়িটা, তার প্রশস্ত করিডোর, বিস্তৃত লেকচার হল, ছোট ছোট সেমিনার, সমস্ত পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে বিশাল লাইব্রেরী, তাকে ছাড়িয়ে ওদিকের ঐ টেনিস লন, তার কোলে বিরাটকায় বেকার ল্যাবরেটারী—সব মিলিয়ে যে জগৎ, তার আলো হাওয়ায়।

ঐসব কথা যেদিন শুনেছিল নীতীশ, তারও প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে থেকে এই প্রতিষ্ঠান যে অনির্বাণ দীপশিখা জেবলে রেখেছিল তার থেকে নিজের নিজের বর্তিকাটি ধরিয়ে নিয়ে কত ছেলে দলে দলে বেরিয়ে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে, দূরে দূরান্তরে।

যে কোনো বড় শহরে গেলে দেখা যাবে, এ কথাও সেদিন মোহিনীদার মুখে শোনা, সেখানকার যারা কৃতী পুরুষ, জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে,—চিকিৎসায়, অধ্যাপনায়, সরকারী অফিসের উপরতলায়, রাজনীতির উচ্চমঞ্চে, বিচারাসনে, আইন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে, তাদের অনেকের দেহেই এই প্রেসিডেন্সির ছাপ, এবং সেটা তাঁরা সগৌরবে বহন করছেন। এখানকার ঐতিহ্য সম্বন্ধে অতি সচেতন। গোষ্ঠীবোধটাও নাকি অন্যদের তুলনায় বেশী প্রবল তাঁদের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্পও বলেছিল মোহিনী। তার এক বন্ধুর দাদার কাছ থেকে শোনা। ভদ্রলোক প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলেন কিছুদিন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে ডিগ্রী এবং আনুষঙ্গিক যা যা প্রয়োজন সংগ্রহ করে বাংলার বাইরে কোনো এক বড় শহরে হাইকোর্ট বার-এ যোগ দিলেন। জুনিয়র অ্যাডভোকেট। গাউন চড়িয়ে আসেন যান। বেশির ভাগ সময় বার লাইব্রেরীতে আড্ডা দেন। মক্কেলের দর্শন তখনো পান নি, অত তাড়া-

তাড়ি পাবার আশাও করেন নি। হঠাৎ একদিন এক চাপরাসী এসে খুঁজে খুঁজে তাঁর হাতে এক চিরকুট গছিয়ে গেল—একজন সিনিয়র জজসাহেব, অত্যন্ত কড়া বলে যিনি বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁকে খাস কামরায় 'সেলাম' জানিয়েছেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ভদ্রলোক প্রথমে মনে করলেন, ভুল। চিরকুটে লেখা নিজের নামটা আবার পড়লেন, এবং খবর নিয়ে জানলেন, ও নামে আর কোনো অ্যাড্ভোকেট নেই। ভরে ভয়ে গিয়ে ঢুকতেই বিপুল সম্বর্ধনা—আসুন, আসুন, প্রেসিডেন্সিতে ছিলেন আপনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করলেন, ইয়েস, ইওর লর্ডসিপ্।

—কী আশ্চর্য, এ্যাদ্দিন বলেন নি তো? দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। কালই অ্যাড্ভোকেট জেনারেল বলছিলেন আমাকে।

তারপর শুরু হল সেই পুরনো দিনের গল্প। কোন্ সালে পাস করে বেরিয়েছিলেন জজসাহেব। কারা কারা অধ্যাপক ছিলেন সে সময়, কে কেমন পড়াতেন, কী কী মুদ্রাদোষ ছিল কার, কবে কোন্ মজার ঘটনা ঘটেছিল, কী করেছিল তাঁর কোন্ সহপাঠী। বলার ফাঁকে ফাঁকে শুনেও নিলেন অনেক কথা। ভুলে গেলেন, যে তরুণ উকিলটি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তাঁর সামনে বসে আছে, তার থেকে তাঁর দূরত্ব অতি দুস্তর—বয়সের, পদমর্যাদার, সামাজিক প্রতিষ্ঠার, এবং আরো অনেক কিছুর। মিল শুধু এক জায়গায়। প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়েছেন দুজনে, একজন সেই কত কাল আগে, আরেকজন এই সেদিন। অনেকগুলো পার্থক্যের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ঐক্য। ক্ষুদ্র হলেও সে মহিমময়। দূর প্রান্তবাসী দুটি মানুষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অনুভব করলেন, তাঁরা একই গৌরবের সমান অংশীদার।

এই সব কথা যখন বলত মোহিনী, নীতুও নিজেকে মনে মনে সেই গৌরবের স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত। তারপরেই পিছিয়ে আসত, ভিতর থেকে জোর পেত না। হেয়ার স্কুলের উত্তর করিডোরে দাঁড়িয়ে কতদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ছোট্ট মাঠখানার ওপারে দেবদারুর লাইনের আড়ালে তিনতলা বাড়িটার দিকে। ঐ সামান্য দূরত্বটুকু পার হয়ে ওখানে গিয়ে উঠতে পারবে, এ বিশ্বাস তখনো জন্মায় নি।

তার কয়েক বছর পরেই যে নীতীশ ভট্চাজ প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দ্রুত পায়ে সেই সাদা বাড়ির খাড়া সিঁড়িগুলো বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে তিনতলার কোনো একটা লেকচার-হলএ গিয়ে ঢুকত, সে অন্য মানুষ। তার প্রতি পদক্ষেপে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা। কোত্থেকে যেন নতুন জোয়ার এসে কৈশোরের সে ভীরুতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অখণ্ড সাহস এসেছে মনে, প্রথম যৌবনের আত্মচেতনা যে সাহস আপনা থেকে এনে দেয়। মন যেন নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন, তার গ্রহণ-শক্তি প্রতিক্ষণে প্রসারিত হচ্ছে। সতীর্থরা এসেছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে। নানা ধরনের মানুষ। নিত্য পরিচয় ঘটছে বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে। একটা বিচিত্র জগৎ যেন ছায়াচিত্রের মত উদ্ঘাটিত

হচ্ছে চোখের সামনে। সেখানে সে দর্শকমাত্র নয়, তার চিন্তাধারা, কর্মধারার সঙ্গে নিজে মিলিয়ে দিতে পারছে, অনুভব করছে এ জগতের সেও একজন।

এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নীতুর একটা বড় সুবিধা ছিল—সে এসেছে ঐ ক্ষুদ্র মাঠের ওপর থেকে একটি প্রাচীন, বনেদী এবং গৌরবময় শিক্ষায়তনের ঐতিহ্য বহন করে। এখানে যেন তার বিশেষ অধিকার আগে থেকেই সাব্যস্ত হয়েছিল। মফঃস্বলের কোনো অপ্রসিদ্ধ স্কুল থেকে পরীক্ষায় তার চেয়ে আরো ভালো ফল নিয়ে যারা এসেছে প্রথম প্রথম তারা কেউ কেউ তাকে যেন একটু সমীহ করে চলত। সেও মনে করত এটা তার প্রাপ্য! ক্রমশঃ যখন ঘনিষ্ঠতা হল, বন্ধুত্ব হল কারো কারো সঙ্গে, তখন দুতরফেই এই কৌতুকের দিকটা ধরা পড়ল। তখন কে কোত্থেকে এসেছে সে কথা কারো মনে নেই, কোথায় এসেছে, সেই সম্বন্ধেই শুধু তারা সচেতন। সাগরে এসে পড়বার পর নদীর তো আর আলাদা সত্তা থাকে না।

'প্রেসিডেন্সি'র একটা উজ্জ্বল ছবি মোহিনীদার কাছ থেকে সে আগেই সংগ্রহ করেছিল। একটি কথা তিনি বলেন নি, হয়তো জানতেন না। সেটি এখানে এসে কদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করল। 'প্রেসিডেন্সি'র যে পরিপূর্ণ রূপ তার মধ্যে একটা বড় স্থান জুড়ে আছে ইডেন হিন্দু হস্টেল। 'ইডেন'কে বাদ দিয়ে সে অসম্পূর্ণ। তার কারণটা খুঁজে দেখবার মত বিশ্লেষণী বুদ্ধি তখনো জন্মায় নি, সে প্রয়োজনও বোধ করে নি। এটা বুঝেছিল, বাড়ি থেকে যারা আসে, তারা একে পুরোপুরি পায় না। সেদিক দিয়ে ঐ হস্টেলের ছেলেরা অনেক বেশী ভাগ্যবান। ওখানে একটা আলাদা জীবন আছে, যার স্বাদ থেকে সেও ঐ 'বাড়ির ছেলেদের' মত বঞ্চিত রয়ে গেছে। তাদের তবু একটা অন্য জীবন আছে, বাপ-মা-ভাইবোন-আত্মীয়পরিজন নিয়ে যে জীবন। তার স্পর্শ তারা পায়। সে আবার সেদিক দিয়েও বঞ্চিত। সেই কালীতলার মেস থেকে তখনো তার মুক্তি হয় নি।

নীতু অবশ্য ওখানেও আর সে নীতু নেই। সে বড় হয়েছে, চালচলনে আগেকার সে জড়সড় ভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকখানি সহজ, সপ্রতিভ, আত্মসচেতন। মেস্-এর বাসিন্দাদের চোখেও সে অনেকখানি অন্যরকম। ওখানকার মধ্যে একটু যারা উপরতলার লোক, কাপড়জামা দড়িতে না ঝুলিয়ে আলনায় রাখে, সপ্তাহান্তে বিছানার চাদর বদলায়, মাঝে মাঝে জুতোয় কালি দেয়, ঠাকুরকে আট আনা এক টাকা 'বখশিশ' দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে দু-একখানা বাড়তি মাছ সংগ্রহ করে, খেতে বসে হাঁকডাক করে চাকরকে দিয়ে চার পয়সার দই, কখনো দুটো একটা টোপর সন্দেশ আনিয়ে খায়, তারা তাকে কোনোদিন আমল দিত না। কলেজে ঢুকবার পর কেউ কেউ খাতির করে বসায়। ছেলেটার বাহাদুরি আছে বৈকি! নিজের চেষ্টায়, বাই ডিনট্ অব্ হিজ্ ওউন মেরিট্স ফার্স্ট গ্রেড্ স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকেছে; যদি বিগড়ে না যায় একদিন মানুষ হয়ে দাঁড়াবে।

তার উপরে কোনো কোনো মেম্বরের মনোভাব এবং ব্যবহার কিছুটা

বদলালেও, মেস সেই মেসই আছে। বাবুরামবাবু গরম জলের বাটি দিয়ে প্রতিদিন কাপড়-জামা ইস্তি করে চলেছেন, হেমেনবাবু তাঁর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোমশ দেহে একগাদা লোকের সামনে বেপরোয়া ভাবে উন্মুক্ত করে আধঘণ্টা ধরে সাবান ঘষে ঘষে আধ চৌবাচ্চা জলে স্নান করছেন, প্রাণতোষবাবু তাঁর কোণের দিকের সিঙ্গল-সীটেড্ ঘরের তক্তপোশে বসে প্রতি সন্ধ্যায় একটা ভাঙা হারমোনিয়মের সঙ্গে গলা মেলাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। মহাদেব ঠাকুরের পেটেন্ট 'রামরস' অর্থাৎ হাতায় করে উনুনের উপর ফুটিয়ে নেওয়া একগঙ্গা হলুদগোলা জলের সঙ্গে ছোট্ট এক টুকরো মাছ তার স্বাদ ও গন্ধ অক্ষুন্ন রেখেছে।

নীতীশের জীবনযাত্রার বাইরের দিকটাও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। 'ফ্রেন্ড্' থেকে 'মেম্বর' পদে উন্নয়ন ঘটে নি। মেম্বরদের বোর্ডিং চার্জ মাসে মাসে কিছুটা ওঠে নামে, কোন্ ম্যানেজার কিরকম খাওয়াচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ফ্রেন্ড্এর রেট বাধা। মীল (meal) প্রতি একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বরাদ্দ আছে তার জন্যে। সে যেন মেস্-এর অঙ্গীভূত নয়, অনেকটা পরগাছার মত। তার কোনো 'সীট' নেই, সুতরাং 'সীট রেন্ট্' বলে যে একটা দেয় আছে অন্য সকলের, তাকে তা দিতে হয় না। আগের মত ডবল-সীটওয়ালা ঘরের ফালতু বাসিন্দা হিসাবে এক কোণে মেঝেতে তার শোবার ব্যবস্থা। পড়বার জায়গা সেই সিঁড়ির পাশে বিনাপয়সার ফালি, বাড়িওয়ালার অনুগ্রহের দান।

যখন স্কুলে পড়ত বন্ধুরা কেউ কেউ অনেকদিন আসতে চেয়েছে তার কাছে। নানা ওজর দিয়ে কাটিয়ে দিত। কোথায় এনে বসাবে ? সুশান্ত একদিন হঠাৎ এসে পড়েছিল। আগের রাতে একটু জ্বর-জ্বর মত হয়েছিল বলে স্কুলে যায় নি। ও এসেছিল খবর নিতে। গাড়ি আনে নি। ড্রাইভারকে বাড়ি যেতে বলে হেঁটেই এসেছিল। কেমন করে যেন বুঝেছিল, গাড়িটা এখানে অবাঞ্ছিত। গাড়িওয়ালা হিসাবে সেও খুব বাঞ্ছিত নয়, তবু এসেছিল। নীতু তো কখনো স্কুল কামাই করে না। কী হল তার ?

ভাগ্যিস তখনো তার দাদা বা বাবুরামবাবুর ফিরবার সময় হয় নি। ঐ ঘরেই বসিয়েছিল সুশান্তকে, যতীশের তক্তপোশে নয়, (তার সতরঞ্চিটা ছেঁড়া, ময়লা) বাবুরামবাবুর অপেক্ষাকৃত ভালো পরিষ্কার সুজনীর উপর। সুশান্ত চারদিকটা চেয়ে বলেছিল—এইখানে থাকিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

উত্তরটা নিজের কানেই খচ্ করে বিঁধেছিল। তারপর এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল নিজেকে—মিথ্যা কথা তো বলে নি, এই ঘরেই তো থাকে। কিন্তু অস্বস্তির ভাবটা অনেকক্ষণ কাটতে চায় নি। 'এইখানে' বলতে সুশান্ত শুধু ঘরটা বোঝাতে চায় নি, খাটখানার ইঙ্গিতও ছিল তার প্রশ্নের মধ্যে।

সেদিনকার ক্লাসে কী পড়া হল তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। এক ফাঁকে সুশান্ত বলে উঠল। অনেকদিন তো যাসনি আমাদের বাড়ি। এবার একদিন আয় না। মা কত বলে তোর কথা।

নীতুর জানতে ইচ্ছা করছিল, ঝুনু কিছু বলে কিনা। কিন্তু সে প্রশ্ন তো আর করা যায় না। শুধু বলেছিল—যাবো একদিন।

সুশান্তদের ওখানে যাওয়া একরকম বন্ধই করে দিয়েছিল নীতীশ। কখন যাবে? বিকেলগুলো তো নতুন রুটিন দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন মেজদা। অনুক্ত হলেও তার মধ্যে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা চাপা থাকে নি, সেই বর্ষারাতের ব্যাপারটা তো ভুলবার নয়। তাকে ঘিরে একটা সূক্ষ্ম অভিমান জমা হয়েছিল মনের কোণে। ওঁদের যখন ইচ্ছা নয়, থাক। কাজ নেই কোথাও গিয়ে।

ওদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেও, এ কটা দিন সে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি। সন্ধ্যার মুখে যেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামত, সিঁড়ির ধারে ঐ ফালি বারান্দাটায় বসে ট্রান্‌শ্লেশন কিংবা সাবস্‌ট্যান্সের টাস্ক করতে করতে হঠাৎ কখন আনমনা হয়ে যেত। স্বপ্নভারনত আবেশময় চোখ দুটি তুলে দেখতে পেত এমনি আর একটি রাত, যেখানে বর্ষার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বর্ষার কবি, বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর কাব্যধারা। সেই মিলনের মাঝখানে মুগ্ধ তন্ময় হয়ে গেছে চারটি প্রাণী। বাইরে অন্ধকার, ভিতরেও আর সব আলো নেভানো, শুধু একটিমাত্র টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে তার সামনে, খোলা চয়নিকার উপর, সে অনুচ্চ আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করছে 'আষাঢ়', 'নববর্ষা', 'বর্ষামঙ্গল', 'সোনার তরী'……।

সেই অবিস্মরণীয় রাত্রিটি তার সেদিনের আনন্দ এবং পরবর্তীকালের বেদনা নিয়ে অনেকক্ষণ তাকে অনুসরণ করত, তার সারা চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখত।

তারপর আস্তে আস্তে তার রং ফিকে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ত কিন্তু তেমন করে আর টানত না। দেখতে দেখতে হেয়ার স্কুলের দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। এতদিন যারা একসঙ্গে ওঠা বসা করত সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। ওর সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতেও এল কয়েকজন। কিন্তু দেখা গেল মাঠের এই সামান্য দূরত্বটুকু পার হয়ে এসে পরস্পরের কাছ থেকে তারা বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। তাই হয়। স্কুলের বন্ধুত্ব কলেজে গিয়ে টেকে না, তা নয়, কিন্তু তার গাঢ়তা কমে যায়। সুশান্ত যদি আসত, ওদিককার যে দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে নীতুকে সরে আসতে হয়েছিল, সেটা হয়তো আবার নতুন করে খুলে যেত। তা নিয়ে সেদিন মেজদার মনে যে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার কারণ তো অনেকখানি চলে গেছে। মেজদার আশা সে অপূর্ণ রাখে নি। তাঁর উপরে যে অভিমান সে এতদিন ধরে মনে মনে পোষণ করে এসেছিল, তার একটু সূক্ষ্ম রেশ শুধু পড়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো ঠিকই ভেবেছিলেন মেজদা। যে স্রোত তাকে টানছিল তার মুখে অমনি একটা বাঁধের বোধ হয় প্রয়োজন ছিল। সেদিনকার সেই স্কুলের ছেলেটিকে একটু যেন অভিভাবকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল নীতীশ। একবারও মনে হল না, তার সঙ্গে ওর আজকের ব্যবধান বয়সের দিক থেকে মাত্র সামান্য কটা বছর।

এ এক অদ্ভুত রহস্য। প্রতিটি নরনারীর জীবনেই একটা কাল আসে, যখন তার বাইরের বয়সটা যথারীতি বছরের মাপে বাড়লেও ভিতরের বয়সটা এক

লাফে অনেক দূর এগিয়ে যায়।

সুশান্তর অভাবটা নতুন করে অনুভূত হল নীতুর কাছে। কলেজেও যদি একসঙ্গে এসে জুটতে পারত দুজনে? কয়েকটা মাত্র নম্বরের জন্যে সে আসতে পারল না। এখানকার পাসপোর্ট ঐ মার্কশীট। তার উপরে কোনো কথা নেই। বাধ্য হয়ে সেন্ট্ জেভিয়ার্সে চলে গেল বেচারা। তারপরে আর বড় একটা দেখা হয় না, মাঝে দুদিন মাত্র এসেছিল। ওদের বাড়িতে যাবার কথা একবারও বলে নি। নীতু কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ভিতরে ভিতরে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সুশান্ত হয়তো ইচ্ছা করেই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। আগে আগে অনেকবার বলেও যখন লাভ হয় নি, তার মনে যদি কোনো ক্ষোভ জেগে থাকে তার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে অন্য দশজন মেম্বরের মত যতীশের মেস-এর জীবনেও কোনো পরিবর্তন আসে নি। সকাল থেকে রাত দশটা সেই একই রুটিন। ল'এর পরীক্ষাগুলো অবশ্য চুকে গেছে। নামের শেষে বি-এ'র জায়গায় বি. এল বসাতে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আসল পরিচয় মাস্টার, —দুপুরে স্কুল-টীচার, সকাল-সন্ধ্যায় প্রাইভেট টিউটর। রোহিণী এর মধ্যে দুবার তাগিদ দিয়েছে—আর কেন? ও বেশ এবার ছাড়। অন্ততঃ দশটা থেকে চারটা যে গোয়ালটা আগলে আছ, সেখান থেকে বেরিয়ে পড়। আর কতকাল গাধা পেটাবে? বারো বছর পেরোতে আর বেশী দেরি নেই সে খেয়াল আছে? তখন যে তোমাকেই লোকে ঐ দলে ভর্তি করে দেবে।

আরেকখানা চিঠিতে লিখেছিল—বাহাদুর ছেলে নীতু। এরই মধ্যে দাদার কাঁধ থেকে প্রায় নেমে দাঁড়িয়েছে। জলপানির উপরে সামান্য কটা টাকা হলেই তার চলে যাবে। অতএব অবিলম্বে গোশালাং পরিত্যজ্য বটতলাং শরণং কুরু।

রোহিণী জানত না, কাঁধ থেকে নীতু নেমে গেলেও ওদিক থেকে আরেকজন এসে উঠেছে, এবং সে ভারটা অনেকখানি গুরুতর। বাড়ি থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম এবং তার পরের কাহিনী বন্ধুকে জানায় নি যতীশ। রোহিণীকে তো জানে। শুনে প্রথমটা থ হয়ে যাবে, তারপর চুটিয়ে গালাগালি দেবে। তা দিক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় দুঃখ পাবে বেচারা। সেটা চায় না বলেই খবরটা জানায় নি। যতীশের জন্যে তার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। কবে সে তার বর্তমান জীবনের ব্যর্থতা ও অপচয় থেকে মুক্তি পেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সার্থক জীবনের পথে গিয়ে উঠতে পারবে, তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। তার নিজস্ব কড়া ভাষায় বহুবার সে অধীরতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই শুকচর ছেড়ে চলে আসার আগে থেকে যতীশের সমস্ত ভবিষ্যতের একটা ছক সে মনে মনে এঁকে রেখে দিয়েছিল। আর কেউ না জানুক যতীশের নিজের কাছে কিছুই অজানা ছিল না। সেই ভবিষ্যতের দরজাটি সবে যখন খুলতে চলেছে, তার মুখে এসে গণ্ডমূর্খের মত হঠাৎ একটা মোটা শিকল দিয়ে নিজের পা দুটো বেঁধে ফেলল—রোহিণীর কাছে এটা মর্মান্তিক আঘাত।

এই সময়ে এরকম একটা অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ যতীশের নিজের পরিকল্পনাতেও ছিল না। তবু যে সে পা বাড়িয়ে বসল, তার কারণটা রোহিণীকে বোঝানো যাবে না। তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, অন্যকে বোঝাবে কী? যে সংসার থেকে সে শিশুকাল থেকে বিচ্ছিন্ন, অথচ যার ভালোমন্দের সঙ্গে সে নিজেকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছিল, তার উপরে এটা একটা দুর্জয় অভিমান। বিশেষ করে একজনের উপর। কিন্তু সে কি তা বুঝতে পেরেছিল? তার জন্যে যে বুদ্ধিটুকু দরকার সেটা কি তার কাছে আশা করা যায়? যতীশ কি অনেকখানি বেশী প্রত্যাশা করে বসে নি?

সে যাই হোক রোহিণীকে আপাততঃ ভরসার কথাই শুনিয়ে রাখল যতীশ—আর দেরি নেই। গোয়াল ছেড়ে কোন্ মাঠে গিয়ে চরবো, ব্যাঙ্কশালে না আলিপুরে, শিয়ালদ না হাওড়ায়, সেই খোঁজে আছি।

কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। মনে মনে একটা সন্ধান শুরু হয়ে থাকবে, যদিও কাজে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। কিন্তু একটা জিনিস নীতুও লক্ষ্য করেছিল। মেজদা স্বভাবতই গম্ভীর, সে গাম্ভীর্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভিতরে ভিতরে কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে। সেই সঙ্গে এটাও তার নজর এড়ায় নি, কেমন একটা নির্লিপ্তির ভাব এসেছে মেজদার কাজেকর্মে। বাড়ির সঙ্গে চিঠিপত্রের সংযোগ তাঁর দিক থেকে বরাবরই কম। সে সময় কই? ইদানীং প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। ভাইএর বিয়ের পর থেকে হরিশের চিঠির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, কিছুটা আকারও। সেগুলোর উত্তর যেত মনি-অর্ডারে। তার ফর্ম-পূরণ করা এবং পাঠাবার ভার নীতীশের উপর। কুপনও সে-ই লিখত, তারই কথা।

বছরে দুবার অন্ততঃ বাড়ি যাওয়া—পুজো এবং গরমের ছুটিতে—ওদের একরকম বাঁধা ছিল। তাতেও ব্যতিক্রম দেখা দিল। কয়েকটা ছুটি একাই ঘুরে এল নীতীশ। সকলের প্রশ্নের উত্তরে মেজদার উক্তিটাই নিজের জবানিতে জানিয়ে দিল—হঠাৎ কাজে আটকা পড়ে গেলেন, তাই আসেন নি। কিন্তু তার নিজের মনে দিন দিন নানা প্রশ্ন জমে উঠতে লাগল।

সেগুলো নিয়ে যখন ভাবতে শুরু করেছে, এমন সময় এক অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল। একদিন রাত নটায় খেতে যাবার জন্যে তার চিলেকোঠার টঙ থেকে যখন নেমে এসেছে, মেজদা বললেন—কাল একবার খবর নিস তো হিন্দু হস্টেলে সীট আছে কিনা।

—হিন্দু হস্টেলে! বিস্ময়ের ঘোরে কথাটা আপনা থেকেই যেন বেরিয়ে গেল।

—কোন্ তলায় কত সীট-রেন্ট্, বোর্ডিং চার্জ কি রকম পড়ে, সব জেনে আসিস।

স্পষ্ট কিছু বললেন না মেজদা। কিন্তু যেটুকু কানে গেল নীতুর সারা মনে আশা ও সংশয়ের দোলা দিতে লাগল।

আশাই জয়ী হল শেষ পর্যন্ত।

একতলায় হলে ভালো হত, এক কিংবা তিন নম্বর ওয়ার্ডে। মাসে মাসে দুটো টাকা সীট-রেন্ট্ বেঁচে যেত। সেই চেষ্টাই করেছিল নীতীশ। কিন্তু হল না; জায়গা নেই। জায়গা পাওয়া গেল দোতলায়, তাও রাস্তার উপরে নয়, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর দিকে, চার নম্বর ওয়ার্ডে। সীট-রেণ্ট্ পাঁচ টাকা। তিনখানা করে সীট্ এক-একটা ঘরে। তারই একটা খালি পাওয়া গেল। সেশনের মাঝামাঝি; পাবার কথা নয়। কী করে যেন খালি পড়ে ছিল একটা সীট। নীতীশ মনে মনে বলল, তার জন্যেই ছিল, এ তার অকল্পনীয় সৌভাগ্য।

তার উপরেও আরেকটা তলা আছে—পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড। একটি চেনা বন্ধুর সঙ্গে দেখা, ওদের সেকশনে পড়ে। সে বলল—ওখানে যারা থাকে, তাদের বলে হাইল্যাণ্ডার্স।

কলেজ থেকে মেস্এ ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে হিন্দু হস্টেলের গেট্এ যখন পৌঁছল, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। মেজদা সব কিছু গুছিয়ে রেখে বেরিয়েছিলেন। মায়ের হাতের কাঁথাখানাকে ছেড়ে দিতে হল। দীর্ঘকাল সম্পর্ক তার সঙ্গে, সেই নটখোলা থেকে। শুকচরে ছিল, কলকাতার মেস্এও ওটাই ছিল তার শয্যা। এখানে ওকে মানাবে না। বড় বেশী গ্রাম্য, অন্ত্যজ, এ সমাজে তার প্রবেশ নিষেধ। এখানকার জন্যে নতুন তোশক চাদর বালিশের ব্যবস্থা করে গেছে যতীশ, একটা ছোট্ট রঙিন সতরঞ্চিতে জড়ানো।

গেট্এর ভিতরে পা দিতেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। শবযাত্রার হরিধ্বনি উঠছে তিনতলায়। সেই ভয়াবহ রব—বল হরি-ই-ই, হরি বো-ও-ওল, কলকাতায় এসে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। প্রথম প্রথম যখন শুনত, গা ছমছম করে উঠত। কতদিন ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠেছে, মেস্এর কাছ দিয়ে গভীর রাত্রে যখন মড়া নিয়ে যেত কোনো শ্মশানযাত্রীর দল। অনেক সময়ে ভেবেছে, মৃতদেহ নিয়ে যাবার এই প্রথা, বিশেষ করে শববাহীদের এই চিৎকার, হিন্দুজাতকে ছোট করে দিয়েছে অন্য জাতের কাছে। কই, খৃষ্টানরা তো এ রকম চেঁচায় না, মুসলমানরাও না। খৃষ্টানদের শবযাত্রা সব চেয়ে গাম্ভীর্যময়। নিঃশব্দ, ধীরে ধীরে মৃতকে অনুসরণ করে একদল নরনারী। তারা সকলেই হয়তো মৃত ব্যক্তির স্বজন বান্ধব নয়। নীতীশ কার কাছে যেন শুনেছিল, ভাড়া করা মোর্ণার বা শোককারী থাকে তার মধ্যে। তা থাক, তবু সমস্ত মিছিলটি শোভন ও ভব্য। মৃতকে মর্যাদা দিতে জানে তারা।

মুসলমানরা একটা কি বয়েত আওড়াতে আওড়াতে যায়। তার সুর সংযত। যেভাবে তারা চলে তার মধ্যেও মৃতের প্রতি একটি সম্ভ্রম-বোধ ফুটে ওঠে।

মাড়োয়ারীদের "রাম নাম সত্য হ্যায়" একটু উচ্চরবে উচ্চারিত হলেও ভয়াবহ নয়, কানকে পীড়া দেয় না। কিন্তু 'বল হরি হরি বোল' বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বীভৎস। সেই বিকট আওয়াজ কানে গেলে শুধু যে হৃৎকম্প হয় তাই নয়, সারা মন লজ্জায় বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

কলকাতার বাইরে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ঠিক এই জিনিসটা দেখা যাবে না।

এই অসভ্য চিৎকার এবং অশ্লীল আচরণ এই সভ্যতাগর্বী বড় শহরের মহৎ বৈশিষ্ট্য।

নীতীশ গেট্‌এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কে গেল এই দিনটিতে, বিশেষ করে এই ক্ষণটিতে যখন সে একটা বহু-আকাঙ্ক্ষিত নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে? একে একটা চরম অশুভ লক্ষণ বলে মনে হল। ভিতরে ভিতরে ভীষণ দমে গেল মনটা। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এটা কুসংস্কার। তখনই আবার ছুটে এল সেই চিৎকার। সব যুক্তি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নীতীশ যেন এগিয়ে যাবার মত বল পাচ্ছিল না।

হস্টেলের বৃদ্ধ দারোয়ান তার বাক্স-বিছানাটা গাড়োয়ানের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছিল। নতুন বাবু এল একটা। একেবারে ছেলেমানুষ। ফার্স্ট ইয়ারের হবে নিশ্চয়। হঠাৎ তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে কারণটা বুঝতে পারল। কাছে এসে হেসে বলল—ও কিছু না; বাবুরা বনমালীর লোক দুটোকে ডাকছে।

নীতীশ কথাটা ধরতে পারল না। দারোয়ান বুঝিয়ে দিল, বনমালী বলে একজন খাবারওয়ালা আছে হস্টেলে। গেট্‌এর ঠিক উল্‌টো দিকে মাঠের ওপারে তার ঘর। সরকারী দাক্ষিণ্যে বিনা ভাড়ায় পাওয়া, জেমস্‌ সাহেব দিয়ে গিয়েছিলেন। ওরকম প্রিন্সিপ্যাল হয় না। শর্ত ছিল, খাঁটি ঘিয়ের টাটকা খাবার খাওয়াতে হবে ছেলেদের, সব ওখানে তৈরী হবে। সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট যখন ইচ্ছা দেখতে পাবেন। দুবেলা বড় বড় বারকোশে খাবার সাজিয়ে ঘরে ঘরে পেঁৗছে দেয় তার লোক। সকালে গরম গরম কচুরি, সিঙ্গাড়া, জিলিপি, হালুয়া, বিকেলে লুচি, তরকারি, আলুর দম, নানা রকমের মিষ্টি। যে যা চায়। মাসের শেষে খাতা নিয়ে টাকা আদায় করতে বেরোয় বনমালী। হার্ডিঞ্জ হস্টেলের খাবার, এখান থেকে যায়। বাইরের কিছু পাইকারী খদ্দেরও আছে, এখানে এসে নিয়ে যায়। এই করেই লাল হয়ে গেছে লোকটা। দেশে প্রচুর জমিজমা। কলকাতাতেও নাকি জমি কিনে ফেলেছে, বাড়ি করবে।

বনমালীর দুটো লোক আছে, যারা ঘরে ঘরে খাবার দিয়ে যায়। একজনের নাম নরহরি, আর একজনের হরিপদ। তাদেরই অমন করে ডাকছেন বাবুরা—নরহরি-ই-ই, হরিপদো-ও-ও। একেবারে অবিকল 'বল হরি, হরি বোল'-এর সুর।

ঘরে ঢুকে খাটের উপর বিছানা করতে গিয়ে প্রথমেই মার কথা মনে পড়ল নীতুর। সেই সঙ্গে বাবার কথা, যাঁকে সে দেখেছে, কিন্তু জ্ঞান হবার অনেক আগে। সে দেখা আর না-দেখার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাঁর শেষ ইচ্ছা শেষ রোগশয্যায় শুয়ে যেটা প্রকাশ করেছিলেন, মায়ের মুখে সে অনেকবার শুনেছে—পার তো ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিও; এ যুগের যে শিক্ষা, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান, ইংরেজি ভাষা। অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলেন। জানতেন তিনি নিজে তার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর একটি অসহায় বিধবা কেমন করে নেবে সে ভার? তবু না বলে পারেন নি। তাঁর অন্তরের একান্ত বাসনাটুকু ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। মা একটি দিনের তরেও তা ভোলেন

নি। ভোলেন নি মেজদাও। তাঁদের দুজনের চেষ্টায় আজ সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। পিতার ইচ্ছা, মা ও দাদার চেষ্টা—দুটোকেই রূপায়িত করবার মহৎ দায়িত্ব তার উপর।

বিশেষ করে এই দিনটিতে সে কথা স্মরণ করবার প্রয়োজন ছিল।

চার নম্বর ওয়ার্ড থেকে ডাইনিং হল বেশ কিছুটা দূরে। নীচে নেমে মাঠের ধার দিয়ে টিনের ছাউনি দেওয়া পথ বেয়ে দুবেলা খেতে যেতে হবে। দল বেঁধে যাচ্ছে আসছে ছেলেরা। নটার কাছাকাছি নীতুর সেই সহপাঠী বন্ধুটি এসে বললে—চল। প্রথম দিন তো। সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গী পেয়ে নীতুও যেন ভরসা পেল। একগাদা অচেনা লোকের মধ্যে বসে খেতে তার বড় অস্বস্তি। ভীষণ লজ্জা করে, কিছু চাইবার দরকার হলে মুখ ফুটে বলতে পারে না। মেস্-এ থাকতে এমন সময় খেতে যেত যখন কোনো ভিড় নেই। এক কোণে গিয়ে বসত। এখানে সব সময়েই ভিড়। আড়াইশ মত ছেলে থাকে পাঁচটা ওয়ার্ড মিলে।

একতলা দোতলা মিলিয়ে চারিটি বড় বড় খাবার ঘর। সঙ্গী ছেলেটি বলল—ওপরে চল। কমলাক্ষবাবুকে যেতে দেখলাম দলবল নিয়ে। সুশীলও গেছে একটু আগে। ওকে দিয়ে বোধ হয় কোনো মজা-টজা করার প্ল্যান আছে কমলাক্ষবাবুর।

নীতীশ এদের কাউকে চেনে না। তার বন্ধুটির কাছে শুনল। কমলাক্ষ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র, এবার এম. এ. দেবে। থাকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। বি. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। নামকরা ভালো ছেলে, তেমনি ভীষণ দুষ্টবুদ্ধি খেলছে মাথায়। কখন কার পেছনে লাগে, এই ভয়ে সবাই তটস্থ। সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টেরও রেহাই নেই ওর হাত থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চমকে উঠল নীতীশ। একসঙ্গে অনেকগুলো কাঁসার থালা কে যেন শানের উপর আছড়ে ফেলল। ছেলেটি বলল—ঐ শোনো, ওয়ান, টু, থ্রী বলে থালাগুলো মেঝের উপর ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কুড়ি পঁচিশটি 'হাইল্যাণ্ডার্স'। সব ওর চেলা। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। পাশেই সুপারি-ন্টেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার্স, তাঁকে খানিকটা জ্বালাতন করা। উনি আবার শব্দ-টব্দ বেশী সইতে পারেন না। জোরে গান করলে পর্যন্ত চটে যান। সেইজন্যেই এই কাণ্ড।

—উনি কিছু বলেন না?

—কী আর বলবেন? এদিকে আবার প্রিন্সিপ্যালের ভীষণ ফেবারিট কমলাক্ষবাবু।

—সুশীল কে? তার কথা কি যেন বলছিলে? প্রশ্ন করল নীতীশ।

—সুশীল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সায়েন্সের ছেলে। একটু বেশী বাবু। সব সময়ে সেজেগুজে বেড়ায়, আর ঘড়িটা কখনো খোলে না। খেতে আসবে, হাতে রিস্ট্ওয়াচ। কমলাক্ষবাবুর নজর পড়েছে। কার কাছে নাকি বলছিলেন—ছোঁড়াটা তো বড্ড জ্বালাল দেখছি। একটা কিছু করতে হয়। কে জানে, হয়তো

আজই কোনো মতলব নিয়ে এসেছেন। এত সকাল সকাল তো ওঁরা কখনো আসেন না।

উপরে এসে কমলাক্ষকে চিনিয়ে দিল ছেলেটি। এই গরমে সারা গায়ে একটা বিছানার চাদর জড়ানো। ওদিক থেকে কে যেন বলল—শরীর খারাপ নাকি কমলদা ?

—মন খারাপ। গম্ভীর ভাবে বলল কমলাক্ষবাবু।

একটা হাসির রোল উঠল।

সুশীলকেও দেখিয়ে দিল নীতুর বন্ধু। ফিটফাট বেশ, হাতে ঘড়ি। কমলাক্ষ বসেছেন তার সামনের লাইনে, প্রায় মুখোমুখি। চুপচাপ খেয়ে চলেছেন যা তাঁর নিয়ম নয়। মাঝে মাঝে এমন এক-একটা মন্তব্য করেন, সবাই হেসে গড়িয়ে যায়। এদিনের ভাবটা কেমন যেন থমথমে।

তার দলের কে একজন জানতে চাইল—কটা বাজল হে কমলাক্ষ ?

—দাঁড়াও বলছি—বলে চাদরের ঢাকনাটা খুলে ফেলে দিল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। বাঁ হাতের কবজিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘুমভাঙানো টাইমপিস। সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল—বন্ধ হয়ে গেছে। উনি বলতে পারবেন।

সুশীলকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল। সারা হল ফেটে পড়ল হাসিতে। বেচারা সুশীলের মাথাটা নুয়ে পড়ল থালার উপর।

হস্টেলের নতুন সরঞ্জামের মধ্যে একটি কুঁজো ছিল নীতীশের সঙ্গে। মাথায় বসানো নতুন কেনা কাঁচের গেলাস। খাবার ঘর থেকে ফিরে এসে জল খেতে গিয়ে দেখে গেলাসটি নেই। হঠাৎ কোথায় গেল জিনিসটা ? এদিক-ওদিক যখন দেখছে ওধার থেকে তার রুমমেট, থার্ড ইয়ারের ছেলে, বই থেকে চোখ না তুলেই বলল—কী খুঁজছেন ?

—আজ্ঞে, আমার গেলাসটা ?

—নেই।

—নেই মানে ? কথাটা ঠিক ধরতে পারল না নীতীশ।

—নেই মানে চলে গেছে। এর নাম ইডেন হিন্দু হস্টেল। গেলাস-টেলাস এখানে থাকে না।

নীতীশ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এবার চোখ তুলল রুমমেট। বলল—কী করে জল খাবেন, ভাবছেন তো ? এমনি করে।

উঠে এসে উপরের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে কুঁজোটা উপুড় করে ধরল। ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল, বাইরে একটুও পড়ল না। তারপর সেটা নীতীশের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—জাস্ট ট্রাই, চেষ্টা করুন।

নীতুর তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু ঐ রকম একটা কঠিন কসরত করতে গিয়ে প্রায় সব জলটাই পড়ল তার মুখের বাইরে, গলায় বুকে। জামাটা ভিজে গেল। রুমমেট যেন মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছে এমনি গম্ভীর সুরে বলল—একবারে হবে না, ট্রাই এগেইন্। তাতেও যদি না হয় স্কুলের নীচের ক্লাসে একটা ইংরেজি কবিতা পড়তে হত, মনে নেই ? ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেইন্।

রাত এগারটায় হস্টেলের সব ঘরের আলো নিভে গেল। সেটাই নিয়ম। নীতীশ শুয়ে পড়ল। সেই রুমমেটটি ড্রয়ার থেকে একটি মোমবাতি বের করে জ্বালিয়ে বসিয়ে দিল টেবিলের উপর। তারপর মশারি টাঙাতে শুরু করল। নীতীশের মশারি নেই, মেস-এও ছিল না। মধ্য কলকাতায় গরমের দিনে মশারির দরকার হত না তখনকার দিনে। কিন্তু ভদ্রলোক টাঙাচ্ছে কেন? জিজ্ঞাসা করল—এখানে মশা আছে নাকি?

—আছে। তবে আপনাকে কামড়াবে না।

নীতীশ অবাক। রুমমেট বুঝিয়ে দিল—মানে সেগুলো আসল মশা নয়, মানসিক মশা। কামড়ায় না, কিন্তু মনে হয় কামড়াচ্ছে।

বেশ খানিকটা তন্দ্রা এসেছিল নীতুর। কড়া সিগারেটের গন্ধে হঠাৎ টুটে গেল। চোখ খুলে দেখল, মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে রুমমেট।

—ও কী করছেন! ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার উপর।

—দেখতেই তো পাচ্ছেন, সিগারেট খাচ্ছি।

—মশারির মধ্যে! কী সর্বনাশ! যদি হঠাৎ আগুন ধরে যায়?

রুমমেট ধীর অবিচল কণ্ঠে বলল—কদ্দিন এসেছেন কলকাতায়?

—সে কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—ফায়ার ব্রিগেড বলে একরকম গাড়ি আছে, দেখেছেন?

—তা দেখেছি বৈকি!

—সেগুলোকে কি করে আনতে হয় জানেন তো?

নীতীশ জবাব দিল না। ভিতরে ভিতরে এই অদ্ভুত লোকটার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে তেমনি নির্বিকারে সিগারেট টানতে টানতে বলল, যদি আগুন লাগে সামনেকার রাস্তার ধারে যে লম্বা মতন লাল বাক্সটা আছে—তার কাচ ভেঙে হাতলটা ঘুরিয়ে দেবেন। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না।

এর পরে আর বলবে নীতীশ?

দুপুর বেলাটা ঝিমিয়ে পড়ে ইডেন হিন্দু হস্টেল। ঘরগুলো খালি, করিডোরে অনাবশ্যক চটপট কিংবা অদ্ভুত ঘষটানি আওয়াজ তুলে স্যান্ডেল-গুলো এধার-ওধার করছে না। 'বাবুরা' সবাই প্রায় কলেজে। সেই সুযোগে ওয়ার্ড-সার্ভেন্টরা ('চাকর' বললে তারা ধর্মঘট করবে) তাদের কাজগুলো সেরে রাখে।

চারটের পর থেকে মাঠের তিনদিকব্যাপী অত বড় বাড়িটায় প্রাণ-চাঞ্চল্যের জোয়ার আসে এবং প্রতি মুহূর্তে ফেঁপে ফুলে উঠতে থাকে। হাসিতে-খুশিতে, গানে-গল্পে, উচ্চকণ্ঠের কলরবে চারদিকটা ভরে যায়। এ ওকে ডাকছে, সে তার দিকে হাঁক দিচ্ছে। একতলা দোতলা তিনতলা থেকে চিৎকার ওঠে—দিবাকর, চা; বংশী, চা কোথায়? মোহিনী চা লেয়াও। (এরা সব ওয়ার্ড-সার্ভেন্ট, প্রত্যেকের নিজস্ব চায়ের সরঞ্জাম আছে, অর্ডার মত ঘরে পৌঁছে দেয়) আর তার চেয়েও

বড় হুঙ্কার—বনমালী, কিংবা সেই নরহরি-হরিপদ।

সন্ধ্যার পর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ভেসে আসে আশ্চর্য বাঁশির সুর। অমন মধুর বাঁশি এই প্রথম শুনল নীতীশ। মাঝে মাঝে দু-এক কলি গান, বেশীর ভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীত, কোথাও বা এসরাজ কিংবা গীটারের বাজনা।

গানের নামে খানিকটা বেসুরো বেপরোয়া হল্লাও শোনা যায় কোনো জায়গায়, বেশীর ভাগ হাইল্যাণ্ডর্স্-এ। তার লক্ষ্য বিশেষ করে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। ভদ্রলোক গান শুনতে চান না বলে তাঁকে বেশী করে শোনাবার চেষ্টা। একবার নাকি কার কাছে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন—ও সব আজেবাজে গান কর কেন তোমরা? গাইতেই যদি হয়, কীর্তন গাও, রামপ্রসাদী গাও। পরদিনই কীর্তনের ব্যবস্থা হল। একজন মূল গায়েন, তার সঙ্গে জনদশেক দোহার। গানটিও তাদেরই কারো রচনা—

প্রভাতে উঠিয়া হুঁকা হাতে নিয়া
কানু কহিলেন, রাই গো,
তোমার মালসাতে কি আগুন আছে?

স্বর রাসভনিন্দিত, সুর নিখুঁত কীর্তন। স্থান দু নম্বর ওয়ার্ডের শেষপ্রান্ত, সেখান থেকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরগুলো আরম্ভ।

শুধু গানবাজনা, হৈ-হল্লা নয়, করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দেখা যাবে, কোনো ঘরে হয়তো তর্ক চলছে—তুমুল তর্ক। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনো বাছবিচার নেই। কান্টীয় দর্শন, উইনস্টন চার্চিলের রাজনীতি, জন বোয়ারের সাহিত্য থেকে দাড়ি রাখার উপকারিতা কিংবা অকর্মক বৃদ্ধদের মেরে ফেলে দিলে অর্থনীতিব দিক থেকে দেশ লাভবান হবে কিনা—ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা পর্যন্ত তার পরিধি। একটু কান পেতে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হবে। বিষয় যাই হোক, তাকে আশ্রয় করে তার্কিকরা যে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যে ব্যাপক অধ্যয়ন, যে গভীর রসবোধের পরিচয় দিচ্ছে, তার মান অনেক উঁচু।

নীতীশ শুধু দু'চোখ মেলে দেখছিল, দু'কান ভরে শুনছিল। তার কাছে এ জগৎ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জীবনে এমন একটা উচ্ছল, চঞ্চল, প্রাণবন্ত—আবার তারই মধ্যে মনোনোজ্জ্বল, জ্ঞানদীপ্ত রূপ সে এই প্রথম দেখল।

'সন্ধ্যার পর হাত-পা ধুয়ে পড়তে বস'—ছেলেবেলা থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকদের এই নির্দেশ এতকাল ধরে মেনে এসেছে নীতীশ। এখানে এসে সে নিয়মে ছেদ পড়ল। এদের নীতি আলাদা। সন্ধ্যার পরেও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত এদের না-পড়ার এলাকা। আর একটা জিনিস দেখল, এদের টেবিলে 'পড়ার বই'এর চেয়ে 'বাজে বই'এর সংখ্যা বেশী ছাড়া কম নয়। তবে এরা পড়ে কখন? কেমন করে এত ভাল ফল করে পরীক্ষায়? এ খবর তো সে জানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ সীমানায় (সারা বাংলা এবং গোটা আসাম তখন তার অন্তর্ভুক্ত) যেখানে যত স্কুল-কলেজ আছে, সবগুলো থেকে সেরা ছাত্রেরা এসে জড়ো হয়েছে এই ইডেন হস্টেলে। দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। যেন আড্ডা দিতে এসেছে। দুদিন স্ফূর্তি আমোদ করে চলে যাবে।

এগারটায় আলো নিভলে নীতীশ শুয়ে পড়ত। একদিন কি কারণে জাগতে হয়েছিল। বড় গরম, ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে ঘুরছিল। একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। ঘরে ঘরে প্রতি টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। তার অস্পষ্ট আলোয় যে মুখগুলো দেখা যাচ্ছে, তাদের চেহারা একেবারে আলাদা। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেও ঐ মানুষগুলোই হাসিহুল্লোড়ে তোলপাড় করে রেখেছিল গোটা ওয়ার্ড! যেন ধ্যানে বসেছে! সাধকের মত শান্ত, সমাহিত মুখ। খোলা দরজার সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল নীতীশ। কেউ চোখ তুলে একবার তাকাল না। দু-একজন যদিবা চাইল, সে চোখে পরিচয়ের চিহ্ন নেই। ওরা এখন অন্য জগতে চলে গেছে।

কী খেয়াল হল। ঢাকা দেওয়া কাঠের ওভারব্রীজ পার হয়ে চলে গেল দু' নম্বর ওয়ার্ডে। সব ঘরে ঐ একই দৃশ্য।

সেদিন কলেজের পরেও কিছুক্ষণ লাইব্রেরীতে ছিল নীতীশ। যখন ফিরল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। টেবিলের উপর শালপাতায় লুচি-তরকারি রেখে গেছে নরহরি। দিবাকর তার ওপরে একখানা ডিশ দিয়ে রেখেছে। খেতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল একখানা পোস্টকার্ড রয়েছে তার পাশে। বড়দার চিঠি। তুলে নিয়ে কয়েক লাইন পড়েই মাথাটা হঠাৎ ঝিম ধরে গেল। গলা থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দও বোধহয় বেরিয়ে এসে থাকবে। সেই মশারিওয়ালা রুমমেটটির কানে যেতেই সে উঠে এসে বলল—কী হল! নীতীশ জবাব দিতে পারল না। পোস্টকার্ডটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। মাথাটা নামিয়ে দিল টেবিলের উপর।

ছেলেটি পোস্টকার্ডখানায় চোখ বুলিয়ে বলল—সে কী? নীতীশ তখন উঠে পড়েছে। ঘর থেকে বেরোতে যাবে, ছেলেটি পিছন থেকে বলল—কোথায় যাচ্ছ?

—দাদার কাছে।

বলেই চলে যাচ্ছিল। রুমমেট বাধা দিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও। কোথায় থাকেন তোমার দাদা?

—কালীতলার কাছে।

রুমমেট চট করে উঠে পড়ল। দেয়াল-আলনা থেকে একটা শার্ট টেনে নিয়ে মাথা গলাতে গলাতে এগিয়ে এসে বলল—চল।

॥ ১৬ ॥

নীতুকে মেস-এর দরজায় পৌঁছে দিয়ে রুমমেটটি বলল—আমি তাহলে যাই। আজ আর তোমার হস্টেলে ফিরবার দরকার কী? দাদার কাছে থাকবে, কেমন?

নীতীশ মাথা নেড়ে জানাল—তাই থাকবে।

যতীশ ছিল না। এ সময়ে থাকবার কথাও নয়। চিঠিটা হয়তো ডাক-বাক্সে

পড়ে আছে, এখনো তার হাতে পৌঁছায় নি।

বাবুরামবাবু তাঁর নিজের তক্তপোশে গুটিয়ে রাখা বিছানায় হেলান দিয়ে বিড়ি টানছিলেন। নীতুকে দেখে বললেন—বাড়ির চিঠি পেয়েছ বুঝি ?

—হ্যাঁ। বলতে গিয়ে তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বাবুরাম বললেন—বসো। কেঁদে কী হবে ? ভবিতব্যের ওপরে তো কারো হাত নেই।··· তোমার দাদাও পেয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে।

নীতীশ অবাক হল—দাদা ফিরে এসেছেন !

—আসতেই হবে। তোমরা আজকালকার ছেলে, কলেজে পড়ছ, এসব মানতে চাইবে না। কিন্তু আমরা মানি। না মেনে যাবো কোথায় ? চোখের ওপর দেখছি যে। কখন কী ঘটবে, সব ঐ ওপর থেকে একজন একেবারে ঘণ্টা মিনিট কষে ঠিক করে রেখেছেন। তুমি ঠিকই ধরেছ। অন্যদিন আসে না, আসতে পারে না। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা ছেলে পড়াতে চলে যায়। কিন্তু আজ তা হবার উপায় নেই। এই খবরটা যে ঠিক এই সময়ে পেতেই হবে। তাই যেমন করে হোক, আসা চাইই।

বাবুরামবাবুর এই দার্শনিক তত্ত্বোদ্ঘাটন হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত। নীতীশ তার জন্যে অপেক্ষা না করেই বলল—মেজদা কি ফিরে এসে আবার ছেলে পড়াতে গেছেন ?

—তাছাড়া আর কোথায় যাবে ? বললাম, আজকের দিনটা না-ই বা গেলে ! এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কি বলল জানো ? খালি খালি একটা দিন কামাই করে কী লাভ ? ছেলেটার পরীক্ষা সামনে। একবার ঘুরে আসি। আশ্চর্য ! যাক, তুমি যখন এসে পড়েছ, কিছুক্ষণ বসে যাও। আমাকে একটু বেরোতে হবে।

যতীশ এল অনেক পরে। ইচ্ছা করেই বেশী সময় কাটিয়ে এল ছাত্রের কাছে। নীতুকে দেখে একটু অবাক হল। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল ওর কাছেও চিঠি এসে গেছে। দাদার উপর মনে মনে বিরক্ত হল। ও ছেলেমানুষ ; এমন একটা খবর সাত-তাড়াতাড়ি ওকে না জানালেও চলত। বাইরে সে ভাব চেপে রেখে সহজভাবেই বলল—কখন এসেছিস ?

নীতীশ উত্তর দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু দাদার মুখের পানে একবার চোখ তুলেই উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ রোধ করতে পারল না।

যতীশও আর কিছু না বলে ধীরেসুস্থে জামাটা খুলে দড়ির উপরে রাখল, জুতো বদলে চটি পরল, কাপড় ছেড়ে লুঙ্গিটা জড়িয়ে নিয়ে পাশের খাটে ওর মুখোমুখি গিয়ে বসল। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—কদিনের জন্যে বাড়ি যেতে চাস ?

নীতু তখনো সামলে উঠতে পারে নি। যতীশ ক্ষণকাল অপেক্ষা করে বলল —তুই বরং ঘুরে আয়।

এবার চমকে উঠল নীতীশ। মুখ তুলে বলল—আপনি ?

—আমি আর এখন যাই কেমন করে ? যে ছেলেটাকে পড়াই, কদিন পরেই

তার পরীক্ষা। তাছাড়া—বলে থেমে গেল। নীতু তাকিয়ে রইল বাকীটুকু শুনবার অপেক্ষায়। সেটা অনুক্তই রয়ে গেল। তার বদলে শুনল, কাল আর হয় না। হাতে টাকা নেই। পরশু পাই কি না দেখি। তুই তৈরি থাকিস। তোকে আর আসতে হবে না। আমিই গিয়ে দিয়ে আসবো।

নীতীশের সারা মন বলতে চাইছিল, আপনিও একবার চলুন। মুখেও এসে গিয়েছিল কথাটা, কিন্তু দাদার সেই আনত শান্তনিথর মুখখানার মধ্যে এমন কিছু ছিল যার জন্যে বলা হল না। মনে হল বলা বৃথা। সে তো বরাবর দেখে এসেছে, ঐ মানুষটি যা বলে মনে মনে স্থির করেই বলে এবং একবার যা স্থির করে তার আর রদবদল হয় না।

পরদিন সন্ধ্যার পর কোত্থেকে যেন গোটাকয়েক টাকা সংগ্রহ করে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে গেল যতীশ। বলল—কাল রাত্রের গাড়িতে চলে যা। পৌঁছে একটা চিঠি দিস। বেশী দেরী করিস না। এ সময়ে পার্সেন্টেজ নষ্ট করা ঠিক নয়।

সকালবেলা ট্রেন থেকে নেমে প্রায় পুরো একদিন নৌকাপথ। সকলের কাছেই বিরক্তিকর, কিন্তু নীতীশ এটা বরাবর উপভোগ করে থাকে, ছইয়ের কোলে পাটাতনের উপর বসে চারদিকটা দেখতে দেখতে যায়। কোথাও গভীর কালো জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাঁশঝাড়, কোথাও এপার-ওপার ঠাসা কচুরিপানা। পাতাগুলো কী সবুজ! তেমনি সতেজ। তার উপরে আগাগোড়া বেগুনি ফুলের বাহার। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আশপাশের লোকেরা ঐ 'কচুরি' নামক আপদগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। অনেক ক্ষতি করে ওরা। নদীনালা খালবিল ঢেকে ফেলে, ধানক্ষেতের মাথায় গিয়ে চড়ে। কী দুরন্ত বাড়! ঠেলে সরিয়ে মেরে কোনোমতেই কাবু করা যায় না। ডাঙ্গায় তুলে পুড়িয়ে ফেললেও মরণ নেই। এক পশলা বৃষ্টির অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে ছাইয়ের ভিতর থেকে ফুটে বেরোয় সবুজ প্রাণের অঙ্কুর। দেখতে দেখতে চারদিক ছেয়ে যায়।

এক মাল্লাই নৌকোর একক মাঝির সাধ্য কী, এই নিরেট ঘন দাম ঠেলে এগোয়! 'চড়নদারকেও' লগি ধরতে হয়। পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবার পথে নীতীশকেও ধরতে হয়েছে। খুশী হয়েই ধরেছে। নৌকো বাওয়ার এমন সুযোগ ছাড় কে? হলই বা কিছুটা কষ্ট।

খানিকটা কচুরির চাপ ছাড়িয়ে গেলেই আবার ফাঁকা। নদীর নাম 'কুমার'। নদী না বলে নদ বলাই ব্যাকরণসংগত। ওখানকার লোকে বলে গাঙ্। শান্ত, নিস্তরঙ্গ, অল্প-পরিসর। দুধারের গ্রামের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। একই জীবনযাত্রার অঙ্গ। যেতে যেতে চোখে পড়বে এপারে কোনো ঘাটে হুটোপাটি করে স্নান করছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, পাশের চওড়া জায়গাটা জুড়ে বড় বড় জাল শুকোচ্ছে জেলেরা; তার কোণে খেজুর গাছের পৈঠায় বসে চোখ বুজে আহ্নিক করছেন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। খানিকটা গিয়েই দেখা যাবে ওপারের ঝোপে ঘেরা ছায়া ঢাকা ফালিমত ভাঙন পথ বেয়ে কলসী কাঁখে সাবধানে নেমে আসছে একটি

কিশোরী বৌ। এদিক ওদিক চেয়ে ঘোমটাটা খুলে ফেলে দেবে। কালো চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে চলন্ত নৌকার পানে। এই নদীরই কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে হয়তো তার বাপের বাড়ি। সবে শ্বশুরঘর করতে এসেছে, এখনো সেখানে মন বসে নি। নৌকো দেখে মনে পড়ে যাবে বাপ-মা-ভাইবোনদের কথা। এখন কী করছে তারা? বাবা হয়তো ক্ষেত থেকে ফিরল। মা রান্না বসিয়েছে, ছোট ভাইটা পাশে এসে বসেছে তার ছোট্ট কাঁসিখানা নিয়ে, কখন ভাত নামবে সেই অপেক্ষায়। কদিন আগে ফেলে আসা এই নিত্য পরিচিত ছবিগুলো ফুটে উঠেছে ওর চোখের তারায়। নৌকোটা যে কাছে এসে গেছে, আঁচলখানা মাথায় তুলে দিতে হবে সে খেয়াল নেই। বিদেশী দেখেও লজ্জা করতে ভুলে গেছে নতুন বৌ।

নৌকো যখন দূরে চলে যায়, গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, মেয়েটির তখনো একখানি কালো গোলপানা মুখ আর দুটি ভাসা ভাসা ম্লান চোখ নীতীশকে অনুসরণ করতে থাকে।

এবারে সে কিছুই দেখল না, কোনোদিকে তাকাল না, প্রায় সমস্ত পথটা ছইয়ের তলায় শুয়ে কাটিয়ে দিল। সারা মন জুড়ে রইল একটি হতভাগিনী মেয়ে যে তাদের সংসারে পা দিয়েছিল ভয়ে ভয়ে, কিন্তু অনেক আশা অনেক গর্ব নিয়ে। নিজের অযোগ্যতার কথা সে একটিবারের তরেও ভোলে নি, তবু ভেবেছিল একদিন এখানে তার কাম্য স্থানটুকু সে খুঁজে পাবে। তার আগেই নিতান্ত অসময়ে সব কামনা বাসনা অপূর্ণ রেখে সে অকস্মাৎ চলে গেল। বাড়িতে এই প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় হল নীতীশের। বাবা যখন যান, তখন সে অজ্ঞান শিশু। অনেক পরে মার কাছে শুনেছিল, তাঁর দেহখানা যখন উঠোনে তুলসীতলায় নিয়ে নামানো হল, সারা ব্যাড়ির লোক কান্নার রোল তুলল চারদিকে, তখন সে তার ছোট্ট কাঁথাখানির উপর শুয়ে দুপদাপ করে পা ছুঁড়ে মনের আনন্দে খেলা করছিল।

জানতেও পারে নি কত বড় দুর্ঘটনা হয়ে গেল, পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেই কত বড় বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

কিন্তু আজকের এই দুর্ঘটনা, এই শোচনীয় অকালমৃত্যু সে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। ভুলতে পারছে না, এই অব্যক্তবেদনা বধূটি যা তার প্রাপ্য ছিল তার কিছুই পেয়ে গেল না। অন্য সকলের কাছে একটু-আধটু স্নেহ-ভালবাসা হয়তো পেয়েছিল, কিন্তু যেখানে তার আসল পাওয়া সেখানে সে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তবু একটি দিনের তরেও কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ জানায় নি। কথায় দূরে থাক, তার মুখ দেখেও কেউ কোনো দিন জানতে পারে নি তার অন্তরে কোনো ক্ষোভ আছে। হয়তো এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার বিধাতা সেটা জানিয়ে দিলেন। কোনো অভিযোগ না এনেও সবাইকে সে অপরাধী করে রেখে গেল।

নীতীশ ভাবছিল মেজদা যে আজ এলেন না, হয়তো তার মূলেও রয়েছে সেই অপরাধ বোধ। কোন্ মুখে এসে দাঁড়াবেন—বিশেষ করে বড় বৌদির

কাছে ! তাঁর চেয়ে কে বেশী জানে যে তার আবাল্যের খেলার সাথী 'যতের' উপর তার অনেক জোর, অনেক ভরসা আছে বলেই মাতৃসমা পিসীমার সব চেয়ে ছোট অতি আদরের মেয়েটিকে সে বড় মুখ করে এ বাড়ির বৌ করে এনেছিল। কিন্তু তার মুখরক্ষা হয় নি। দেওরের সেদিনকার মনোভাব সে বুঝতে পারে নি। বিধাতা তাকে বড় একটা হৃদয় দিলেও বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন দেন নি, দিলে সে সাবধান হত। তার দোষ কী ? এ বিয়েতে রাজী হবার পিছনে যতীশের যে একটা নিগূঢ় অভিমান আছে, এবং সে অভিমান বিশেষ করে তার উপর, সে-সব সূক্ষ্ম ব্যাপার সে কেমন করে জানবে ? মা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু বড় ছেলে এবং বৌ তাঁকে ভুল বুঝবে বলে বাধা দেন নি, চুপ করে ছিলেন।

নীতীশ সেদিন দাদার বিয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। আরেকটি বৌ আসছে তাদের বাড়ি এবং তার সঙ্গে বয়সের তফাৎ বেশী নয়। বড় বৌদির মত সে গুরুজনের গুরুত্ব নিয়ে এসে দাঁড়াবে না, প্রথম দিন থেকেই দুজনের মধ্যে একটা সখ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যেমন সে লক্ষ্য করেছে মেজদা এবং বড় বৌদির মধ্যে, এই চিন্তাতেই তার মনটা ছিল ভরপুর। তবু কেমন একটা খটকা লেগেছিল, সব কিছু যেন যেমন ঘটবার তেমন ঘটছে না, কোথায় যেন কোনো গোল রয়ে গেছে। ক্রমশঃ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে দিন দিন লক্ষ্য করেছে, এ বিয়ে সুখের হয় নি, দুজনের কেউ সুখী নয়, এবং তাদের বিরস মুখের ম্লান ছায়া সংসারের বুকেও ছড়িয়ে পড়েছে। কারো মনে স্বস্তি নেই। অথচ কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে না। যতীশ সে অনেক ছুটিতেই বাড়ি আসে না, বিশেষ করে ঐ সময়টাতেই তার 'জরুরী কাজ' থাকে কলকাতায়, এ নিয়েও তাকে কারো কাছ থেকে কোনো অনুযোগ শুনতে হয় নি।

যতীশ তার 'কর্তব্য' সম্বন্ধে বরাবর সজাগ। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সে-বিষয়ে দৃশ্যত কোনো ত্রুটি ঘটেছে বলা চলে না। তার সাধ্যমত জামাকাপড়, অল্প-স্বল্প প্রসাধন দ্রব্য নীতুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, বিয়ের পর থেকে হরিশের কাছে পাঠানো মাসিক মনিঅর্ডারের অঙ্কও কিছু বেড়েছে। অর্থাৎ সংসারে যে একজন বাড়তি মানুষের আগমন ঘটেছে সে বিষয়ে সে সচেতন। সংসারও সেই দৃষ্টিতেই দেখেছে ব্যাপারটাকে। কিন্তু কেবলমাত্র ভরণপোষণের যোগান দিয়েই যে স্ত্রীর সব পাওয়া মিটিয়ে দেওয়া যায় না, তারপরেও তার আরো কিছু প্রত্যাশা থেকে যায়, এই সহজ সত্যটুকু যতীশের না বুঝবার কথা নয়। বুঝেছে হয়তো, কিন্তু বাইরে থেকে তার বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি।

এই শুষ্ক 'কর্তব্যে'র দানটুকু গ্রহণ করতে গিয়ে অপর পক্ষ যে আরো আড়ষ্ট, আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে, সেটা নীতীশের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথম প্রথম তার হাত দিয়ে পাঠানো একখানা শাড়ি-কিংবা একটা পাউডারের কৌটা নিতে গিয়ে ক্ষ্যান্তির হাতখানা যেন ঠিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারত না, নীতু ভাবত এটা ওর লজ্জা—এমনিতেও বড় লাজুক মেজবৌদি—, তারপর বুঝেছিল, না, এই সঙ্কোচের পিছনে আরো কিছু আছে। সেও এক ধরনের লজ্জা, তার

মধ্যে কোনো মাধুর্য নেই, তার বদলে আছে জ্বালা। প্রায় নিরক্ষর আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হয়েও সে তার নারীসুলভ সহজ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে, ঐ জিনিসগুলোর ভিতর দিয়ে দূর থেকে যে দায়িত্বপালন তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অসম্মান আছে। হাত বাড়াতে গিয়ে সেটা বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে। কোনো একটা হালকা ঠাট্টা-তামাশার প্রলেপ দিয়ে নীতীশ সেই বেদনাটুকু ঢেকে দেবার চেষ্টা করত। ছুটির কটা দিন যখন-তখন এসে দাঁড়াতে মেজবৌদির কাছে, নানারকম ফাইফরমাশ এবং ছোটখাটো উপদ্রব দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইত। যেটুকু সাড়া পেত তাতেই আশ্চর্য হয়ে যেত। এ তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মত মেয়ে নয়। বিদ্যা না থাকলেও বুদ্ধির অভাব নেই। সকলকে আপন করে নেবার একটি সহজ প্রবণতা আছে। শুধু একটি জায়গায় যদি সেটা সফল না হয়ে থাকে সে দোষ কি ওর?

আজ সে প্রশ্ন নিরর্থক। তাকে ঘিরে সংসারের মধ্যে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যেন তার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু এ কেমন সমাধান?

নৌকোটা যতই বাড়ির কাছাকাছি আসছিল, ততই সব ভাবনা ছাপিয়ে একটি আশঙ্কা মাথা তুলে উঠছিল নীতীশের মনে। প্রথমেই বড় বৌদির সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়! এ আঘাতটা তো তারই সব চেয়ে বেশী। সে যখন সামনে এসে লুটিয়ে পড়বে, কী বলে, কেমন করে সান্ত্বনা দেবে নীতীশ! নিজের পরিবারে তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যদিও এই প্রথম মৃত্যু, এর আগে প্রতিবেশী এবং কোনো কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এমনি মর্মান্তিক শোকদৃশ্য তাকে দেখতে হয়েছে। সহ্য করতে পারে নি, দূরে সরে গেছে। কিন্তু এখানে তাকেই সবটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

যা ভয় করছিল, তাই ঘটল। নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল একেবারে সন্ধ্যার মুখে। নেমে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল বড় বৌদি বাঁ হাতে ধরা মাটির প্রদীপটি ডান হাত দিয়ে আড়াল করে রান্নাঘর থেকে বড়ঘরের দিকে যাচ্ছে। নীতুকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। নীতু ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল বারান্দার কোলে। বুঝল, বাস্তু খুঁটির গোড়ায় সন্ধ্যে প্রদীপ রেখে এখনই বেরিয়ে আসবে বৌদি। পরের দৃশ্যটা কল্পনা করে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও ফুলি এল না। শুধু একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসতে লাগল কপাটের আড়াল থেকে। নীতীশ অবাক হয়ে গেল। এ তো মৃত্যুশোকের কান্না নয়, এমন করে তো কাঁদে না মেয়েরা। সে কান্না একটা উচ্চকণ্ঠের দীর্ঘ বিলাপ। তাতে করে বুকটা হালকা হয়। শোকটা অনেকখানি সহনীয় হয়ে আসে। তেমনি কান্না যারা কাঁদতে পারে না, ঘরের কোণে গুমরে গুমরে কাঁদে, তাদের কষ্টের শেষ নেই। যে শোকের উচ্ছ্বাস নেই, তার ভার বড় দুর্বহ।

হরিশের ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য বার ওদের মধ্যে যে দুটি

ছোট ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলের উপর, বড়রাও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। মেজকাকা গম্ভীর মানুষ, তাকে ওরা সমীহ করে চলে, কিন্তু ছোটকাকার কাছে কোনো সঙ্কোচ নেই। আসামাত্র উৎপাত শুরু হয় তার উপর। এবারে সবাই রইল দূরে দূরে। কেউ বলল না, আমার জন্যে কী এনেছ ছোট্‌কা ? মৃত্যুটা ওদের যেন বোবা করে দিয়ে গেছে।

সকলের বড় হল মেয়ে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নীতুর হাত থেকে পোঁটলাটা নিয়ে নিল। বলল—ওপরে উঠে বসো। আমি হাত-পা ধোবার জল নিয়ে আসি।

—মা কোথায় রে ? জানতে চাইল নীতীশ।

—ঠাকুমা জপ করছেন।

—বড়দা ?

—ওঘরে—বলে বৈঠকখানা ঘরটা দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে খড়মের শব্দ শোনা গেল। হুঁকো হাতে বেরিয়ে এল হরিশ। নীতীশও এগিয়ে গেল সেইদিকে।

—ষ'তে এল না বুঝি ?—সকলের আগে এই প্রশ্নটাই আশা করছিল নীতু।

—বলল, না।

—একবার আসা উচিত ছিল। শুদ্ধ হতে হবে তো। যা কিছু করণীয় সবই তো তার।

নীতু কোনো জবাব দিল না। হরিশ ওর কাছে খানিকটা সরে এসে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলা খাটো করে বলল—ও কি কিছু সন্দেহ করছে ?

নীতীশ চমকে উঠে মুখ তুলল—সন্দেহ ! কিসের সন্দেহ ?

—না, মানে কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে কিনা, যে বৌটা ইচ্ছে করে ডুবে মরেছে। এরকম একটা পাজি গ্রাম তো আর ভূভারতে নেই। সব ব্যাটার বুক চচ্চড় করছে হিংসেয়। আমাদের বিরুদ্ধে একটা কিছু নিয়ে ঘোঁট পাকাতে পারলে আর কিছু চায় না।

নীতীশ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন ভয়ে ভয়ে বলল—ছোট বৌদি কি জলে ডুবে—

—হ্যাঁ ; বড় পুকুরে গা ধুতে গিয়েছিল একা। সাঁতার দিতে দিতে চলে গিয়েছিল মাঝখানে। বড্ড কাঁটা শেওলা ওখানটায়। হঠাৎ কেমন করে পা জড়িয়ে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারে নি। অপঘাত মৃত্যু কপালে লেখা থাকলে কে খণ্ডাবে বল ?

নীতীশ পাথর হয়ে গিয়েছিল ; কোনো সাড়া দিল না। হরিশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—ও সময়ে ও তল্লাটে মানুষ তো দূরের কথা, একটা কাক-পক্ষীরও দেখা পাওয়া যাবে না। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কারো কানে পোঁছবে না। দিন বুঝে আমিও গিয়ে পড়েছিলাম অনেকটা দূরে সেই আউশ ডাঙ্গার মাঠে। বর্ষাকাল ; কেউ ছুটে গিয়ে যে খবর দেবে, তার উপায় নেই। দেবাও বাড়ি ছিল না। ফিরে যখন শুনল মেজবৌকে পাওয়া যাচ্ছে না, জেলে-

পাড়া থেকে লোক আনিয়ে পুকুরে জাল ফেলে তারপর বের করল। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

॥ ১৭ ॥

নীতীশ ফিরে এসে দেখল, এই কটা দিন আগে যে কলকাতাকে সে রেখে গিয়েছিল, সে আর নেই। তার রূপটাই বদলে গেছে! সেই রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন সব ঠিক আছে, আছে তেমনি লোকজনের ভিড়, কিন্তু তারা যেন অন্য মানুষ। একটা নতুন আলো এসে পড়েছে সকলের চোখে, বিশেষ করে যারা তরুণ কিশোর। একটা নতুন শব্দ মন্ত্রের মত উচ্চারিত হচ্ছে মুখে মুখে—নন্-কোঅপারেশন্। কে জানে কী জাদু আছে ঐ শব্দটির মধ্যে যার ছোঁয়া বুলিয়ে একটা বিশাল দেশকে দেড়শ বছরের ঘুম থেকে টেনে তুলেছেন একজন মানুষ। কোনো বিস্ময় বা বৈশিষ্ট্য নেই তার চেহারায়। এদেশের পথেঘাটে, হাটেবাজারে, ক্ষেতখামারে, কলকারখানায় কোটি কোটি লোক যেমন করে চলে ফেরে, তেমনি খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত পরা একখানি মোটা ধুতি, ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা কণ্ঠার হাড়। কিন্তু কী প্রচণ্ড তার শক্তি! এই কদিন আগেও যারা তাঁর দিকে ফিরে তাকায় নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তার 'অবিশ্বাস্য' 'অবাস্তব' কথা, এমনি কত উপরতলার মানুষ জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষাভিমানী, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, বিশ-পঁচিশ হাজারী ব্যবহারজীবী—দলে দলে এসে দাঁড়াচ্ছে তাঁর পায়ের তলায়। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই। তারা তাঁর নাম দিয়েছে 'মহাত্মা'।

ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির সাধনা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে এ দেশে। পনের-বিশ বছর আগেও রক্তাক্ত বিপ্লবের গোপন পথ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল একদল দুঃসাহসী আদর্শবাদী নারী-পুরুষ। প্রাণ নিয়েছিল, দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর আবার এই নতুন প্রয়াস। পথও অভিনব। কোথাও কোনো গোপনতার অন্তরাল নেই, সবটাই দিনের আলোর মত স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এ পথের ডাক যিনি দিয়েছেন, তাঁর হাতে বোমা নেই, পিস্তল নেই, আছে একটিমাত্র অস্ত্র—অসহযোগ। দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর একটিমাত্র আবেদন—ছেড়ে দাও। বিদেশী সাম্রাজ্যের এই বিশাল রথটাকে দড়ি ধরে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কারা? এই দেশেরই অগণিত লোক। সেই দড়িটা যদি তারা ছেড়ে দেয়, রথের চাকা আপনিই অচল হয়ে যাবে। সেই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি—ছেড়ে দাও, সরে দাঁড়াও।

স্কুল-কলেজেও তাঁর আহ্বান গিয়ে পেঁাছেছে। বলেছেন, ওগুলো শিক্ষালয় নয়, গোলামখানা; দড়ি টানার তালিম চলেছে ওখানে। ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসো। বয়কট স্কুলস্ অ্যান্ড কলেজেস্। লেখাপড়া কোথায় হবে? আপাতত সে ভাবনার অবকাশ নেই। এডুকেশন ক্যান্ ওয়েট্, বাট্ স্বরাজ ক্যানট্। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার, লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার

করছিলেন হাইকোর্টে, বিশাল বৈভব, বিশাল সম্মান ; সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, নন্-কোঅপারেশনের পতাকাতলে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বাংলা দেশের হাজার হাজার ছাত্রদের ডেকে বলেছেন, সরকারী প্রভাবের বাইরে ন্যাশন্যাল ইউনির্ভার্সিটি গড়ে তুলবো আমরা। বেরিয়ে এসো।

বিপিনচন্দ্র পাল কলেজ স্কোয়ারে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে চারদিকের বিরাট ছাত্রসমাবেশকে উদ্দেশ করে বলেছেন তাঁর সেই মেঘমন্দ্রকণ্ঠে—সারা রোম যখন জ্বলছে, তোমরা কি নিরোর মত বসে বসে বেহালা বাজাবে ?

নীতীশ এসে দেখল, কলকাতার সবগুলো শিক্ষায়তনের ভিত নড়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। তার নিজের কলেজেও চাঞ্চল্য। ক্লাস বসেছে, কিন্তু পড়াশুনোয় কারো মন নেই। এখানে ওখানে জটলা, মাঠে করিডোরে, দেবদারু গাছের তলায় চাপা উত্তেজনা, হিন্দু হস্টেলের কোনো কোনো ঘরে ঘন ঘন বৈঠক বসছে। ঐ একটিমাত্র আলোচনা—কী করবো আমরা ? ছাড়বো, কি ছাড়বো না ;

রোজ খবর আসছে, অমুক কলেজ বেরিয়ে এসেছে, অমুক কলেজে পিকেটিং চলছে, অর্থাৎ যারা বেরিয়ে এসেছে তারা, যাদের বেরোবার ইচ্ছা নেই বা অসুবিধা আছে, তাদের ঢুকবার পথ আগলে রয়েছে।

প্রেসিডেন্সি সরকারী কলেজ। বহু ছাত্র সরকারী বৃত্তিভোগী। অনেককে প্রধানত তারই উপর নির্ভর করতে হয়। বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ টাকাটাও বন্ধ হয়ে যাবে, যার একমাত্র অর্থ পড়াশুনোর পথও বন্ধ। তাছাড়া অনেক ছেলের অভিভাবক উঁচুমহলের সরকারী চাকরে। তাঁরা যেমন চাকরি ছাড়েন নি কিংবা ছাড়তে পারছেন না, তাঁদের ছেলেরাও কলেজ ছাড়তে পারে না। অর্থাৎ অন্য কলেজের তুলনায় এখানকার বন্ধন যেমন দৃঢ়, বাধাও তেমনি প্রবল।

নীতীশের ভাবপ্রবণ মন নন্-কোঅপারেশনের নীতির কাছে সহজেই নতিস্বীকার করেছিল। পরাধীনতার যে স্বাভাবিক হীনতাবোধ সকলের মত তাকেও পীড়া দিত। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ কেমন করে এত বড় একটা জাতির সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ নানাদিক থেকে বেঁধে রেখে দিয়েছে, এ সত্যটাও ইদানীং তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে দেখছিল, ভারতবাসী হয়ে জন্মানোই একটা দুর্জয় বাধা। সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে একটা সীমা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এর বেশী আর এগোবার উপায় নেই। দাস্ ফার অ্যান্ড নো ফারদার। তোমার শক্তির, তোমার প্রতিভার, তোমার যোগ্যতার প্রাপ্য মূল্য তুমি পাবে না। তার একমাত্র কারণ—তুমি ভারতবাসী, পরাধীন দেশে জন্মেছ, দেশের শাসন-দণ্ড তোমার হাতে নেই, সেটা বিদেশীর হাতে।

শাসনের সঙ্গে আর একটা জিনিস চলছিল অব্যাহত ধারায়, যদিও কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন, তার নাম শোষণ, ইকনমিক এক্স্প্লয়টেশন্। কিছুদিন আগে কলেজ লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়া একখানি বই এ বিষয়ে তার চোখ খুলে দিয়েছিল। 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। লেখক কোনো ইংরেজবিরোধী বেসরকারী রাজনীতিজ্ঞ নন, শাসনবিভাগের একটি বড় স্তম্ভ প্রবীণ সিভিলিয়ান

রমেশচন্দ্র দত্ত। এ দেশের বিপুল সম্পদ কেমন করে কোন্ পথে নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি তার নিজের দেশকে পরিপুষ্ট করে তুলছে, কীভাবে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করে দিয়ে ইংরেজ বণিকদের ফেঁপে ফুলে উঠবার পথ সুগম করে দিচ্ছে, তারই তথ্যবহুল নির্মম ইতিহাস সরকারী নথিপত্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করে নিরুত্তাপ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ভদ্রলোক।

নীতীশ ইতিহাসের ছাত্র নয়, অর্থনীতি পড়ে নি। তবু বইখানা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। একটি অধ্যায় কালিদাসের উপমার আশ্রয় নিয়ে শুরু করেছেন গ্রন্থকার। কবি বলেছেন রাজা সূর্যের মত। সূর্য যেমন নদী দীঘি খাল বিল সমুদ্র থেকে তিল তিল করে জলকণা সংগ্রহ করে মেঘ-ভাণ্ডার গড়ে তোলে, তারপর বিপুল বর্ষণের ভিতর দিয়ে সারা দেশকে সেটা বহুগুণে ফিরিয়ে দেয়, রাজাও তেমনি নানাজনের কাছ থেকে একটু একটু করে রাজস্ব গ্রহণ করেন, প্রদান করেন তার অনেক গুণ এবং সেটা সমভাবে। সেখানে কোনো বাছবিচার নেই।

ব্রিটিশ রাজও সূর্য। একটু তফাৎ আছে। তাঁর সংগ্রহটা চলে এদেশ থেকে কিন্তু বর্ষণ করেন ওখানে, তাঁর নিজের দেশে।

এই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ শাসনাধিকার। দেশবন্ধু বলেছেন, স্বরাজ ইজ দি ওনলি আনসার। যেখানে যত প্রশ্ন আছে, তার একটিমাত্র সমাধান স্বরাজ এবং সেই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় নন্-কোঅপারেশন।

কলকাতার প্রায় সব স্কুল-কলেজ শূন্য। ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। মফঃস্বল থেকেও ঐ একই খবর পাওয়া যাচ্ছে। শুধু বেরোয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসগুলো। স্যর আশুতোষ নন্-কোঅপারেশনকে সমর্থন করেন নি। ওখানকার ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব। তারা এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাঙন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। মফঃস্বলের ছেলেরা, যারা হস্টেলে বা অন্য কোথাও থেকে পড়ে, অনেকেই বাড়ি চলে গেছে, যাচ্ছে। অভিভাবকরা তাদের কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ মনে করছেন। বাকী যারা রয়ে গেছে, নিজেরা মিলে যখন একটা সিদ্ধান্ত নেবার আয়োজন করছে, হঠাৎ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কলেজের ছুটি ঘোষণা করে প্রিন্সিপ্যাল এক নোটিশ দিয়ে দিলেন। যারা বেরিয়ে আসবে বলে ভেবে রেখেছিল, সে সুযোগ আর পেল না। সকলেই ক্ষুব্ধ। ঐ নোটিশটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ। ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল যেন ঐ বোর্ডে টাঙানো কাগজখানার পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছেন আর বলছেন, তোমরা কলেজ বয়কট করতে চেয়েছিলে, না? কোথায় কলেজ? দ্য কলেজ ইজ ক্লোজড্। কর, কী বয়কট করবে!

ছেলেরা মনে মনে বলল, বেশ, তোমার এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম সাহেব।

ঐটাই তখন মুখ্য 'ইসু' হয়ে দাঁড়াল। আসল বিরোধটা যেন ঐখানে। ওরই

সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ল প্রেসিডেন্সি প্রেস্টিজ, সম্মান। ব্যাপারটা নীতীশকেও ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করে তুলল এবং নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ এই নতুন আন্দোলনের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

একটা দ্রুত আলোচনার পর স্থির হল, কলেজের বাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে যাক, কলেজ আছে, দ্য কলেজ এগজিস্‌টস্‌। তারা অন্য কোথাও মিলিত হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। একজন পলিটিক্যাল ফিলজফির ছাত্র বুঝিয়ে দিল, কোনো রাষ্ট্র শত্রুর অধিকারে চলে গেলে সেখানকার গভর্নমেন্ট যেমন প্রতিবেশী মিত্ররাজ্য থেকে সরকার পরিচালনা করে, এও হবে ঠিক সেই রকম।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল, অমুকদিন অতটার সময় কলেজ স্কোয়ারে প্রেসিডেন্সি কলেজের সমাবেশ, সকলের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

জমাট সভা। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর একজন ফোর্থ ইয়ারের নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে সভাপতি করে কার্যসূচী সবে শুরু হতে যাবে, এমন সময় দেখা গেল পিছন দিক থেকে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন শ্বেতাঙ্গ প্রিন্সিপ্যাল। সভাপতির কাছাকাছি এসেই সবিনয়ে কিছু বলবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। সভাপতিকে বলতে হল, ইয়েস! কিন্তু মনে মনে প্রসন্ন হলেন না। সভার মনোভাবও তাই। ছাত্রদের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাবার কী অধিকার আছে অধ্যক্ষের? কী বলতে এসেছেন তিনি? সবাই নীরব। শুধু একটা কঠিন থমথমে গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়ল সকলের মুখে। প্রিন্সিপ্যালও গম্ভীরভাবে শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখেমুখে সেই 'সিরিয়াস' ভাবই বজায় রইল। কিন্তু তাঁর শ্রোতাদের মুখে যে গাঢ় মেঘ জমেছিল, ধীরে ধীরে উড়ে গিয়ে কখন যে সেখানে দেখা দিল হালকা হাসির ঝলক এবং মাঝে মাঝে সেটা তুমুল রোলে ফেটে পড়ল, তারা জানতেও পারল না।

পলিটিকস্‌-এর ধার দিয়েও যান নি প্রিন্সিপ্যাল। নন্‌-কোঅপারেশন বা তার সঙ্গে জড়িত কোনো প্রশ্নের উল্লেখমাত্র করেন নি। বললেন তাঁর বহুদূরে ফেলে আসা ছাত্রজীবনের মজার মজার গল্প,—কতক সত্যি, কতক বানানো,—ইটনে, অক্‌স্‌ফোর্ডে তাঁদের নানা দৌরাত্ম্যের কীর্তিকলাপ এবং এমনিধারা অনেক কিছু যার মধ্যে হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নেই।

ততক্ষণে সভার চেহারা ফেঁপে-ফুলে ওদিকের রাস্তা ছাড়িয়ে রেলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কৌতূহলী জনতার ভিড়। কী বলছে ঐ সাহেব বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে আজকের দিনে, যখন ওদের বিরুদ্ধেই চলছে অসহযোগের সংগ্রাম! কে ও? যারা দূরে ছিল বলে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। খানিকটা ঠেলাঠেলি। সেদিকে নজর পড়ল অধ্যক্ষের। তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গল্প থামিয়ে বললেন—এবার তোমরা বাড়ি যাও। আর রাত করো না। বাড়িতে সবাই ভাবছেন। আর যারা হস্টেলে বা অন্য কোথাও আছ, তাদের কথা তো আমাকেই ভাবতে হয়। আই অ্যাম্‌ দেয়ার লোক্যাল গার্জিয়ান।

ছেলেরাও দেখল, এর পরে আর তাদের আসল বিষয়ের আলোচনা জমবে না। সভার সে মেজাজ নেই। অনেক বাইরের লোক ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। প্রিন্সিপ্যাল তখনো অপেক্ষা করে আছেন। তাদের ফেলে তিনি যাবেন না। আবার তাঁকেও তারা এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারে না। সভা আপনা থেকেই ভেঙে গেল। সভাপতি সমেত নেতৃস্থানীয় ছেলেরা এগিয়ে এসে প্রিন্সিপ্যালকে ঘিরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নীতীশ আরো ক্ষোভ নিয়ে ফিরল। বুঝল, হঠাৎ কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার মত প্রিন্সিপ্যালের এ আর একটা কৌশল। তাদের বয়কট-প্রোগ্রামকে ব্যর্থ করার কারসাজি। এর ফলে মনে মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল কেটে গেল। কলেজ ছাড়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফিরে এল হস্টেলে। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল টেবিলের উপর চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ। মেজদার হাতে লেখা—সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে যাচ্ছি। কাল সন্ধ্যা ছটা নাগাদ একবার মেস্-এ যেও।

বেশ কিছুদিন মেজদার সঙ্গে দেখা নেই। বাড়ি থেকে ফিরবার পর যে কবার গেছে বিশেষ কোনো কথাবার্তা হয় নি। কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছেন মেজদা। চিরকালই গম্ভীর, দু-চারটার বেশী কথা বলেন না। এবার আরো গম্ভীর, আরো নীরব হয়ে গেছেন। নীতুও তাঁর কাছে গিয়ে বসলে কেমন নির্বাক হয়ে যায়। সামনে এসে দাঁড়ায় জল থেকে তোলা একখানা মরণাহত মুখ। তার আসল রূপটা শুনেছিল বীভৎস। কিন্তু সে তার মনের মত করে একটা ছবি গড়ে তুলেছিল। সেখানে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, নালিশ নেই, ক্ষোভ নেই। শান্ত, নিথর, পরিম্লান। যেন ঘুমিয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে, হারিয়ে যায়।

মেজদার মনের মধ্যেও কি সেই মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে? জীবনে যে কিছুই পেল না, বঞ্চনার অবহেলার ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল, মরণের ওপার থেকে বাড়িয়ে ধরল তার শূন্য মুঠি? কাছ থেকে যে-মনের কোণে একটিমাত্র রেখাপাত সে করতে পারে নি, ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে অনায়াসে জুড়ে বসল সেইখানে?

হয়তো এ সবই তার কল্পনা, অনুমান। এই মানুষটির অন্তর-গভীরে কী আছে, কোন্ হাওয়া বইছে, আগেও যেমন জানতে পারে নি, আজও তেমনি তার অগোচরে রয়ে গেল।

নন্-কোঅপারেশন সম্পর্কে একটিমাত্র কথা হয়েছিল মেজদার সঙ্গে। জানতে চেয়েছিলেন, তোদের কলেজ কী করছে? নীতীশ বলেছিল, এখনো কিছু ঠিক হয় নি। যতীশ একটুখানি ভেবে নিয়ে বলেছিল, আগ বাড়িয়ে, মানে নিজে ইনিসিয়েটিভ্ নিয়ে কিছু করতে যেও না। বেশীর ভাগ ছেলে কী করে দ্যাখ। আমার মতে স্কুল-কলেজের ছেলেদের এর মধ্যে না আসাই ভালো। স্যার আশুতোষ ঠিকই বলেছেন। পলিটিক্স্ ছাত্রদের জন্যে নয়। তাদের কাছে সবার ওপরে এডুকেশন।

সেদিন নীতুর মনের গতিও ছিল সেইদিকে। তারপর এই কদিনে অনেক

জল বয়ে গেছে গঙ্গায়। আজ সে নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ যে ছাত্র বলে কোনো আলাদা জাত নেই, এই মহাজাতির অঙ্গ তারা, এই মহাযজ্ঞে সকলের সঙ্গে তাদেরও যোগদান করতে হবে।

মেজদা যে এই সম্পর্কেই এসেছিলেন তার কাছে, সে বিষয়ে নীতুর কোনো সন্দেহ রইল না। তার স্কলারশিপ, বাড়ির অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা,—এই সব প্রশ্ন তুলে মেজদা যদি আপত্তি তোলেন, তার উত্তরগুলো যা আগেই ভেবে রেখেছিল, আরেকবার মনে মনে আউড়ে নিল। এতখানি বয়স পর্যন্ত মেজদার সঙ্গে কোনো বিষয়ে তর্ক দূরে থাক, মুখোমুখি বসে আলোচনা করবার উপলক্ষ কখনো ঘটে নি। মতান্তর যে হয় নি তা নয়, কিন্তু সেটা মনে মনে, প্রকাশ্যে রূপ নেয় নি। আজ হয়তো নেবে এবং তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

পড়াশুনোর পাট প্রায় উঠে গেছে ইডেন হস্টেলের ঘরগুলোয়। সকালে উঠেই সকলের প্রথম ঝোঁক খবরের কাগজ। কমনরুমে ভীড় জমে যায়, সেই সঙ্গে তুমুল হয়ে ওঠে বিতর্ক। নীতীশ আজ আর তার মধ্যে ভিড়ল না। ওটা চলছিল তার মনের মধ্যে। দু-একখানা কাগজের বড় বড় শিরোনামাগুলোয় চোখ বুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল। সুশান্ত বসে আছে। কিন্তু সে সুশান্ত নয়। আগে আগে যেমন দেখা হলেই একটা হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এসে দুটো বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরত বন্ধুকে, এবং নীতীশ তার ক্ষীণ দেহ নিয়ে ভিতরে উৎফুল্ল এবং বাইরে আতঙ্কিত হয়ে উঠত বুকের পাঁজরগুলো অক্ষত থাকলে হয়, আজ তেমন কিছুই হল না। সুশান্ত গালে হাত রেখে চুপ করে বসেছিল, তেমনি রইল। নীতু এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে তার পিঠে হাত রেখে বলল—কী ব্যাপার ?

—এখন কোনো কাজ আছে তোমার ?

—না তো।

—তাহলে চল, বাবা তোমাকে ডেকেছেন একবার।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ।

—কেন বল দিকিন ?

—আমাকে কিছু বলেন নি।

নীতু আর কোন কথা না বলে আলনা থেকে শার্টটা টেনে নিয়ে মাথায় গলাতে গলাতে বলল—চল।

সুশান্তর বাবা রোজ এসময়ে তাঁর অফিস কামরায় থাকেন, এবং ব্যস্ত থাকেন। আজ তাঁকে পাওয়া গেল দোতলার বারান্দায়। সিল্কের ড্রেসিং-গাউন পরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানছিলেন। নীতীশকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন এবং সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বসো।……খবরটা শুনেছ বোধ হয় ?

—কোন্ খবর ?

মিস্টার চ্যাটার্জি এবার ছেলের দিকে ফিরলেন—নীতুকে বলিস নি বুঝি ?

—না।

চাপা গলায় একটিমাত্র শব্দ, কিন্তু তার মধ্যে ক্ষোভ ও বিরক্তির সুরটা চাপা রইল না। বলেই ওদিকে চলে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি নীতুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন—ঝুনু জেলে গ্যাছে।

—জেলে গ্যাছে! চমকে উঠে সবিস্ময়ে তাঁরই কথার পুনরুক্তি করে গেল নীতীশ। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন—ওদের একজন টীচারের সঙ্গে ও আর চার-পাঁচটা মেয়ে বড়বাজারে কোন্ গাঁজার দোকানে পিকেটিং করতে গিয়েছিল। পুলিস ধরে নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে পুরে দিয়েছে।

নীতীশের মুখে আর কোনো কথা সরল না। ঝুনুর মত মেয়ে গাঁজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছে! দৃশ্যটা যেন কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। তাঁর কাছে নন্-কোঅপারেশন একটি অহিংস যুদ্ধ, এবং সব যুদ্ধে যেমন হয়ে থাকে, প্রতিটি যোদ্ধার কাজ নির্দিষ্ট, পথ বাঁধাধরা। ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্দেশ—বয়কট স্কুলস্ অ্যাণ্ড কলেজেস্। তাদের ফাংশান বা করণীয় সেইটুকু। মদ-গাঁজার দোকানে ধরনা দেওয়া তাদের কাজ নয়, তার জন্যে অন্য লোক আছে!

মিস্টার চ্যাটার্জির কথা কানে গেল এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি বিশেষ কিছু ভাবছি না। ঝোঁকে পড়ে গেছে, দুদিন পরে সেটা কেটে গেলেই ফিরে আসবে। হুজুকের পরমায়ু আর কতদিন? আমার ভাবনা কোথায় জান? নন্-কোঅপারেশনের ঐ 'নন্'টা। ঐ নেগেটিভ ফিলজফি। শুধু বর্জন। নেবো না, করবো না। এই করে করে সারা জাতের মধ্যে দায়িত্ব না নেবার প্রবৃত্তি দেখা দেবে। আজ না হয় সব ভাঙছি, কিন্তু একদিন তো গড়তে হবে। তখন হয়তো দেখা যাবে সে ক্ষমতাটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

নীতীশ নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিল। কথাগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে না পারলেও তার মধ্যে যে একটি গভীর আন্তরিকতা ছিল, এবং তার সঙ্গে জড়িত দেশের জন্যে বক্তার মনে অকপট আশঙ্কা, তার সুরটি অনুভব করে চুপ করে রইল। মিস্টার চ্যাটার্জি আবার বললেন—তার চেয়েও আমার বড় দুর্ভাবনা, এই ইংরেজ-বিদ্বেষ একদিন ইংরেজী বিদ্বেষে গিয়ে দাঁড়াবে। সেইটাই হবে দেশের পক্ষে চরম সর্বনাশ।

এবার সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাল নীতীশ—কিন্তু এর মধ্যে তো কোনো বিদ্বেষ নেই। মহাত্মাজী বলেছেন—আমাদের বিরোধ ইংরেজ-জাতির সঙ্গে নয়, ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে, এগেইনস্ট্ ব্রিটিশ রুল্।

মিস্টার চ্যাটার্জি মৃদু হেসে বললেন—ও তফাৎটা হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে **difference between Tweedledum and Tweedledee.** মহাত্মাদের কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে অতটা সূক্ষ্ম বাছবিচার সম্ভব নয়। তারা ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইংরেজ-শাসনের কথা ভাবতে পারে না। ইংরেজীও যে সেই দলে পড়ছে বা পড়বে তার লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি! ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলে যে আজব বস্তুটি বানাবার আয়োজন করেছেন তোমাদের

নেতারা, সেখানে ইংরেজীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি শুরু হয়ে গেছে দেখতে পাও নি? যাক্; তোমাকে যে-জন্যে ডেকেছি। তোমার মাসীমা বড্ড মুষড়ে পড়েছেন। তুমি গিয়ে কাছে বসলে, তোমার দু-চারটে কথা শুনলে অনেকখানি সামলে উঠবেন। তাঁর নিজের ছেলের চেয়ে তোমার ওপর তাঁর আস্থা অনেক বেশী সে তো আমি দেখেছি। তাছাড়া ও কিছু বলতে গেলে বরং উল্টো ফল হবে। তোমার বন্ধুকে তো তুমি চেন। ভীষণ ক্ষেপে গেছে বোনের ওপর! বলছে, মা-ই ওর মাথাটা খেয়েছেন। গোড়া থেকে রাশ টানলে অতটুকু মেয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করতে পারত না। সেটা অবিশ্যি ওর বুঝবার ভুল। সকলের চিন্তাধারা তো একরকম নয়। ওর না হয় মহাত্মা বা তাঁর ফলোয়ারদের ওপর কোনো ফেথ্ নেই। কিন্তু মেয়েটা একেবারে আলাদা।

॥ ১৮ ॥

মাসীমার কাছে যাবার আগে সুশান্তর ঘরে গিয়ে ঢুকল নীতীশ। সে যেন এর জন্যেই তৈরী হয়েছিল। বেশ একটু ঝাঁজের সুরে বলল—শুনলে তো সব? আমি কিন্তু আগেই জানতাম এই রকম একটা কিছু ঘটবে। মাকে বলেও-ছিলাম, স্কুলে যেত দিও না মেয়েকে। ওদের স্কুলটা একেবারে হট্ বেড অব পলিটিক্স্। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনলে তো?

নন্-কোঅপারেশন সম্পর্কে সুশান্তর মতবাদ নীতীশের অজানা নয়। এর আগে ওর হস্টেলেই এ নিয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। সুশান্তর বক্তব্য —স্টুডেণ্ট্ লাইফের একমাত্র লক্ষ্য—টু বিলড্ আপ এ কেরিয়ার, তোমার নিজের ভবিষ্যৎকে তৈরি করা। আগে দাঁড়াও, একটা কিছু হও, তারপর যত খুশি পলিটিক্স করো। তোমাদের এই বড় বড় নেতারা যদি মাঝপথে পড়া-শুনো ছেড়ে দিতেন, আজ এখানে এসে দাঁড়াতে পারতেন কি?

আরো অনেক কথা বলেছে সুশান্ত। রাজনীতির পথই হল দেশসেবার পথ, রাজনৈতিক নেতারাই শুধু দেশসেবক, এই রকম একটা ভুল ধারণা আছে লোকের মনে। আর যারা অন্য কিছু করছে সবাই যেন এদের চেয়ে ছোট। আসলে কি তাই? দেশসেবার উদ্দেশ্য যদি হয় দেশের উন্নতি, তার কল্যাণ, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, মান-সম্ভ্রম ধন-সম্পদ গড়ে তোলা, বাড়িয়ে তোলা, তাহলে একজন রবীন্দ্রনাথ একজন গান্ধীর চেয়ে কম দেশসেবক হলেন কিসে? একজন স্যার আর. এন. মুখার্জির দান বা কনট্রিবিউশন একজন দাদাভাই নওরোজীর চেয়ে বড় হল কোন্ দিক দিয়ে?

একদিন আরো পাঁচ-ছজন ছেলে ছিল নীতীশের ঘরে। বিভিন্ন কলেজের ছেলে। কথায় কথায় দেশবন্ধুর প্রসঙ্গ উঠল। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যারিস্টারির মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মহান ত্যাগের এক আশ্চর্য মহিমা তুলে ধরেছেন তিনি দেশের সামনে, দেশহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর নেই, পরাধীন জাতির কাছে এ একটা অতুল্য সম্পদ হয়ে রইল চিরদিনের তরে—অনেকটা

বক্তৃতার সুরে এই ধরনের উচ্ছ্বাসময় ভাষায় তাঁর গুণকীর্তন করছিল একটি ছাত্র। সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ সুশান্ত বলে উঠল—আমার তো মনে হয়, একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন সি. আর. দাশ। অত বড় ব্যারিস্টার হয়েই বরং তিনি দেশের লোকের অনেক বেশী উপকার করেছেন এবং হঠাৎ ছেড়ে না দিলে আরো করতে পারতেন। তাঁর নিয়মিত দানের ওপর যারা এতদিন দাঁড়িয়েছিল, তাঁর সাহায্যে যে-সব প্রতিষ্ঠান, যে দু-চারটা কুটীরশিল্প গড়ে উঠছিল, তাদের এবার কী হবে? শুধু বক্তৃতা দিয়ে তো—

তার সবটুকু বক্তব্য শেষ হবার আগে প্রায় সবাই মিলে তাকে ছেঁকে ধরল। সুশান্ত আগেও কয়েকবার এসেছে এই আড্ডায়। তার মোটামুটি পরিচয়টা সকলের জানা ছিল। উত্তেজনার মুখে সেই দিকে মোড় নিল ব্যাপারটা। —আপনি তো ওকথা বলবেনই। কায়েমী স্বার্থ রয়েছে যে। ব্রিটিশ ফার্ম থেকে টাকা আসছে, তাদের দিকটাই আগে দেখতে হবে তো।

সুশান্ত কিছুমাত্র লজ্জিত বা অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল—হ্যাঁ, সেই ব্রিটিশ ফার্ম আমাদের মত এ দেশের আরো কয়েক হাজার লোকের অন্ন যোগাচ্ছে। আমার বাবা তার একজন পার্টনার। তাঁর একমাত্র চেষ্টা, এদের দেখে, আমাদের দেশের বড়লোকেরা এমনি আরো দু-চারটা ফার্ম খুলুক, সেখানে গিয়ে কাজ শিখুক আমাদের লেখাপড়াজানা ছেলেরা। তাতে দেশ যত তাড়াতাড়ি এগুবে, পলিটিক্‌স্ করে তার সিকি ভাগও হবে না।

এমনি অনেক যুক্তি দেখাতে চেয়েছিল সুশান্ত। বেশী দূর যেতে পারে নি। কিন্তু তার চিন্তাধারাটা কোন্ দিকে নীতীশ আগেও জানত, সেদিন আরো স্পষ্ট করে জানতে পেরেছিল। তাই ঝুনু এবং তাকে ঘিরে যে প্রসঙ্গ উঠল, সেটা এড়িয়ে গিয়ে বলল—ওঠো।

—কোথায় যাবো?

—মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—বেশ তো, যাও না।

—তুমিও চল।

—আমি গিয়ে কী করবো? তুমি যাও।

অগত্যা একাই গেল নীতীশ। সুপ্রভা তার নিজের খাটে শুয়েছিলেন। ওকে দেখে উঠে বসলেন, আগের মতই একটু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—বসো। কিন্তু হাসিটা বড় ম্লান। নীতু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। সুপ্রভাও চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—অনেকদিন তুমি আস নি এদিকে।

—আসবো আসবো করছি সেই কবে থেকে। হয়ে ওঠে নি। আজ সুশান্ত যেতেই একসঙ্গে চলে এলাম।

—আমি জানলে খোকাকে এসময়ে যেতে বারণ করতাম। সকাল বেলা এলে তোমার পড়ার ক্ষতি হয়।

—না, না; কিসের ক্ষতি? তাছাড়া পড়াশুনো হচ্ছে না আজকাল।

—তোমাদের ওখানেও তাই ?

—সব জায়গায় ।

আবার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন সুপ্রভা । তারপর বললেন—উনি তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

নীতীশ প্রসঙ্গটা চেপে গেল । বলল—এমনিই ।

—আমি জানি । আমার জন্যে বড্ড ভাবছেন । ভাববার কী আছে ? সে যা ভালো বোঝে করুক । আমার কী এসে যায় ? আমি কারো কাজেই বাধা দিই না ।

সহজ সরল উক্তি । কিন্তু নীতু ওঁকে চেনে এবং সেইজন্যে এই কথাগুলোর নিগূঢ় রূপটিও চিনতে পারল । বলল—আমি একবার যাবো মাসীমা ?

—কোথায় ?

—ওখানে । দেখা করতে দেবে নিশ্চয়ই ।

—তা দেবে । কিন্তু কী লাভ গিয়ে ? সে চেষ্টা উনি করেছেন । কী একটা বণ্ডে সই দিলে নাকি তখ্‌খুনি ছেড়ে দেয় । তা সে দেবে না । আর আমিও তা চাই না ।

তবুও কাউকে না জানিয়ে পরদিন প্রেসিডেন্সি জেলে গেয়ে ইন্‌টারভিউ-এর দরখাস্ত দিল নীতীশ । বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না । গরাদের ওপাশ থেকে কলকল করে উঠল একটি পরিচিত কণ্ঠ, আগের চেয়ে অনেক সহজ, অবাধ, সপ্রতিভ—আপনি ! কখন এলেন ? কী করে জানলেন আমি এখানে ? দাদা বলেছে নিশ্চয়ই ? সে আসে নি ?

নীতু এতগুলো প্রশ্নের একটিরও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না । পরে যা বলল, তাও অস্পষ্ট । তার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি । এ কেমন করে সম্ভব হল ! হঠাৎ যেন কোন মন্ত্রবলে, মেয়েরা যাকে বলে ঝাড়া দিয়ে, বেড়ে উঠেছে ঝুনু । খদ্দরের মোটা শাড়িতে আরো বড় দেখাচ্ছে । সারা দেহে এরই মধ্যে যেন একটা পরিণতি এসে গেছে । চোখেমুখেও তার ছাপ ।

নীতীশ অবাক হয়ে দেখছিল । বোধ হয় বুঝতে পারল ঝুনু । ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কথা বলছেন না যে ? আপনাদের কলেজের খবর কী ? কবে বেরোচ্ছে ?'

—কাল ।

—সব্বাই ?

—হ্যাঁ, সব্বাই বৈকি ।

—আপনি ?

—আমিও আছি ।

ঝুনু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল । মুহূর্তের অবকাশ । পরক্ষণেই দৃঢ় কণ্ঠে বলল—না ।

—কী না ?

—আপনার কলেজ ছাড়া চলবে না । আপনি দেশে চলে যান । এদিকের

অবস্থা বুঝে পরে আসবেন।

ইন্‌টারভিউ অফিসারের নির্দেশ শোনা গেল—সরে যান, আপনাদের সময় হয়ে গ্যাছে।

বলতে না বলতে গরাদে দেওয়া জানালার ওধারে অন্য লোক এসে গেল। এধারেও তাই। ঝুনু যেতে যেতে বলল—চলি। যা বললাম, মনে রাখবেন কিন্তু।

ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ। কী বলতে চায় ঝুনু? এত বাধানিষেধ উপেক্ষা করে মেয়ে হয়ে (তাও স্কুলের মেয়ে) যে-পথ সে বেছে নিল, তার বেলায় সেটা নিষেধ করছে কেন? মনে পড়ল, প্রথম প্রথম যখন ওদের বাড়ি যেত এই মুখরা মেয়েটির কাছে 'মুখচোরা' 'ভালো ছেলে' বলে কিছুটা ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। ঠিক স্পষ্ট এবং সরাসরি নয়, নেপথ্যে থেকে মাকে কিংবা দাদাকে মাঝখানে রেখে।—তোমার বন্ধুর আবার পড়ার সময় নষ্ট হবে না তো?

—পিকনিক! তুমি ক্ষেপেছ? সে সময়টা ওঁর জিওমেট্রি পড়লে কাজ দেবে।
—মার যেমন কথা, ভালো ছেলেরা আবার পেটভরে খায় নাকি?

কলেজে ঢুকবার পরেও কিছুটা এমনিধারা বাঁকা বাঁকা বাক্যবাণ তার উপর এসে পড়েছে। তার ভিতরে অবশ্য ঠাট্টার আবরণ একটি সসম্ভ্রম অন্তরঙ্গতার সুর প্রত্যক্ষ না হলেও একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকত না। চেপে রাখবার চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু এতটা স্পষ্ট ঝুনুকে কোনোদিন দেখা যায় নি। এমন জোরালো আদেশের সুরও শোনা যায় নি তার মুখে।

এ মেয়েকে এতদিন বোঝা যায় নি অস্পষ্ট বলে—আজকের স্পষ্টতা যেন তাকে আরো দুর্বোধ্য করে দিয়ে গেল।

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বেরিয়ে আলিপুর ব্রীজ পার হয়ে নীতীশ রেস্‌-কোর্সের ধারে গিয়ে পড়ল। হিন্দু হস্টেল অনেকখানি পথ। একবার ভাবল লোয়ার সার্কুলার ধরে কিছুটা হেঁটে গিয়ে মোড় থেকে এসপ্লানেডের ট্রাম ধরবে। তারপর কী মনে করে এগিয়ে চলল রেড রোডের দিকে। এইমাত্র যা শুনে এল, সেই কটি কথা আশ্রয় করে একটি দুর্বার চিন্তাস্রোত তাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলল।

তবে কি এও ঝুনুর এক কঠিন বিদ্রূপ? তোমার মত দুর্বলচিত্ত 'ভালো ছেলে' এই কঠোর দেশসেবার পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে কোন্ সাহসে? তুমি শুধু বই মুখস্থ করবে, একজামিন পাস করবে, তারপর তারই জোরে কিংবা একে ওকে ধরে একটা সরকারি চাকরি যোগাড় করবে। এদিকে কখনো এসো না। পারবে না। তুমি অযোগ্য, অক্ষম। এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলে দিল?

সমস্ত দৃশ্যটাকে মনের মধ্যে সাজিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নীতীশ। মন সায় দিল না। তাকে এত ছোট করে দেখবে ঝুনু, এই রকম একটা বিষয় নিয়ে এমন নির্মম পরিহাস করবে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া তার সুরে, হাবভাবে, চাহনিতে চপলতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সবটাই গভীর, সিরিয়াস।

যখন বলছিল—আপনার কলেজ ছাড়া চলবে না, চোখেমুখে এমন একটি সুস্পষ্ট আন্তরিকতার দীপ্তি ফুটে উঠেছিল, একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয়ের পক্ষেই যা সম্ভব।

একদিনের কথা মনে পড়ল। রবিবার, বেলা প্রায় দশটা। হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল নীতীশ। সুশান্ত ছিল না। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই ঝুনুর সঙ্গে মুখোমুখি। তার চোখের তারায় বিস্ময়ের সঙ্গে খুশির ঝলক খেলে গেল। মুখে তার প্রকাশ নেই। বলল—আপনি হঠাৎ? পথ-টথ ভুলে যান নি তো? দাদা কিন্তু বাড়ি নেই।

—জানি। অসংকোচ জড়তাহীন উত্তর। নীতু আর তখন আগেকার নীতু নেই। ঝুনু একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—দাঁড়ান, মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

—কার সঙ্গে কথা বলছিস রে? ওদিক থেকে চেঁচিয়ে বললেন সুপ্রভা।

—এসে দ্যাখ না, কে?

—ওমা, নীতু এসেছ! ভালো আছ তো বাবা? যাও, ঘরে গিয়ে বসো। এই, পাখাটা খুলে দে। ওর কাছে বোস, গল্প-টল্প কর। আমি মাছটা নামিয়েই আসছি।

শেষের নির্দেশগুলো মেয়ের উদ্দেশে।

নীতু ভিতরে গিয়ে বসল, ঝুনু দাঁড়িয়ে রইল কাছেই একটা চেয়ারের পিঠ ধরে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলল—কী ভাবছেন?

—কই, কিছু না তো।

—মার চিঠি পান নি বুঝি?

নীতীশ চমকে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে মার কথা না ভাবলেও অনেকদিন তাঁর চিঠি না পেয়ে মনটা খারাপ ছিল, একথা সত্য। অনেকটা সেই কারণেই সুপ্রভার কাছে একটু বসবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা তাগিদ অনুভব করছিল, এবং এরকম অসময়ে চলে এসেছিল। কিন্তু ঝুনুর কাছে তা স্বীকার করল না। একেবারে পুরোপুরি চাপতেও পারল না। বলল—না, তা ঠিক নয়,—

—কেন লুকোচ্ছেন? আমি জানি।···আচ্ছা এক কাজ করেন না কেন?

—কী?

—আপনার দাদাকে বলেন না কেন একটা বাসা করতে? তিনি এসে থাকতে পারেন তাহলে। আমরাও যেতে পারি মাঝে মাঝে।

বলেই হঠাৎ দ্রুতপায়ে চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

এর দিনকয়েক আগেই একটা সন্ধ্যা সুপ্রভার কাছে বসে নিজের ছেলেবেলাকার অনেক কথা বলে গিয়েছিল নীতীশ। তার প্রায় সবখানি জুড়ে ছিলেন মা। তার জ্ঞান হবার পর তাঁকে যা দেখেছে যেটুকু পেয়েছে তা-ই শুধু নয়, তার অনেক আগে যখন সে জন্মায় নি, কিংবা কিছু বুঝতে শেখে নি তখনকার দিনের মায়ের যে রূপটি সে মনে মনে গড়ে তুলেছিল তাঁর নিজের মুখে শোনা

নানা কাহিনীর ভিতর দিয়ে, কতক বা তার উপরে কল্পনার তুলি বুলিয়ে, সবটাই সে ধীরে ধীরে খুলে ধরেছিল। বিশেষ করে বাবার শেষ শয্যার সেই দৃশ্যটি যেখানে সহায়সম্বলহীন প্রৌঢ়া স্ত্রীর হাতে একটি সদ্যোজাত শিশুর গুরুভার সঁপে দিয়ে একজন সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর অন্তিম ইচ্ছা—ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিও, এ যুগের উচ্চশিক্ষা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন। সেই স্ত্রী, উচ্চশিক্ষা দূরে থাক, কোনো শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হয় নি, কঠোর ব্রতের মত সেই অসম্ভব এবং অসঙ্গত ইচ্ছাকে পালন করে চলেছেন। জীবনে যেন তাঁর আর কোনো কাম্য, আর কিছু করণীয় নেই।

সেদিনও সুশান্ত ছিল না। সুপ্রভা গালের উপর হাত রেখে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন অনুচ্চ কণ্ঠে থেমে থেমে বলা এই কথাগুলোর মধ্যে। আর একজন শ্রোতাও ছিল, সামনে নয়, দরজার আড়ালে। নীতু প্রথমটা জানত না, পরে বুঝেছিল যখন হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল। কোনো কথা বলে নি; সেদিনও না, তার পরেও না। মনের মধ্যে হয়তো কিছু ছিল, যার একটু আভাস অতর্কিতে প্রকাশ পেয়ে থাকবে দিন কয়েক পরে যখন হঠাৎ বলে ফেলেছিল, আপনার মাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বলেই লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

আজ জেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যা সে নিঃসঙ্কোচে দৃঢ় স্বরে বলে গেল, তার সঙ্গে কি তার সেদিনের মনের কোনো যোগ আছে? সেই কোন্ বিগত যুগের শ্যামাচরণ শিরোমণির এক অন্তিম অভিলাষ যাকে ইষ্টমন্ত্রের মত নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন তার নিরক্ষর স্ত্রী, তারই সঙ্গে সুর মেলাল এ যুগের এক বিদ্রোহিনী কিশোরী, দেশের ডাকে যে ঘর ছেড়েছে, ফেলে চলে এসেছে তার বাপ-মায়ের যেটা একান্ত অভীপ্সিত পথ? কে জানে কী বলতে চায় এই মেয়ে?

এস্‌প্লানেড পেরিয়ে সদ্য-তৈরি প্রশস্ত রাস্তা সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে এগিয়ে চলল নীতীশ। দুদিকে ভাঙাচোরার পালা তখনো শেষ হয় নি। তারই ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বাড়ি উঠছে। একটা যুগ, যার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে, যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা অর্থহীন বলে মনে করছে মানুষ, তাকে ভেঙে ভগ্নস্তূপ সরিয়ে বৃহত্তর ভাবাদর্শ নিয়ে আর একটা যুগ গড়ে ওঠে। এ যেন তারই প্রতীক। চলতে চলতে এমনি ধরনের একটা দার্শনিক চিন্তার মধ্যে মোড় ফিরতে চেষ্টা করল। এই নন্-কোঅপারেশন সেই ভেঙে ফেলার ডাক নিয়ে এসেছে। তার মধ্যেই সুপ্ত হয়ে আছে গড়ে তোলার আহ্বান। একে নেগেটিভ ফিলজফি বলে ভুল করে দেখছেন সুশান্তর বাবা। এর একটা পজিটিভ দিকও আছে, এখনো প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ঠিক সময়ে প্রকাশ পাবে। আপাততঃ সে ভাবনা অর্থহীন। এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়া। নানা জায়গা থেকে টান তো পড়বেই, বাধা তো আসবেই। সব বাঁধন ছিঁড়ে, সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যেতে হবে।

নীতীশের পা দুটোও যেন এই চিন্তার তালে তাল রেখে জোরে জোরে

এগিয়ে চলল। আর কোনো দ্বিধা নয়। ঝনু বা অন্য কেউ কী ভাবছে বা বলছে তা দিয়ে তার ভবিষ্যৎ রচিত হবে না। নিজের পথ সে নিজেই স্থির করেছে। তার থেকে সরে আসার আর কোনো প্রশ্ন নেই।

কলুটোলায় পড়ে কয়েক পা গিয়ে বাঁদিকে মোড় ফিরতেই ডাইনে দাঁড়িয়ে লাল ইঁটের দোতলা বাড়িটা। কেমন যেন বিবর্ণ শ্রীহীন, বিশেষ করে ও পাশটা। চোখে পড়তেই নীতুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ দোলা দিয়ে উঠল। কদিনই বা আছে এখানে! তবু এরই মধ্যে যেন এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে এই বাড়িটার সঙ্গে। এর এই সদাশব্দিত কাঠের সিঁড়ি, লম্বা করিডোর, কাঠের বেড়া দেওয়া খোপগুলো যার নাম cubicles, চার নম্বর থেকে দু নম্বরে যাবার ঘেরাটোপ ঢাকা ওভারব্রীজ, মাঝখানের ঐ সবুজ মাঠ, তার ওপারে কোলাহল এবং কাঁসার থালার ঝঙ্কার মুখরিত প্রশস্ত ডাইনিং রুম, বনমালীর খাবার, বংশী-দিবাকর-মোহিনী-উদয়ের চা—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র বিশিষ্ট জীবনধারা, কিংবা বলা যেতে পারে এক অনন্য জীবনদর্শন, একদিকে চঞ্চল, উচ্ছল, আরেকদিকে শান্ত, গভীর।

সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়তো চিরদিনের তরে। ইডেন হিন্দু হস্টেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে সেই আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে নীতুর মনে একটা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন কানে এসে বাজল একটি দৃঢ় কিশোর কণ্ঠস্বর—না, আপনার কলেজ ছাড়া চলবে না।

নীতীশ তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

বিকেল পাঁচটা আন্দাজ নীতু মেস্এ গিয়ে দেখল যতীশ তক্তপোশের উপর সুটকেস খুলে তার মধ্যে দু-চারটে জামাকাপড় আর কী সব টুকিটাকি গুছিয়ে রাখছে। ওর দিকে চোখ না তুলেই বলল—নীতু এসেছিস? বোস্। নীতীশ গিয়ে বসল ওদিকে রামরামবাবুর খাটে এবং অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যতীশ একটা পাঞ্জাবি পাট করতে করতে বলল—আমি চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—আপাততঃ মালীকান্দায়।

মালীকান্দা নামটা নীতীশের শোনা। ঢাকা জেলার একটা গ্রাম। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, সম্প্রতি যিনি অনেক উঁচু পদ এবং মোটা মাইনের সরকারী চাকরি (ভারতবাসীর পক্ষে যা দুর্লভ) ছেড়ে নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, ঐখানে একটা আশ্রম খুলেছেন, যার কাজ মহাত্মা গান্ধীর বিভিন্ন কার্যসূচীর রূপদান। কিন্তু সেখানে মেজদা কী করবেন!

আবার যতীশের কথা শোনা গেল, এখানকার স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলাম।

নীতুর কাছে সেটা নতুন খবর নয়, অনেক দিন থেকেই প্রত্যাশিত। কয়েক মাস আগেই মেজদার ওকালতি শুরু করবার কথা। সেই প্রশ্নটাই মনে হল। বলল—বারে (bar) জয়েন করছেন কবে?

যতীশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখেই বলল—সেটা

আর হল কই ?

এমন কিছু ছিল সে হাসির মধ্যে যার পর নীতুর মুখে আর কোনো কথা যোগাল না ! সে শুধু বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল । তার মনে হতে লাগল, সবাই জানবে, বলাবলি করবে, মেজদার এই "চলে যাওয়ার" পিছনে রয়েছে এই দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণা । হয়তো তাই । কিন্তু সেটাই কি সব ? আর কিছু নেই ? আরো পিছনে আর কোনো 'আন্দোলন'—সূক্ষ্ম, নিগূঢ় এবং গভীর, যার ক্ষেত্রে শুধু একজনের মর্মস্থল, বাইরে যার প্রকাশ নেই, কোনোদিন প্রকাশ পাবে না ?

যতীশ সুটকেস গোছানো শেষ করে কাপড়চোপড়ের তলা থেকে একখানা পোস্ট অফিসের পাস-বুক বের করে বলল—এটা রেখে দে । ভেতরে কটা ইউদড্রল ফর্ম আছে, আমি সই করে দিয়েছি. যখন যেমন দরকার হবে পোস্ট অফিস থেকে তুলে নিস । ··বেশী কিছু অবিশ্যি নেই ওর মধ্যে । নে ।

বইখানা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে নীতুর বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল । মেজদা যেন তাঁর সর্বস্ব ওর হাতে তুলে দিয়ে সব বন্ধন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন । মেজদা চিরদিনই এমনি মৃদু, এমনি ধীর, কিন্তু তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা এবং কথার জোর নীতুর কাছে অপরিমেয় । আজও তা প্রতিরোধ করতে পারল না । বলতে পারল না, না আপনি যাবেন না ।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা । যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনি ভাবে বলল যতীশ —মার চিঠি এসেছে । কলকাতায় গোলমাল চলছে শুনে আমাদের দুজনকেই বাড়ি যেতে লিখেছেন । আমার তো যাওয়া হবে না । তুই চলে যা । হস্টেলে বসে কী করবি ? তোদের কলেজ তো বন্ধ হয়ে গেছে দেখলাম । খুললে তারপর আসিস ।

নীতীশ এতক্ষণে কথা বলল—আমাদের কলেজ নন্-কোঅপারেশন করছে । কালই বোধ হয় প্রসেশন বেরোবে ।

—তা বেরোক ; তুই তার মধ্যে থাকিস না । আজই বরং চলে যা । যাবার মত টাকা আছে হাতে ?

—তা আছে । কিন্তু—

যতীশ চোখ তুলে তাকাল ওর মুখের দিকে । কী ছিল সেই দৃষ্টিতে, নীতু তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারল না । যতীশ ক্ষণকাল অপেক্ষা করে বলল—না, না ; তোর কি কলেজ ছাড়লে চলে ? দেখতেই তো পাচ্ছিস । ওদিকের সব দায়িত্ব এখন তোর ওপর এসে পড়ল । তাছাড়া মার ইচ্ছে তো জানিস ।

মেসএর চাকর এসে জানাল,—ম্যানেজারবাবু এসে গেছেন ।

—ও, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, বলে সুটকেসের ভিতর থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল যতীশ । যেতে যেতে বলল—তাহলে আর দেরি করিস নে । গাড়ি তো সেই দশটার পর । সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড় । বাড়ি পেঁছেই একটা চিঠি দিস । ও, ঠিকানাটা তো দেওয়া হয়নি ।

পকেট হাতড়ে একটুকরা কাগজ বের করে ঠিকানাটা লিখে নীতুর হাতে

দিতে দিতে বলল—মাকে সব বলিস। আমিও চিঠি দেবো।

বলে আর দাঁড়াল না। নীতীশ আরো কিছুক্ষণ সেই নির্জন ঘরে নিঃশব্দে বসে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। কর্মব্যস্ত কলকাতা। চারদিকে মানুষের ভিড়, গাড়িঘোড়ার জটলা। সবাই নিজের পথে চলেছে। সেও তার নিজের পথে চলবে, কিছুক্ষণ আগে এখানে যখন আসে সেই সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছিল। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সংসারে তার নিজের পথ বলে কিছু নেই, তাকে অন্যের মুখ চেয়ে চলতে হবে। নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই, সে শুধু অপরের ইচ্ছার তল্পিবাহক। সে ইচ্ছাকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই, এড়িয়ে যাবার সাধ্য নেই। তোমার মন যা চায় সেদিকে পা বাড়াতে গেলেই চারদিক থেকে সমস্বরে বেজে উঠবে "যেতে নাহি দিব", কবি যাকে বলেছেন, "এ অনন্ত চরাচরে···সব চেয়ে পুরাতন কথা।" তারই কাছে তোমাকে মাথা নোয়াতে হবে। সেটাই তোমার বিধিলিপি।

পরদিন সকাল বেলা একটা ছোট্ট সুটকেসে কয়েকটা জামাকাপড় ও খান-কয়েক বই ভরে নিয়ে ইডেন হস্টেলের প্রশস্ত করিডোর পেরিয়ে বন্ধুদের অলক্ষ্যে যখন নীচে নেমে গেল নীতীশ, ঘরে ঘরে তখন আসন্ন পদক্ষেপের আয়োজন চলছে। তুমুল হয়ে উঠছে উৎসাহ-উদ্দীপনার উল্লাসময় কলরব। আর একটু পরেই শুরু হবে সমবেত নতুন যাত্রা, স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য সব কলেজের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিও তার গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করবে। সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে।

একজন শুধু পারল না। ছিটকে বেরিয়ে এল। পিছনে টেনে ধরল সংসারের নানা দাবি, সামনে এসে দাঁড়াল প্রিয়জনের বহু প্রত্যাশা। তার চেয়েও বড় তার নিজের দায়িত্ব বোধ। তাদের কাছে হার মানল তার দেশ, ব্যর্থ হয়ে গেল বৃহত্তর জীবনের আহ্বান।

গোলদীঘি বাঁয়ে ফেলে শিয়ালদ স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দিল নীতীশ। এই পথ দিয়ে সে কতবার এমনি ট্রেন ধরতে ছুটেছে। এই বাড়িঘর দোকানপাট সবই তার চেনা। এই মানুষজনের সঙ্গে সে এক হয়ে মিশে গেছে, আজ চারিদিকে চেয়ে মনে হল সে বড় একা, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। কে জানে হয়তো সারাজীবন তাকে এমনি করেই চলতে হবে।